বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আধ্যাত্মিক রাহবার
পীরে কামেল মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশ্‌বন্দী-এর বয়ান

# খুতুবাতে যুলফিকার



# খুতুবাতে যুলফিকার

## [সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড]


মূল

**মাওলানা যুলফিকার আহমদ নকশবন্দী**

অনুবাদ

**আব্দুল্লাহ আল মাসূম**

আত-তাখাসসুস ফী উলূমিল হাদীছ

ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার বসুন্ধরা, ঢাকা

পরিচালক, তাহরীকুল কলম ফাউন্ডেশন

[দাওয়াহ, গবেষণা ও রচনায় নিবেদিত]

সম্পাদনা

**মাওলানা মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন**

দাওরায়ে হাদীছ (১৯৯০)

মাদরাসা-ই নূরিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

সাবেক ওস্তাদ, জামেয়া রশীদিয়া ঢাকা

প্রাক্তন সহ-সম্পাদক, মাসিক রহমত

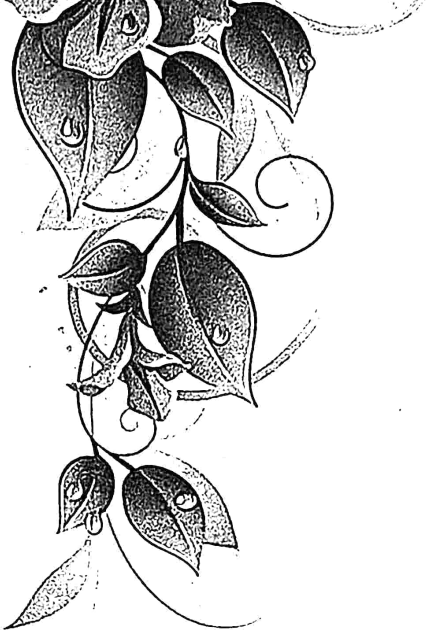


দারুল উলূম লাইব্রেরী

[অভিজাত ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)

১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০



টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

| | | |
|---|---|---|
| প্রথম প্রকাশ | : | নভেম্বর ২০১৮ |
| প্রকাশক | : | মাওলানা শহীদুল ইসলাম<br>দারুল উলূম লাইব্রেরী<br>ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড)<br>১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০<br>মোবাইল : ০১৯১৮১৮৮০৮৫, ০১৭১২৫০৭৮৭৭ |
| স্বত্ব | : | প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত |
| বর্ণবিন্যাস | : | পরশ কম্পিউটার, রায়েরবাগ, ঢাকা |
| প্রচ্ছদ | : | দি ব্রাইট, বাংলাবাজার, ঢাকা। |
| মূল্য | : | ৫০০ - মাত্র |

## এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-৭


- তোমরা আমাকে স্মরণ করো; আমি তোমাদের স্মরণ করব /৩০
- রহমাতুল্লিল আলামীন /৬৪
- উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ করুণা /৭৬
- নেসবতের আলো /৯৬
- নেসবতের বরকতসমূহ /১০২
- মনীষীদের বিস্ময়কর কিছু ঘটনা /১২৮


## এক নজরে খুতুবাতে যুলফিকার-৮


- তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় করো /২২৮
- ইল্‌মের ফযীলত /২৫২
- ইল্‌ম ও আলেম সমাজের মর্যাদা /২৭৬
- পূর্বসূরীদের ইল্‌মি নিমগ্নতা /২৮৭
- ঈমানের মহত্ত্ব /২৯৮
- ইসলামের প্রহরী /৩২৬
- দৃঢ়তার ফযীলত /৩৪৪
- ছিলেন তিনি মনের ওষুধবিক্রেতা /৩৬৬
- উত্তম চরিত্র /৩৮০

# সূচি নির্দেশিকা

## খুতুবাতে যুলফিকার-৭


**তোমরা আমাকে স্মরণ করো;**
**আমি তোমাদের স্মরণ করব /৩০**
যিকিরের অর্থ /৩০
আলেমগণের নিকট যিকিরের অবস্থান /৩০
প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী /৩১
আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু /৩১
শয়তানের চেপে বসা /৩১
শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচার পদ্ধতি /৩২
অন্তর পরিচ্ছন্নত করার যিম্মাদার কে? /৩২
রহমানের অবস্থান /৩৩
শয়তানের ভয়ংকর অস্ত্র /৩৩
ফরজ হুকুমের উপর শয়তানের হামলা /৩৩
নামাযের মধ্যে কবীরা গোনাহ /৩৫
কেমন নামায দ্বারা প্রশান্তি লাভ হয়? /৩৫
আওলিয়ায়ে কেরামের মতো নামায পড়ার আগ্রহ /৩৫
শায়খের মর্যাদা /৩৬
অন্তরের স্থিতিশীলতার একটি পন্থা /৩৬
আল্লাহর নামের বরকত /৩৭
স্মরণ করার স্থান /৩৮
সর্বদা যিকির করা /৩৮
দুই লোকের অন্তরের অবস্থা /৩৮
একটি প্রশ্নের উত্তর /৩৯
গোপনে যিকির করার ফযিলত /৩৯
আল্লাহর প্রতি মগ্নতা সৃষ্টির পন্থা /৩৯
আল্লাহ-আল্লাহ যিকির -এর শরয়ী প্রমাণ /৪০
আল্লাহ-আল্লাহ যিকিরের স্বাদ /৪০

বু আলী সিনাকে স্পষ্ট জবাব /৪১
ফিকিরের সবকসমূহ /৪২
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকির /৪২
'যাতী বারকী'র তাজাল্লি ও 'যাতী দায়েমী'র তাজাল্লি /৪৩
দুই নম্বর পাগল /৪৪
অন্তরের যিকিরের প্রমাণ /৪৪
আল্লাহ্-আল্লাহ করার হুকুম /৪৫
নিবেদিত বান্দা ও অন্তর /৪৫
সর্বদা আল্লাহর যিকির /৪৬
যিকির থেকে গাফেল থাকার পরিণাম /৪৬
মুসা ও হারুন আলাইহিস সালামের প্রতি যিকিরের হেদায়াত /৪৭
মুফতী যয়নুল আবেদীন সাহেবের বক্তব্য /৪৮
রণাঙ্গনে যিকিরের তালকীন /৪৮
فَاذْكُرُونِيْ أَذْكُرْكُمْ -এর মর্ম /৪৯
একটি ইলহামী কথা /৪৯
فاذكروني أذكركم -এর দ্বিতীয় অর্থ /৪৯
জান্নাতে সঙ্গীর সাথে সাক্ষাত /৫০
فاذكروني أذكركم -এর তৃতীয় মর্ম /৫১
নেসবতের সম্মান /৫১
বেয়াদবির পরিণাম /৫১
চিন্তার বিষয় /৫২
মসজিদে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে কুরআনের নীতিমালা /৫২
فاذكروني أذكركم -এর চতুর্থ মর্ম /৫৩
ক্ষমতার মসনদে ইউসুফ আলাইহিস সালাম /৫৪
ইল্‌মের মোকাবেলায় সৌন্দর্য /৫৫
فاذكروني أذكركم -এর পঞ্চম মর্ম /৫৫
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /৫৫
তিনটি মূল্যবান কথা /৫৬
দুশ্চিন্তা দূর করার সহজ উপায় /৫৭
দৃঢ়তার অবস্থা /৫৭
একটি উদাহরণ /৫৮
হাশরের দিনের অবস্থা /৫৮
فاذكروني أذكركم -এর ষষ্ঠ মর্ম /৫৯

আমাদের জন্য মাছের পেট /৬০
فاذكروني أذكركم -এর সপ্তম মর্ম /৬১
যিকরে ইলাহীর মূল উদ্দেশ্য /৬২

**রহমাতুল্লিল আলামীন /৬৪**

রহমতের নবীর মমতা /৬৪
দুটি অতুলনীয় নেয়ামত /৬৪
মায়ের অন্তরে সন্তানের মহব্বত /৬৫
একটি বিস্ময়কর মামলা /৬৬
প্রত্যেক কাজের জন্য রহমত /৬৬
নবীজির ভুলও রহমত /৬৬
নবীজির নিদ্রাও রহমত /৬৭
নবীজির বদ দু'আ নেক দু'আয় পরিণত হওয়ার জন্য দু'আ /৬৭
নবীজির রহমত আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত বণ্টনের অংশ /৬৮
মায়ের অংশ /৬৮
কন্যার অংশ /৬৮
স্ত্রীর অংশ /৬৮
স্বামীর অংশ /৬৯
বড় ও ছোটদের অংশ /৬৯
আলেমগণের অংশ /৬৯
তালিবুল ইল্‌মের অংশ /৭০
মুজাহিদের অংশ /৭০
ব্যবসায়ীদের অংশ /৭১
দিনমজুর লোকের অংশ /৭১
প্রতিবেশীর অংশ /৭২
এতিমের অংশ /৭২
নবীজির দৃষ্টিতে এতিমের অবস্থান /৭২
ভিক্ষুক ও বঞ্চিত লোকের অংশ /৭৩
কারিগরের অংশ /৭৩
দাস-দাসীদের অংশ /৭৩
অন্যান্য প্রাণীকুলের অংশ /৭৪

জিন জাতির অংশ /৭৪
গাছপালার অংশ /৭৪
মৃত ব্যক্তির অংশ /৭৫
ফেরেশতাগণের অংশ /৭৫
তোমার ছায়াও অনেক ঘন... /৭৫

**উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ করুণা /৭৬**

উম্মতের চিন্তায় নবীজির ক্রন্দন /৭৯
নবীজির দু'আর নিদর্শন /৭৯
নবীজির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য /৮০
প্রত্যেক নবীকে প্রদত্ত একটি দু'আর অধিকার /৮০
কেয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মাদীর পরিচিতি /৮০
বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ /৮১
আদমের মিরাস থেকে নবীজির অধিক অংশ /৮১
কেয়ামতের দিনে উম্মতে মুহাম্মদীকে সিজদার হুকুম /৮২
উম্মতের ব্যাপারে চিন্তার অবসান /৮২
কেয়ামতের দিনে আদমের সন্তানদের অবস্থা /৮৪
আদম আলাইহিস সালামের কাছে আবেদন /৮৪
নূহ আলাইহিস সালামের প্রতি আবেদন /৮৫
ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি আবেদন /৮৬
মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি আবেদন /৮৭
ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি আবেদন /৮৮
নবীজির প্রতি সুপারিশের আবেদন /৮৮
আবুবকর (রাযি.)-এর হিসাব /৮৯
ওমর (রাযি.)-এর হিসাব /৮৯
ওসমান (রাযি.)-এর হিসাব /৮৯
আলী (রাযি.)-এর হিসাব /৯০
পুলসিরাতের ভ্রমণ /৯০
নবীজির জান্নাতে প্রবেশ /৯১
জাহান্নামে মুসলিমদের প্রতি কাফিরদের কটাক্ষ /৯১
জাহান্নামে মুসলিমদের সাথে জিবরীল (আ.)-এর সাক্ষাত /৯২
নবীজির প্রতি গোনাহগার মুসলিমদের পয়গাম /৯২
মহা সুপারিশ /৯২
রহমানের আযাদপ্রাপ্ত বান্দা /৯৩

আযাদপ্রাপ্ত বান্দাদের ফরিয়াদ /৯৩
সুপারিশের জন্য দু'আ /৯৪

**নেসবতের আলো /৯৬**

نور ও ظلم -এর অর্থ /৯৬
আলোকিত ও আচ্ছন্ন অন্তর /৯৬
শরীয়তের অপছন্দনীয় বিষয়কে মন থেকে অপছন্দ করা /৯৭
কবীরা গোনাহ থেকে মুক্ত ব্যক্তি /৯৭
হালাল রিযিকের নূর /৯৭
আলোকিত অন্তরের বরকত /৯৭
নূর থেকে বঞ্চিত লোকদের দূরবস্থা /৯৮
নূর অর্জন করার মাপকাঠি /৯৮
আলোকিত চেহারার রহস্য /৯৯
হযরত খাজা আব্দুল মালিকের গ্রহণযোগ্যতা /৯৯
ইসলাম গ্রহণ করার বিস্ময়কর কারণ /৯৯
জঙ্গলে মঙ্গল /৯৯
হযরত মুরশিদের ইবাদাতের উচ্চতা /১০০
পাঁচ প্রকারের নূর /১০০
নেসবতের নূরের মর্ম /১০১
এক মহিলার ইসলাম গ্রহণ /১০১
ইসলামের মহত্ত্ব /১০২

**নেসবতের বরকতসমূহ /১০২**

মসজিদের মর্যাদা /১০২
এক বৃক্ষকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ওয়াদা /১০২
কুকুর জান্নাতে প্রবেশ করবে /১০৩
উট জান্নাতে যাবে /১০৩
সাকীনার বাক্সের বরকত /১০৩
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর জুব্বার বরকত /১০৪
নবীজির স্পর্শের বরকত /১০৪
কাপড়ের সাথে নেসবতের বরকত /১০৫
ঈমানের নেসবতের বরকত /১০৬
ধারাবাহিক নেসবতের বরকত /১০৭
মুফাসসিরগণের অভিমত /১০৭

ভালোবাসার বন্ধন /১০৭
নকশবন্দি সিলসিলার নেসবতের বরকত /১০৮
নেসবতের বরকতে দু'আ কবুল হয় /১০৮
জান্নাতে আদম আলাইহিস সালামের উপনাম /১০৯
বেশ্যা নারীর ওপর নেসবতের বরকত /১০৯
হযরত শিবলি (রহ.)-এর নেসবতের বরকত /১১০
আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কামনা /১১১
হযরত পীর মেহের আলী শাহ এবং নেসবতের বরকত /১১২
না'তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম /১১২
আল্লাহর নামের বরকত /১১২
একটি বিস্ময়কর সূক্ষ্ম বিষয় /১১৩
ইমাম রাযী (রহ.)-এর নিকট বিসমিল্লাহর বরকত /১১৪
আমাদের সার্বিক জগত /১১৪
মৃত্যুর সময় নেসবতের বরকত /১১৫
খাজা ফযল আলী কুরাইশীর ফরমান /১১৫
ইমাম রাযী (রহ.)-এর ঈমানের হেফাযত /১১৫
অগ্নিপূজকের হাত কেন জ্বলল না? /১১৬
পুরো কবরস্তানবাসীর ক্ষমা /১১৬
দু'আর কারণে নিরাপত্তা /১১৭
দেখার পার্থক্য /১১৮
ধারণা অনুযায়ী আচরণ /১১৮
একটি ঘটনা /১১৯
সুরাকার হাতে কিসরার বালা /১২০
যুবকদের বালা /১২০
দুজন নবীর সাথে আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর আচরণ /১২০
নিয়ত ঠিক করুন /১২২
ফকীরের কাজ /১২২
আরেকটি আকর্ষণীয় সূক্ষ্ম কথা /১২৩
আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় পুরস্কার /১২৩
বুদ্ধিমতী স্ত্রী /১২৪

**মনীষীদের বিস্ময়কর কিছু ঘটনা /১২৮**
আল্লাহ তা'আলার বাহিনী /১২৮
দারুল উলূম দেওবন্দের অবদান /১২৮
**হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.) /১৩০**

ইত্তেবায়ে সুন্নত /১৩১
এক মাসে হেফয /১৩১
ইল্‌মের পূর্ণতার পাঁচটি কারণ /১৩১
ওস্তাদের প্রতি সম্মান /১৩১
মুরশিদের প্রতি সম্মান /১৩২
তাওয়াজ্জুহর প্রভাব /১৩২
হযরত নানুতবি (রহ.)-এর প্রভাব /১৩৩
নম্রতার সাথে উপদেশ /১৩৩
তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা /১৩৩
গরিবি হালত /১৩৪
শানে ইস্‌তিগনা বা পরবিমুখতা /১৩৪
বিনয় /১৩৪
স্বপ্নের ব্যাখ্যায় দক্ষতা /১৩৪
একটি প্রশ্নের দুটি উত্তর /১৩৫
খাদেমের খেদমত /১৩৫
ছাপাখানায় চাকরি /১৩৫
হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর সাথে অকৃত্রিম সম্পর্ক /১৩৬
হাজরে আসওয়াদ প্রসঙ্গ /১৩৬
ইসলামের ভালোবাসায় ইহত্যাগ /১৩৭
প্রকৃত অনুসন্ধান হলে এমনই হয় /১৩৭
তাকবীরে উলা ছুটে যাওয়ার কারণে আফসোস /১৩৭
বিনয় প্রকাশ /১৩৮
ইল্‌ম অর্জন করার বিস্ময়কর পদ্ধতি /১৩৮
খাওয়ার মাঝে বিনয় প্রকাশ /১৩৮
কিতাব অধ্যয়নে আগ্রহ /১৩৮
কালিমায়ে তাইয়্যেবার বরকত /১৩৮
অমুখাপেক্ষিতা /১৩৯
কৃত্রিমতা থেকে দূরে থাকা /১৩৯
মেধার ঘটনা /১৪০
শৈশবকালের একটি স্বপ্ন /১৪০
নবীজির মহব্বত /১৪০
ইসলামের উপস্থাপনা /১৪১
আর্য সমাজের সংশোধন /১৪১

**হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.) /১৪৩**
সোহবতের বরকত /১৪৪
অক্ষমতা ও এর ব্যাখ্যা /১৪৪
বাদশাহী মর্যাদা /১৪৫
অন্যকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন /১৪৫
তাসাওউফ অর্জন /১৪৫
গোনাহ হয়ে যাওয়ার সাথে-সাথে তাওবা করা উচিত /১৪৫
তাওয়াসসুলের মাসআলা /১৪৬
স্থায়ী বন্ধুত্বের আলামত /১৪৬
পদের লোভের অপকারিতা /১৪৭
তাসাওউফে বেয়াদবি দস্যুর ভূমিকা রাখে /১৪৭
কাশফের অধিকারী বুযুর্গের দু'আ করতে লজ্জাবোধ /১৪৮
হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহর সন্তানের মর্যাদা /১৪৮
ধৈর্য থাকবে তো এমনই থাকা চাই /১৪৮
মিসকিনের তাবাররুক /১৪৯
বিনয় /১৪৯
এক ডাকাতের ঘটনা /১৫০
বায়'আতের বরকত /১৫০
শায়খের পরিচয় /১৫১
চেলা ও গুরু হওয়ার বাসনা /১৫১
সরলতা /১৫১
দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি /১৫১
নামাযে ক্রন্দন /১৫২
নামায কাজা করতে অস্বীকৃতি /১৫২
রিয়াজত ও মুজাহাদা /১৫২
মুরশিদের পক্ষ থেকে পরীক্ষা /১৫৩
কারো জন্য বদ দু'আ করতেন না /১৫৩
অক্ষমতা ও বিনয় প্রকাশ /১৫৩
হালাল উপার্জনের চেষ্টা /১৫৪
আখলাকের উচ্চতা /১৫৪
হযরতের প্রভাব /১৫৪
সুন্নতের অনুসরণ /১৫৫
সংবেদনশীল স্বভাব /১৫৫
নামাযের আগ্রহ ও গায়েবি নিরাপত্তা /১৫৭

হযরতের হাতে শিফা /১৫৭
দৃঢ়তা /১৫৮
বোঝানোর অপূর্ব দক্ষতা /১৫৮
অনুসন্ধান এমনই হওয়া উচিত /১৫৮
চায়ে বরকত /১৫৯
সূর্যের সাথে ঘড়ির টাইম মেলানোর ঘটনা /১৬০
**শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.) /১৬১**
ইল্‌মে পরিপক্বতা /১৬২
শেষ পরিণতি সম্পর্কে ভয় /১৬৩
ঈসায়ী পাদ্রীর সাথে বিতর্ক /১৬৩
দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা /১৬৩
প্রিয় বস্তুর কুরবানি /১৬৪
সুন্নতের অনুসরণ /১৬৫
মামূলাতের পাবন্দি /১৬৫
দুনিয়াদার থেকে বিমুখতা /১৬৫
বিনয় প্রকাশ /১৬৬
শায়খের প্রতি মহব্বত /১৬৭
**আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.) /১৬৭**
ইল্‌মি ইসতিফাদা /১৬৮
অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি /১৬৮
মাসআলার তাৎক্ষণিক সমাধান /১৬৯
মুখস্থশক্তির জন্য দু'আ /১৬৯
ইল্‌মের কবর...! /১৬৯
ইল্‌মের আদব /১৭০
এক পীরের তাওয়াজ্জুহের ঘটনা /১৭০
চেহারায় নুরের বিচ্ছুরণ /১৭১
একাকি অবস্থায় মুলাকাতে অস্বীকৃতি /১৭১
দৃঢ়তা ও সাহসিকতা /১৭১
আলোকিত আকৃতি /১৭২
চেহারা দ্বারা ইসলামের দাওয়াত /১৭২
দৃষ্টির পবিত্রতা /১৭৩
হারাম উপার্জন থেকে হেফাযত /১৭৪
ইল্‌মের মহত্ত্ব /১৭৪
কিতাবের আদব /১৭৪

ওস্তাদের আদব /১৭৫
ধনাঢ্য লোককে এড়িয়ে চলতেন /১৭৫
ইল্‌মের মহত্ত্ব ১৭৫
ওস্তাদের খেদমত /১৭৬
**হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.) /১৭৭**
ওস্তাদের খেদমত /১৭৮
খেদমতের বরকত /১৭৯
খতমে বুখারির মজলিস /১৭৯
বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনাবলি /১৭৯
সৃষ্টি থেকে অমুখোপেক্ষিতা /১৮০
হাত কাজ করছে; অন্তর বন্ধুকে নিয়ে মেতে আছে /১৮১
সরলতা ও অকৃত্রিমতা /১৮১
প্রভাব ও প্রতিপত্তি /১৮২
উচ্চমানের আখলাকের নমুনা /১৮২
অল্পে তুষ্টি /১৮৩
অমুখাপেক্ষিতা /১৮৩
পিতামাতার আনুগত্য /১৮৪
মাখলুকের খেদমত /১৮৪
ব্যবহারের বদলা /১৮৫
গ্রেফতারি পরোয়ানা /১৮৫
খাবারের মধ্যে বরকত /১৮৬
অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া ও আত্মত্যাগ /১৮৬
অবিচলতা /১৮৭
**হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) /১৮৮**
হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর সাথে আন্তরিকতা /১৮৮
বাচ্চাদের তরবিয়ত /১৮৯
সারা জীবনের দায়িত্ব /১৮৯
কুরআন তেলাওয়াত /১৯০
আকাবিরগণের সাথে মহব্বত /১৯০
শিক্ষার প্রতি মনোযোগ /১৯১
দুনিয়াবিমুখতা /১৮১
পরোপকারের এক আশ্চর্য ঘটনা /১৯১
কবিতা-সাহিত্যের মজলিস /১৮১

লেখালেখির প্রতি ঝোঁক /১৯২
সম্পদের প্রতি অনীহা /১৯২
তাবলীগি সাথীদের সাথে মহব্বত /১৯২
তাকওয়ার দৃষ্টান্ত /১৯৩
তাসাওউফ ও সুলুকের হাকীকত /১৯৩
মুরশিদের সতর্কতা /১৯৪
মিশকাত শরীফের সবকের সূচনা /১৯৫
আকাবিরগণের আরামের প্রতি বিশেষ খেয়াল /১৯৫
আকাবিরগণের তাকওয়া /১৯৫
বিনয় প্রকাশ /১৯৬
অভাব ও দরিদ্রতা /১৯৬
দরসে হাদীছের পাবন্দি /১৯৭
**হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) /১৯৮**
শিক্ষা ও দীক্ষা /১৯৯
এক নবাবের অসৌজন্যমূলক আচরণ /২০০
এক নেতৃত্বস্থানীয় লোকের চিকিৎসা /২০০
ইংরেজের দাওয়াত /২০১
ইংরেজের দাওয়াত /২০২
আল্লাহর ওপর ভরসা /২০২
আখেরাতের ফিকির /২০৩
মামূলাতের পাবন্দী /২০৩
ভরসা ও অল্পে তুষ্টি /২০৩
যিকির ও শোগলের তরবিয়ত /২০৪
**মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারি (রহ.) /২০৫**
শ্রোতাদের নসীহত /২০৬
পানাহারের রুটিন /২০৬
হাদিয়া কবুল করার শান /২০৭
ওয়াদা পূরণ /২০৭
বাস্তবতার প্রকাশ /২০৭
জেলে যাওয়ার কারণ /২০৮
বক্তৃতার প্রভাব /২০৮
ছাত্রদের প্রতি মমতা /২০৯
ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সম্পর্ক /২০৯

হযরত শাহ্ আব্দুল কাদের রায়পুরি (রহ.) /২১০
অধ্যয়নের আগ্রহ /২১১
আত্মার অবস্থায় শক্তিবৃদ্ধি /২১১
এক মজলিসের ঘটনা /২১২
শায়খের মহব্বত /২১২
সুন্দর ও চাকচিক্যের মাপকাঠি /২১৩
নবীপ্রেম /২১৩
বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশ /২১৩
দানশীলতার ঘটনা /২১৪
দানের পরিমাণে ঢেউ /২১৪
মমতার ঘটনা /২১৪
হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) /২১৬
দাওয়াত ও তাবলীগ /২১৭
সমস্ত আমলের মাপকাঠি /২১৮
বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশ /২১৮
আখেরাতের চিন্তা /২১৯
দাওয়াত দিতে থাকো /২১৯
স্থান ও অবস্থা বুঝে কথা বলা /২২০
অনর্থক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা /২২০
আত্মার খাদ্য /২২১
দুর্বলতা ও অসুস্থতা /২২১
জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে গুরুত্ব /২২২
দু'আ করার সময় অবস্থা /২২২

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

# সূচি নির্দেশিকা

## খুতুবাতে যুলফিকার-৮


তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় করো /২২৮
শুকরিয়ার আলোচনা /২২৮
বর্তমান যুগে বস্তুবাদী নেয়ামতের প্রাচুর্য /২২৮
অকৃতজ্ঞতা বেড়ে গেছে /২২৯
অধিক খেয়ে মৃত্যুবরণকারী /২২৯
আল্লাহ তা'আলার হুকুম /২২৯
প্রথম বড় নেয়ামত /২৩০
সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ /২৩০
চিন্তা করে দেখুন /২৩০
দ্বিতীয় বড় নেয়ামত /২৩১
তৃতীয় বড় নেয়ামত /২৩১
শরীরের উত্তম ব্যবস্থাপনা /২৩২
খাদ্যনালীর ভাল্‌ভ /২৩৩
শয়নবঞ্চিত এক ডাক্তার /২৩৩
চোখের পাতা /২৩৪
হাঁপানী রোগীর অস্থিরতা /২৩৪
এক পেয়ালা পানির মূল্য /২৩৪
সন্তান কত বড় নেয়ামত! /২৩৫
ভিক্ষুক নারীর মূল্য /২৩৫
নিজের সময়কে ভুলো না /২৩৬
এক বেয়াদবের ধৃষ্টতা /২৩৬
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /২৩৬
অহংকারের কথা /২৩৮
একটি সোনালি মূলনীতি /২৩৯
অহংকারের শাস্তি /২৩৯
শোকরের অর্থ /২৪০
শুকরিয়ার অনুভূতি পয়দা করা /২৪০

যবানী শুকরিয়া /২৪১
শারীরিক শুকরিয়া /২৪১
নেয়ামতসমূহ চলমান রাখার জন্য সহজ ব্যবস্থা /২৪১
কওমে সাবার দৃষ্টান্তমূলক পরিণাম /২৪২
অভাব, অপমান ও ভয়ের পোশাক /২৪৪
আমাদের অভিযোগের চিকিৎসা /২৪৪
অভিযোগের পট্টি /২৪৫
স্বামী-স্ত্রীর অভিযোগ /২৪৫
শোকরকারী ভিক্ষুকের মনোরঞ্জন /২৪৫
শুকরকারী স্ত্রীর মর্যাদা /২৪৬
একটি সূক্ষ্ম বিষয় /২৪৭
হজের সফরে শুকরিয়া প্রকাশ /২৪৭
আমাদের অন্তরে বস্তুর প্রভাব /২৪৯
হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া /২৪৯
রিযিক পৌঁছানোওয়ালা পিওন /২৫০

**ইল্‌মের ফযীলত /২৫২**
অস্থায়ী ও স্থায়ী জীবন /২৫২
ফেরেশতাদের ওপর আদম আলাইহিস সালামের মর্যাদা /২৫৩
আদম আলাইহিস সালামের পুরস্কার /২৫৪
সর্বপ্রথম ইসরাফীল আলাইহিস সালাম সিজদা করেছেন /২৫৪
ইল্‌মের মর্যাদা /২৫৫
আদম আলাইহিস সালাম ও কারিগরি শিল্প /২৫৬
হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম ও লেখার ইল্‌ম /২৫৬
নূহ আলাইহিস সালাম ও হালাল হারামের জ্ঞান /২৫৬
শরীয়তের পূর্ণতা /২৫৭
নবীগণ ও বিশেষ ইল্‌ম /২৫৭
ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তর্কবিদ্যা /২৫৭
ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও স্বপ্নবিদ্যা /২৬০
একটি সূক্ষ্ম বিষয় /২৬০
দাউদ আলাইহিস সালাম ও বর্ম তৈরির জ্ঞান /২৬২
সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও পাখির সাথে কথা বলার জ্ঞান /২৬৩
ইল্‌মের কারণেই হুদহুদ পাখির সাহসী ভূমিকা /২৬৩
আসিফ ইবনে বারখিয়ার মর্যাদা /২৬৪
খিযির আলাইহিস সালাম ও জাগতিক বিদ্যা /২৬৫

ইবাদাতের পূর্ণতা /২৬৫
আলেমের মর্যাদা /২৬৬
আলেমদের মূল দায়িত্ব /২৬৭
ইল্‌মের উদ্দেশ্য /২৬৮
ইখলাসের তাজমহল /২৬৮
ফয়েজ পেতে একটি শর্ত /২৬৯
শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.)-এর ফয়েজ /২৬৯
হযরত মাওলানা গোলাম রাসূল (রহ.)-এর মর্যাদা /২৬৯
খাজা আব্দুল্লাহ বাহলুবীর সোহবতের বরকত /২৭১
মেহনতের চাকা /২৭১
আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ /২৭১
কল্যাণের ফয়সালা /২৭২
হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর দৃঢ়তা /২৭২

**ইল্‌ম ও আলেম সমাজের মর্যাদা /২৭৬**

কুদরতের কীর্তি /২৭৬
জীবনের উদ্দেশ্য /২৭৭
বেলায়াতের স্তরসমূহ /২৭৭
ইল্‌ম ও আমলের সৌভাগ্য /২৭৮
ইল্‌ম অর্জনের স্বভাবজাত চেতনা /২৭৮
অঙ্গের প্রকারসমূহ /২৭৮
তালিবুল ইল্‌মের ফযীলত /২৭৯
আলেমের মর্যাদা /২৭৯
জাগতিক শিক্ষা ও দ্বীনি শিক্ষা /২৮০
ইল্‌ম অনুযায়ী আমল /২৮১
পৃথিবী ও ইল্‌মের সূর্য /২৮১
আবেদের ওপর আলেমের ফযীলত /২৮২
জান্নাতেও আলেমগণের নের্তৃত্ব /২৮২
আলেমগণের ঘুমও ইবাদাত /২৮৩
শহীদের ওপর আলেমগণের ফযীলত /২৮৩
ইল্‌মি সুওয়ালের ফযিলত /২৮৪
ইল্‌ম অর্জনের জন্য মুজাহাদা জরুরি /২৮৬

**পূর্বসূরীদের ইল্‌মি নিমগ্নতা /২৮৭**

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ইল্‌মি নিমগ্নতা /২৮৭
ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অধ্যয়নে নিমগ্নতা /২৮৭

হযরত শাহ আব্দুল আযীযের ইল্‌মি নিমগ্নতা /২৮৮
বর্তমান ছাত্রদের অবস্থা /২৮৮
উদ্দেশ্য একটিই /২৮৯
ওস্তাদের মূল্যায়ন /২৯০
প্রকৃত ছাত্র হয়ে যান /২৯১
আলেম ও সাধারণ লোকের তাওবার মাঝে পার্থক্য /২৯১
আল্লাহর প্রিয় /২৯২
ইল্‌ম অনুযায়ী আমল গড়ে তুলুন /২৯২
আকাবিরের ইল্‌ম অনুযায়ী আমল /২৯৩
এক বালিকার উপদেশ /২৯৪

## ঈমানের মহত্ত্ব /২৯৮

ঈমানদারকে ঈমান আনার হুকুম /২৯৮
মুখে স্বীকার ও অন্তরে বিশ্বাস /২৯৮
সর্বক্ষেত্রে জয়ী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা /২৯৯
ঈমানের নিদর্শন /৩০০
ঈমানদারের মুআমালা এমনই হয় /৩০০
চিন্তা করে দেখুন /৩০০
ঈমানের অবস্থান /৩০১
একটি হৃদয়গ্রাহী ঘটনা /৩০১
ঈমান ও মুশাহাদার পার্থক্য /৩০১
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা /৩০২
বিস্ময়কর ঈমান /৩০৪
অবিচল থাকার গুরুত্ব /৩০৫
জীবন অতিবাহিত করার দুটি অবস্থা /৩০৫
প্রথম উদাহরণ /৩০৫
দ্বিতীয় উদাহরণ /৩০৬
তৃতীয় উদাহরণ /৩০৭
আল্লাহর হুকুমের ওপর উঠে যাও /৩০৭
মানুষ ও পরীক্ষা /৩০৮
প্রতিটি মুহূর্তই পরীক্ষা /৩০৯
অবস্থার পরিবর্তন /৩০৯
পরীক্ষায় ফেলার উদ্দেশ্য /৩০৯
ঈমানের পরীক্ষা /৩১০
রিযিকের দরজা বন্ধ হওয়ার মূল কারণ /৩১০

পরীক্ষাকে খুশির সাথে গ্রহণ করা চাই /৩১১
মূসা নবীর মায়ের ঈমানি ঘটনা /৩১১
ঈমানের হেফাযত /৩১৫
আল্লাহওয়ালাগণের অবিচলতা /৩১৬
দুর্বল বৃদ্ধার অবিচলতা /৩১৭
সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ /৩১৮
এক যুবকের অবিচলতা /৩১৯
সাহাবীগণের কাছে ঈমানের মূল্য /৩২০
সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি /৩২০
সন্দহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে /৩২০
ঈমান প্রকাশ করার মাধ্যম /৩২১
দৃঢ় ঈমানের নিদর্শন /৩২১
ঈমানের পাথর /৩২২
কম বেশির চক্কর /৩২২
ইসলাম ও ঈমানের মাঝে পার্থক্য /৩২৩
মুনাফিকদের খোটা দেওয়ার ঘটনা /৩২৩

## ইসলামের প্রহরী /৩২৬

সৌভাগ্যের মাপকাঠি /৩২৬
অধঃপতনের যুগ /৩২৬
সাহাবীগণের সাক্ষ্য /৩২৬
নবীজির ইল্‌ম ও আমলের প্রহরী /৩২৬
মনিব ও গোলামের মাঝে অভূতপূর্ব সাদৃশ্য /৩২৭
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) ও সুন্নাতের অনুসরণ /৩২৭
নবীজির ফরমানের প্রতি গুরুত্ব /৩২৮
এক হাবশী সাহাবী ও সুন্নাতের অনুসরণ /৩২৮
আমাদের ইল্‌মি সাজারা /৩২৮
আলেমগণের মূল দায়িত্ব /৩২৯
তরুণ প্রজন্ম /৩২৯
বি.এ পাশ যুবতীর করুণ অবস্থা /৩৩০
মা-বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ /৩৩১
দীন হেফাযতের মূল কারণ /৩৩২
নবীজির দরদ ও ব্যথা /৩৩২
আবুজাহ্‌লের প্রতি ইসলামের দাওয়াত /৩৩৩

সবরের শেষ সীমা /৩৩৩
মেয়ে হবে তো এমনই হওয়া চাই! /৩৩৪
হযরত বিলাল (রাযি.)-এর ওপর যুলুম /৩৩৪
হযরত যানীরা (রাযি.)-এর ওপর যুলুম /৩৩৪
দীনের দুশমনের সামনে সিসার প্রাচীর ৩৩৫
সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর দৃঢ়তা /৩৩৫
ইমাম আবুহানিফা (রহ.)-এর ওপর যুলুম /৩৩৫
ইমাম মালিক (রহ.)-এর সাহস /৩৩৫
ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ওপর যুলুম /৩৩৬
ঈমানের চেরাগের প্রজ্বলন /৩৩৬
ভারত উপহাদেশে ফিরিঙ্গিদের যুলুম /৩৩৬
একটি বেদনাদায়ক সফর /৩৩৭
সবরের কঠিন মুহূর্ত /৩৩৮
নারী শিক্ষার গুরুত্ব /৩৩৯
সন্তানের বিগড়ে যাওয়ার কারণ /৩৩৯
নারী শিক্ষার বড় বাধা /৩৪০
নবীর উত্তরাধিকারের হেফাযত /৩৪০
মুসলমানের দুর্বলতা /৩৪০
দীন হেফাযতের দূর্গ /৩৪১

**দৃঢ়তার ফযীলত /৩৪৪**

শরীয়তের ওপর চলতে গিয়ে তিন রকমের বাধা /৩৪৪
ইসতিকামাতের অর্থ /৩৪৫
শায়খের সাথে নেসবতের বরকত /৩৪৫
গাছের সাথে বিস্ময়কর আলোচনা /৩৪৬
নবীজিকে ইসতিকামাতের আদেশ /৩৪৭
কুরআন ও সম্মান /৩৪৭
সাহাবীগণ ও আসবাব /৩৪৭
সাহাবায়ে কেরামের পরীক্ষা /৩৪৮
পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে আল্লাহই রক্ষাকারী /৩৪৮
ইসতাকামাতের সামনে পাহাড়ের মর্যাদা /৩৪৯
সাহাবীগণের বিজয়ের মূল রহস্য /৩৪৯
আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসার নিদর্শন /৩৫০

আহযাবের যুদ্ধে কাফিরদের পরাজয় /৩৫১
ঈমান যাচাইয়ের সময় /৩৫১
খালিদ ইবনে ওলীদ (রাযি.)-এর বীরত্ব /৩৫২
'ফুতুহুশ শাম' কিতাবের অবস্থান /৩৫৩
আলেমদের দায়িত্ব /৩৫৩
লোহার ছোলা /৩৫৫
আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা /৩৫৫
সাহাবী জিরার ইবনে আযওয়ার (রাযি.)-এর জিহাদ /৩৫৬
হযরত খাওলার বীরত্ব /৩৫৬
ঘোড়ার ইসতিকামাত /৩৫৬
আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদা /৩৫৮
মজবুত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা /৩৫৮
হযরত মুশাতা (রাযি.)-এর ইসতিকামাত /৩৫৯
হযরত আসিয়ার দৃঢ়তা /৩৬০
হযরত মুশাতা (রাযি.)-এর পুরস্কার /৩৬২
হযরত আসিয়া (রাযি.)-এর পুরস্কার /৩৬২
আল্লাহর রহমতের আশা /৩৬২

**ছিলেন তিনি মনের ওষুধবিক্রেতা /৩৬৬**

বড় একটা ব্যথা /৩৬৬
আল্লাহর রহমতের পাহারা /৩৬৬
হেফাযতের জন্য একটি মাসনুন দু'আ /৩৬৭
শায়খের বিরহের কষ্ট /৩৬৭
মহব্বত তো এমনই হয়! /৩৬৭
ঈমান বাকি থাকার মাধ্যম /৩৬৭
পীর ও মুরীদের চিরস্থায়ী মহব্বত /৩৬৮
হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের চিন্তা /৩৬৯
শায়খের ওফাতে রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর প্রতিক্রিয়া /৩৬৯
সময়ের দুর্লভ ব্যক্তিত্ব /৩৬৯
হযরত শায়খের দিবারাত্রির একটি ঝলক /৩৭০
নবীজির ওফাতে সাহাবায়ে কেরামের উপর প্রতিক্রিয়া /৩৭০
নবীজির আদর্শের তালকীন /৩৭১
বিপ্লবী লোকের করণীয় /৩৭২
আবুবকর (রাযি.)-এর শিক্ষণীয় বক্তৃতা /৩৭২

আমাদের দায়িত্ব /৩৭৩
হযরত শায়খের শেষ মুহূর্তের একটি ঝলক /৩৭৫
কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ুন /৩৭৫
হযরত শায়খের শিক্ষার সারসংক্ষেপ /৩৭৭
আত্মার জখমের মলম /৩৭৮

**উত্তম চরিত্র /৩৮০**
উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির মর্যাদা /৩৮০
উত্তম আখলাক ঈমানের মাপকাঠি /৩৮১
সর্বোত্তম বস্তু /৩৮১
চরিত্রের জয় /৩৮১
আখলাকের স্তর /৩৮২
ইসলামের সৌন্দর্য /৩৮৩
পৃথিবীতে ভাইয়ের গুরুত্ব /৩৮৪
আখেরাতে ভাইয়ের গুরুত্ব /৩৮৪
বিবাদের অবসান /৩৮৯
সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ /৩৯৮
সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম /৩৮৬
অতুলনীয় কীর্তি /৩৮৭
কল্যাণকামিতার প্রশংসা /৩৮৭
দীন ও কল্যাণকামিতার সম্পর্ক /৩৮৭
মুমিন ও কল্যাণকামিতা /৩৮৭
আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর প্রতিবেশিত্বর মূল্য /৩৮৭
মুমিন বান্দার মর্যাদা /৩৮৯
ভুলের অনুসন্ধান /৩৮৯
দোষ গোপন রাখার ফযীলত /৩৯০
মুমিনের মন খুশি করার ফযীলত /৩৯০
যবানের বিপদ /৩৯১
বদযবানীর পরিণতি /৩৯১
রাগ দমন করার ফযীলত /৩৯১
স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহারের বদলা /৩৯১
তরবিয়ত হারিয়ে গেছে /৩৯২
সোহবতের প্রভাব /৩৯২
খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়ার নসীহত /৩৯৩

# খুতুবাতে যুলফিকার

## সপ্তম খণ্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

# তোমরা আমাকে স্মরণ করো; আমি তোমাদের স্মরণ করব

'যেব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার উপর শয়তানকে চাপিয়ে দেন। এর চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কী হতে পারে যে, শত্রুকেই তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যথা- কেউ যদি কারো শত্রুর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাহলে ওই ব্যক্তি তাকে ওই শত্রুর হাওয়ালা করে দেয়।'

# তোমরা আমাকে স্মরণ করো; আমি তোমাদের স্মরণ করব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ.

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

## যিকিরের অর্থ

'যিকির' আরবি ভাষার শব্দ। কুরআনে এই শব্দটি কয়েক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ

'নিশ্চয়ই আমি এই নসীহতনামা নাযিল করেছি এবং আমিই এর রক্ষাকারী।'[১]

আলোচ্য আয়াতে যিকির শব্দটি কুরআন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দের অপর অর্থ হলো আল্লাহকে স্মরণ করা। বর্তমানে বিভিন্ন মাহফিলে যিকির শব্দ দ্বারা উপরোক্ত অর্থ বোঝানো হয়।

## আলেমগণের নিকট যিকিরের অবস্থান

আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা এমন একটি আমল, যাকে নফল কাজ বলে গণ্য করা হয়। দিন-দিন এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা মানুষের অন্তর থেকে যেন চলে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের কথা আর কী বলব; আলেমগণও এ ব্যাপারে উদাসীন হয়ে যাচ্ছেন। এ কারণেই আমাদের জীবন থেকে যিকিরের বরকত উঠে যাচ্ছে।

---

১. সূরা হিজর : আয়াত ৯

## প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী

আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি আমাদের খালেক (সৃষ্টিকর্তা), মালেক ও রিযিকদাতা। আমাদের উচিত, আমরা আমাদের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষীকে অন্তর থেকে মহব্বত করব। তাঁর নেয়ামতের কথা স্মরণ করে শুকরিয়া আদায় করব। তার মহব্বতের অনুভূতির সাথে জীবন অতিবাহিত করব। একমাত্র তাঁর সামনে ফরিয়াদ পেশ করব।

## আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু

শয়তান আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে এ সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا

'নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের শত্রু। তোমরা তাকে শত্রু মনে করো।'[১]

আবার যে শয়তানের ফাঁদে পড়ে গাফেল হয়ে যায়, তাকেও সতর্ক করেছেন।

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ . وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

'হে বনু আদম! আমি কি তোমাদের থেকে অঙ্গীকার নেইনি যে, তোমরা শয়তানের পিছে পড়বে না? সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। তোমরা শুধু আমারই ইবাদাত করো। এটিই সহজ-সরল পথ।'[২]

যারা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশনা অনুযায়ী চলে, তারা আল্লাহ তা'আলার দলভুক্ত। অপরদিকে যারা শয়তানের ফাঁদে পড়ে সে অনুযায়ী চলে, তারা শয়তানের দলভুক্ত।

## শয়তানের চেপে বসা

যেব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার উপর শয়তানকে চাপিয়ে দেন। এর চেয়ে কঠিন শাস্তি আর কী হতে পারে যে, শত্রুকেই তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যথা- কেউ যদি কারো শত্রুর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাহলে ওই ব্যক্তি তাকে ওই শত্রুর হাওয়ালা করে দেয়। বিষয়টি এমনই।

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ৩৫

২. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৬০-৬১

যেমনিভাবে কুরআনে বলা হয়েছে-

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيْنٌ

'যে রহমানের যিকির থেকে চক্ষু সরিয়ে নেয়, আমি তার উপর শয়তানকে চাপিয়ে দেই। তখন শয়তান সার্বক্ষণিক তার সঙ্গী হয়ে যায়।'[১]

কুরআনের উপরোক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, এরকম ব্যক্তি শয়তানের ফাঁদে পড়ে যায় আর শয়তান তার সব কিছুর কর্তা হয়ে যায়।

## শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচার পদ্ধতি

শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচার জন্য আমাদের সর্বাধিক কার্যকরী ওষুধ হলো আল্লাহ তা'আলার যিকির। যিকির করলেই শয়তানের আক্রমণ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا

'যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তারা শয়তানের দল দ্বারা আক্রান্ত হলে আল্লাহকে স্মরণ করে।'[২]

তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। একটি উদাহরণ শোনা যাক। আবরাহা যখন স্বীয় বাহিনী নিয়ে কাবা ঘরের ওপর হামলার উদ্দেশ্যে রওনা হলো, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ঘর রক্ষা করার জন্য ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি পাঠালেন। উক্ত পাখিগুলো ওপর থেকে কংকর নিক্ষেপ করে আবরাহার বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করে দিল। ঠিক তদ্রূপ মানুষের অন্তরও আল্লাহ তা'আলার ঘর। হে বান্দা! শয়তান যখন আবরাহার মতো তোমার ঘরে হামলা করে, তখন তুমিও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পিটুনি লাগাও। কারণ, এই যিকির তখন ওই কংকরের মতো শয়তানকে ধ্বংস করবে, যা শয়তান আবরাহাকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিল।

## অন্তর পরিচ্ছন্ন করার যিম্মাদার কে?

এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, অন্তর যদি আল্লাহ তা'আলার ঘর হয় আর আল্লাহ তা'আলা চান যে, এই ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকুক, তাহলে তিনি নিজেই তা পরিষ্কার করে দেন না কেন?

---

১. সূরা যুখরুফ : আয়াত ৩৬

২. সূরা আ'রাফ : আয়াত ১০২

আলেমগণ এর উত্তরে বলেছেন, এসব হাদীস নয় ১/৭৮

'এ অন্তর আল্লাহ তা'আলার ঘর। আমরা এর মেজবান আর আল্লাহ তা'আলা হলেন মেহমান। মেজবানের উচিত ঘরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, যাতে মেহমান উক্ত ঘরে আগমন করতে পারেন।

## রহমানের অবস্থান

আল্লাহ তা'আলা যেন হয়রান হয়ে বলতে থাকেন, হে বান্দা! আমি তোমার জন্য শয়তানকে তোমার ঘর থেকে অর্থাৎ জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছি। তুমি কি আমার জন্য আমার ঘর অর্থাৎ তোমার অন্তর থেকে শয়তানকে বের করে দিতে পার না? যখন শয়তান অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে, তখন ওই অন্তরে রহমানের জায়গা হবে।

## শয়তানের ভয়ংকর অস্ত্র

সাধারণত যখন কেউ স্বীয় শত্রুর ওপর জয়লাভ করে, তখন সে সর্বপ্রথম তার শত্রুর কাছ থেকে ওই বস্তু ছিনিয়ে নেয়, যা তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়। যথা- কোনো সৈন্য যখন শত্রুকে আটক করে, তখন তাকে বলতে থাকে 'হ্যান্ডস আপ, হ্যান্ডস আপ'। এর অর্থ হলো, তুমি হাত ওপরে উঠাও, যাতে আমি তোমার হাতের ধ্বংসাত্মক বস্তু থেকে নিরাপদ থাকি। এজন্যই কুরআনের বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, শয়তান যখন কারো উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়, তখন সবার আগে তাকে আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল করে দেয়। কারণ, শয়তান থেকে বাঁচার জন্য মানুষের সর্বাধিক কার্যকর অস্ত্র হলো আল্লাহ তা'আলার যিকির। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ

'শয়তান তাদের ওপর চেপে বসেছে। সে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার যিকির থেকে ভুলিয়ে দিয়েছে।'[১]

শয়তান তাদের কাছ থেকে সবার আগে ওই বিষয় ছিনিয়ে নিয়েছে, যা তার জন্য সর্বাধিক ভয়ংকর ছিল। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার যিকির।

## ফরজ হুকুমের উপর শয়তানের হামলা

যখন শয়তান মানুষকে আল্লাহ তা'আলার যিকির থেকে গাফেল করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়। তখন তারপর আস্তে আস্তে তাকে নামায ও

---

১. সূরা মুজাদালা : আয়াত ১৯

অন্যান্য ফরজ হুকুম থেকে সরিয়ে দেয়। মানুষ থেকে এ হুকুমগুলো ছুটে যেতে থাকে। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ.

'শয়তান মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়।'[১]

দেখুন, এখানে আগে যিকিরের কথা এবং পরে নামাযের কথা বলা হয়েছে। কেননা, এটা শুরু হয় যিকির থেকেই। যখন শয়তান মানুষকে আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল করে দেয়, তখন যেন আত্মরক্ষার প্রথম প্রাচীররেখা ভেঙে পড়ে। তারপর দ্বিতীয় আঘাত মানুষের নামায ও অন্যান্য ফরজ আহকামের ওপর পড়ে। এ কারণে যেব্যক্তি স্বীয় নামাযকে বাঁচাতে চায়, তার উচিত বেশি-বেশি আল্লাহর যিকির করার মাধ্যমে ফরজ আহকামের সীমানা প্রাচীরকে রক্ষা করা। বুদ্ধিমান ওই ব্যক্তি, যে স্বীয় শত্রুকে নিজ প্রাচীরের বাইরে রাখে – ভিতরে প্রবেশ করতে দেয় না।

নামাযের মধ্যে নামায থেকে মনোযোগ উঠে যায় যখন শয়তান কারো পিছনে লাগে এবং দেখে, তার অন্তরে আল্লাহ তা'আলার স্মরণ নেই, তখন সে তার নামাযে ওয়াসওয়াসা দেয়। ফলে দাঁড়ানো অবস্থায় তাশাহহুদ পড়ে আর বসা অবস্থায় ফাতিহা পড়া শুরু করে। সে নামাযের ভিতরে থেকে যেন নামাযের বাইরে থাকে।

কত বড় আশ্চর্যের কথা! আমরা সারাদিন দোকানে থাকি। কিন্তু নামাযের সময় ওই দোকান আমাদের ভিতর ঢুকে পড়ে। এমতাবস্থায় এটা শুধু উপস্থিত হওয়া বলে গণ্য হয়। অন্তরের হুযুরি হয় না। অথচ আল্লাহ আমাদের থেকে এ দুটি বিষয়ই কামনা করেন। এজন্য শারীরিক উপস্থিতি যেমন দরকার, তেমনি অন্তরের উপস্থিতিও আবশ্যক। হাদীছে বলা হয়েছে-

لَا صَلَاةَ إِلَّا بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ

'অন্তরের হুযুরি ছাড়া নামায হয় না।'

অন্য হাদীছে বলা হয়েছে, কেয়ামতের একটি আলামত হলো, মসজিদ তো লোকে পরিপূর্ণ থাকবে; কিন্তু তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল থাকবে।

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৯১

## নামাযের মধ্যে কবীরা গোনাহ

এক যুবক আমার কাছে এসে বলল, হযরত! আমি নামায পড়ছি আবার ওই অবস্থায়ই কবীরা গোনাহ করার পরিকল্পনা করছি। নামাযের মধ্যে এ অবস্থা যিকির থেকে উদাসীন থাকার ফলেই হয়েছে। শয়তানকে বাধা দিয়ে রাখা যায় না। এজন্য সুযোগ পেলেই ঘরের ওপর হামলা করে বসে।

## কেমন নামায দ্বারা প্রশান্তি লাভ হয়?

নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করা। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ

'তোমরা আমার স্মরণে নামায কায়েম করো।'[১]

যখন মানুষ নামাযের রোকনগুলো যথাযথভাবে আদায় করে খুশু-খুযুর সাথে আল্লাহর দিকে পূর্ণ মনোযোগী হয়ে নামায পড়ে, তখন উক্ত নামায দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয়। এর ফলে অন্তর আলোকিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে মানুষ গোনাহ ছেড়ে দেয়। এদিকে লক্ষ করেই ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

'নিশ্চয়ই নামায অশ্লীলতা ও অসৎ কাজ থেকে বাধা দেয়।'[২]

যদি আমাদের নামায আমাদের গোনাহ থেকে বাধা প্রদান না করে, তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের নামায হয়নি। যখন নামায নামাযের মতো হবে, তখন নামায সমস্ত মন্দ কাজ ও গোনাহ থেকে রক্ষা করবে।

## আওলিয়ায়ে কেরামের মতো নামায পড়ার আগ্রহ

আমাদের স্বীয় নামাযের ওপর মেহনত করতে হবে। মানুষ যদি নামাযের ওপর মেহনত করে, তাহলে নামাযের আকার অবশ্যই দূরস্ত হয়ে যাবে। এ উদ্দেশ্যেই লোকেরা আল্লাহওয়ালাদের হাতে বায়'আত হন। তাদের সাথে সম্পর্ক রেখে চলাফেরা করে।

আমাদের এক আকাবিরের কাছে এক আলেম এসে বলতে লাগলেন, হযরত! আমি আপনার কাছে এজন্যই উপস্থিত হয়েছি যে, আপনি আমাকে

---

১. সূরা তোয়াহা : আয়াত ১৪

২. সূরা আনকাবুত : আয়াত ৪৫

ওলীদের মতো নামায পড়িয়ে দিন। আজ তো লোকেরা শায়খের কাছে তাবিজের জন্য আসে, কাজ-কারবার উন্নতির জন্য দু'আ করানোর জন্য আসে। তারা বলে, স্ত্রী কথা মানছে না, সন্তান কথা শোনে না, অমুক অসুস্থ ইত্যাদি। বলুন তো এ উদ্দেশ্যে কে আসে, যে বলবে, আমি আপনার কাছে এসেছি, যাতে আমার নামায ঠিক হয়ে যায়? আমার রগ ও শিরা থেকে গোনাহের খোঁচা বের হয়ে যায়। হায়! যদি কেউ এসে এগুলো চাইত!

## শায়খের মর্যাদা

একব্যক্তি কোনো এক বুযুর্গকে বলল, আমার শায়খ অনেক বড় কামেল বুযুর্গ লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তা কিভাবে? সে বলল, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি; বাস্তবেই তিনি আল্লাহর ওলী। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিভাবে পরীক্ষা করলে? সে বলল, একবার আমার স্ত্রী রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেল। আমি শ্বশুরালয়ে গিয়ে আমার প্রতি শ্বশুরের অনুগ্রহের স্মৃতিচারণ করলাম, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। কিন্তু তিনি কোনোভাবেই তার মেয়েকে আমার সাথে যেতে দিলেন না। তিনি মানতেই চাইলেন না। আমি আমার শায়খের কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বললাম। শায়খ আমাকে একটি আমল বাতলে দিলেন। আমি ওই আমল করে শ্বশুরালয়ে যাই। আশ্চর্য! কোনো কিছু বলে উঠার আগেই আমার স্ত্রী আমার সাথে যেতে রাজি হয়ে গেল। তখন আমি বুঝলাম, আমার শায়খ অনেক উঁচু স্তরের ওলী। তখন উক্ত বুযুর্গ বললেন, হায়! তুমি তোমার শায়খের মর্যাদাই বুঝলে না। লোকটি বলল, না, হযরত! আমার অন্তরে শায়খের প্রতি যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। তখন বুযুর্গ বললেন, তুমি তোমার শায়খের কাছে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য যাওনি। তুমি তার কাছে গিয়েছ তোমার স্ত্রীর নৈকট্য অর্জন করতে।

## অন্তরের স্থিতিশীলতার একটি পন্থা

যেব্যক্তি পাবন্দির সাথে যিকির করে, আল্লাহ তাকে সমস্ত পেরেশানি থেকে রেহাই দেন।

এ কারণেই কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

أَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

'জেনে রাখো! আল্লাহর যিকির দ্বারা অন্তরের প্রশান্তি লাভ হয়।'[১]

---

১. সূরা রা'দ : আয়াত ২৮

এক কবি বলেছেন–

کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ

نیند کانٹوں پہ بھی آجاتی ہے آرام کے ساتھ

'তোমার নামের সাথে মিশে আছে কত প্রশান্তি। কাঁটার শয্যায়ও নির্বিঘ্নে ঘুম এসে যায়।'

অন্য এক কবি বলেছেন–

نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے

تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

'না দুনিয়া দিয়ে, না সম্পদ দিয়ে, না সংসার বাঁধা দিয়ে (কিছুতেই প্রশান্তি আসে না) কেবল আল্লাহর স্মরণেই অন্তরে প্রশান্তি আসে।'

## আল্লাহর নামের বরকত

আল্লাহর নামে অনেক আশ্চর্যজনক উপকারিতা ও স্বাদ রয়েছে। তাঁর নামে বরকতও লাভ হয়। কোনো কবি বলেছেন-

ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو

ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے

মানুষ যখন আল্লাহর নামের বেশি-বেশি যিকির করে, তখন একপর্যায়ে আল্লাহর নামের সাথেও মানুষের মহব্বত হয়ে যায়। মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করলে অন্তরে এক ধরনের শীতলতা অনুভূত হয়।

اللہ اللہ ایں چہ شیریں ہست نام

شیر و شکر می شود جانم تمام

'এই আল্লাহ-আল্লাহ যিকির কেমন পেয়ারা নাম যে, এই নাম মুখে উচ্চারণ করার দ্বারা আমার শরীর এমন হয়ে যায় যেমন দুধের মধ্যে চিনি মিশে যায়।'

اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے • عاشقوں کا مینا اور جام ہے

'আল্লাহ-আল্লাহ কী মায়াবী নাম!

এ তো আমাদের প্রেমপেয়ালা।'

## স্মরণ করার স্থান

মানুষের শরীরে স্মরণ করার স্থান হলো তার অন্তর। কোনো মা কি তার সন্তানকে চিঠিতে একথা লিখে যে, বেটা! আমার হাত, আমার চোখ, আমার যবান তোমার কথা মনে করছে না। বরং লিখে, আমার মনে তোমার কথা স্মরণ হচ্ছে। এর দ্বারা বোঝা গেল, স্মরণ অন্তরে হয়, অন্য কোথাও নয়। এজন্য আল্লাহর স্মরণও অন্তরে হয়। তাই মানুষের অন্তরে যখন আল্লাহর স্মরণ গেঁথে যায়, তখন কাজে লিপ্ত থাকাবস্থায়ও আল্লাহর যিকির করতে থাকে। তার যিন্দেগি তখন دست بکار دل بیار এর বাস্তব নমুনা হয়ে যায়।

## সর্বদা যিকির করা

আল্লাহওয়ালাদের জীবন তো এমনই হয় যে, তাঁদের একটি মুহূর্তও আল্লাহর যিকির ছাড়া অতিবাহিত হয় না। তাঁরা গাফেল থাকতেই পারেন না। কোনো এক কবি বলেছেন-

گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار
لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا

'যদিও আমি যামানার নিপীড়নের হাতে বন্ধক ছিলাম; কিন্তু তোমার স্মরণ থেকে গাফেল ছিলাম না।

এভাবে একপর্যায়ে মানুষের অবস্থা এমন হয় যে, আল্লাহকে ভুলে যেতে চাইলেও আর ভুলতে পারে না।

## দুই লোকের অন্তরের অবস্থা

হযরত খাজা শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী বলেন, আমি একবার বায়তুল্লাহর সামনে উপস্থিত হলাম। তখন দেখতে পেলাম, এক লোক কাবাঘরের গিলাফ ধরে কেঁদে-কেঁদে আল্লাহর কাছে দু'আ করছে। তখন আমি তার অন্তরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। আমি বুঝলাম, তার অন্তর ওই মুহূর্তে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল ছিল। তার মনে তখন একথা ছিল যে, আমার সাথে যে এসেছে, সে দেখুক, আমি কাবার গিলাফ ধরে দু'আ করছি।

তারপর আমি মীনায় গেলাম। সেখানে আমি এক দোকানদারকে দেখতে পেলাম। তার চারপাশে প্রচণ্ড ভিড় ছিল। তখন আমি তার অন্তরের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পেলাম, তার অন্তর একটি মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল নয়।

## একটি প্রশ্নের উত্তর

যদি কেউ বলে, আল্লাহওয়ালাগণ একটি মুহূর্তও আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল থাকেন না একথার ব্যাখ্যা কী?

এর জবাব হলো, যেমন– আপনার এক ভাইকে কোনো খালি পদে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য ডাকা হলো। তখন আপনার ঘরের সকলের এ বিষয়ে খুব সচেতনতা দেখা যায়। সবাই মিলে পরামর্শ করে, কিভাবে সে ইন্টারভিউতে সফল হতে পারে। আপনাকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে আপনি তার উত্তর বলে দিচ্ছেন, যখন সে ইন্টারভিউ দিতে রওনা হলো, তখন তাকে আপনি বুঝিয়ে দিয়ে বলছেন, এই-এই বিষয়টি মনে রাখবে। সময়মতো গিয়ে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। তারপর সে ইন্টারভিউ দিতে চলে যাওয়ার পর আপনি আপনার দফতরে কিংবা কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য বের হয়েছেন। তখনও আপনি ভাইয়ের জন্য দু'আ করছেন, যেন সে সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে। আপনি আপনার কর্মস্থলে চলে গিয়েছেন; কিন্তু আপনার মনে ভাইয়ের বিষয়টি উদিত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত অনেকক্ষণ পর আপনার মনে হচ্ছে, এখন তো সময় হয়ে গেছে। আমার ভাই হয়তোবা ঘরে পৌঁছে গেছে। এখন বাসায় ফোন করছেন। আপনার মা ফোন রিসিভ করলে সবার আগে আপনি আপনার ভাইয়ের খবর জিজ্ঞাসা করছেন। সুতরাং যদি আপনি আপনার কর্মঘণ্টার পুরোটা সময় অর্থাৎ ৮ ঘন্টাব্যাপী আপনার কাজের ফাঁকে-ফাঁকে আপনার ভাইয়ের চিন্তা মাথায় রাখতে পারেন, ঠিক তদ্রূপ আল্লাহওয়ালাগণও সর্বদা আল্লাহর স্মরণে সময় কাটিয়ে দিতে পারেন। একটি মুহূর্তও তাঁরা গাফেল থাকেন না।

## গোপনে যিকির করার ফযিলত

গোপন যিকির ও প্রকাশ্য যিকির উভয়টিই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হাদীছে বলা হয়েছে, ফেরেশতা যে যিকির শোনে অর্থাৎ যে যিকির যবান দ্বারা প্রকাশ্যে করা হয়, তা থেকে ওই যিকির সত্তর গুণ বেশি মর্যাদা রাখে, যা গোপনে অন্তর থেকে করা হয়। এই যিকিরকে কলবী যিকির, গোপন যিকির, খামেল যিকির, খফী যিকিরও বলে। একেই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন বা তাঁর প্রতি মনোযোগী হওয়া বোঝায়।

## আল্লাহর প্রতি মগ্নতা সৃষ্টির পন্থা

আল্লাহর প্রতি ধ্যান পয়দা করার জন্য প্রাথমিকভাবে সালেককে বলা হয়, তুমি আল্লাহ-আল্লাহ করো। যেমন- কুরআন পাঠকারী শিশুকে প্রথমে নূরানী

কায়দা পড়ানো হয়। এখন যদি কেউ বলে, হাদীছ শরীফে তো নূরানী কায়দা পড়ানোর কথা নেই, তখন তাকে বলা হবে, আরে বেকুব কোথাকার! এই নূরানী কায়েদা বাচ্চাদের বোঝানোর একটি মাধ্যম। যদি এটি পড়ানো না হয়, তাহলে শিশু হরফ চিনবে কিভাবে? আগে এটি পড়ানো হলে তার জন্য কুরআন পড়া সহজ হবে। এমনিভাবে যে প্রথমে আল্লাহ-আল্লাহ যিকির করে, এটি তার ভিতরে আল্লাহর ধ্যান পয়দা করার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। কেমন যেন প্রাথমিক অবস্থায় তাকে আল্লাহ-আল্লাহ নামের যিকির ওষুধ হিসেবে দেওয়া হয়।

## আল্লাহ-আল্লাহ যিকির -এর শরয়ী প্রমাণ

অনেকে বলে, আল্লাহ-আল্লাহ যিকির তো হাদীছ দ্বারা প্রামাণিত নেই। তবে হাদীছে সরাসরি এভাবে বলা হয়েছে যে, কিয়ামত হবে না, যতক্ষণ পযর্ন্ত আল্লাহ-আল্লাহ বলা হবে। এখানে দুবার আল্লাহ শব্দ বলা হয়েছে। যদি হাদীছে একবার এই শব্দ উল্লেখ হতো, তাহলে তো কথা ছিল না। কিন্তু হাদীছে তো দুবার বলা হয়েছে। যেহেতু হাদীছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ শব্দ দুবার বলেছেন, তাই আমিও দুবার করে বলব। এতে কোনো সমস্যা আছে? প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে ঘাবড়ানোর কিছু নেই।

## আল্লাহ-আল্লাহ যিকিরের স্বাদ

দেখুন, বাচ্চা যখন কাঁদে, তখন সে কী বলে? সে বলে, আম্মা-আম্মা। নাকি অন্য কোনো শব্দ বলে? আপনারা কেউ কি শুনেছেন, বাচ্চা কাঁদার সময় বলে, হে আমার প্রিয় আম্মা! হে আমার সুন্দর ভালো আম্মা! সে শুধু আম্মা বলে। তো আল্লাহর আলোচনা করতে গিয়ে আলহামদু লিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার ইত্যাদি সিফাতে ইলাহীর বর্ণনা করার তুলনায় শুধু আল্লাহ-আল্লাহ যিকিরের অবস্থা এমনই। বাচ্চা যখন আম্মা-আম্মা বলে চিৎকার করে, তখন এ শব্দ শুনে মায়ের কলিজা যেন ছিঁড়ে যায়। যত ব্যস্ততা থাকুক-না কেন, সব ফেলে দিয়ে মা বাচ্চার দিকে দৌড়ে আসে। বাচ্চার প্রতি মা মনোযোগী হয়। তাকে স্বীয় বুকের সাথে লাগিয়ে নেয়। ঠিক তদ্রূপ কেউ যখন আল্লাহ-আল্লাহ বলতে থাকে, তখন সে আল্লাহর মহব্বতের সাগরে ডুব দেয়। মূল কথা হলো, আমাদের অন্তরে এখনও আল্লাহ-আল্লাহ বলার স্বাদ আসেনি। যার স্বাদ অনুভব হয়, তার মুখে তা মিষ্ট মনে হয়।

চিন্তা করুন, মিষ্টি ও চাটনি দুটি শব্দ। এ শব্দদুটি মুখে উচ্চারণ করামাত্রই জিহ্বায় পানি চলে আসে। তাহলে কি আল্লাহ শব্দ দ্বারা অন্তরে স্বাদ অনুভূত

হবে না? এটি বড় আশ্চর্যের কথা যে, আচারের নাম মুখে নিলেই জিহ্বায় পানি এসে পড়ে; অথচ আল্লাহর নাম মুখে নেওয়া হবে আর অন্তরে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না এ হতেই পারে না।

## বু আলী সিনাকে স্পষ্ট জবাব

খাজা আবুল হাসান খিরকানি একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। বু আলী সিনা নামীয় এক পণ্ডিত তার সোহবতে এলেন। বুযুর্গ আল্লাহ-আল্লাহ যিকিরের ফযীলত বয়ান করতে লাগলেন। এর দ্বারা মানুষ শান্তি লাভ করে, পেরেশানি দূর হয়, বিপদ-মুসিবত থেকে উদ্ধার হয়, ঈমান শক্তিশালী হয়, সুস্থতা লাভ করা যায়, রিযিকে বরকত হয়, জীবন ও ইলমে বরকত নসিব হয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত পাওয়া যায় ইত্যাদি।

হযরত খিরকানি এ বিষয়ে এতো বয়ান করলেন যে, বু আলী সিনা হয়রান হয়ে গেলেন। তিনি পরে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত! এই এক শব্দেই এতো ফযীলত অর্জিত হয়? উপস্থিত হযরতগণও বিহ্বল হয়ে যাচ্ছিলেন। তখন আবুল হাসান খিরকানি লোকে লোকারণ্য মাহফিলে সবার সামনে বললেন, 'রে গাধা! তুই এর বুঝবি কী? ভরমাহফিলে একথা শুনে হাকীম বু আলী সিনার শরীরে ঘাম এসে গেল। তিনি ভাবতে লাগলেন, আমি এতো পরিচিত মানুষ আর আমাকে কিনা এভাবে সবার সামনে অপমান করে দিলেন!

যখন 'গাধা' শব্দ শুনে হাকীম সাহেবের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল, তখন হযরত খাজা সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাকীম সাহেব! কী হলো? আপনার অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেল কেন? হাকীম সাহেব বললেন, জি হযরত! আপনি শব্দটা এমনই বলেছেন। তখন খাজা সাহেব বললেন, আমি গাধা বললাম, আর এই গাধা শব্দটি আপনার অবস্থা পরিবর্তন করে দিল; তাহলে কি আল্লাহর নাম আপনার অবস্থা পরিবর্তন করে দিতে পারে না?

মূল কথা হলো, আমরা আল্লাহ শব্দের যিকিরের স্বাদ থেকে অপরিচিত হয়ে গেছি, যার কারণে এ প্রশ্ন অন্তরে উদিত হচ্ছে।

خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے
کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں

'আল্লাহ তোমায় কোনো তুফানের সাথে পরিচয় করিয়ে দিন। কারণ, তোমার সাগরের তরঙ্গে উত্তালতা নেই।'

যখন স্বভাব-প্রকৃতিতে কারো সাথে সম্পর্ক হয়, তখন তার নাম শুনলেই কান খাড়া হয়ে যায়। নাম নেওয়ার দ্বারা কি প্রতিক্রিয়া হয় না? পুরুষ হোক, মহিলা হোক নাম নেওয়ার দ্বারা মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

ভাই! এ তো সামান্য সম্পর্ক। তারপরও এর প্রতিক্রিয়া এতো হয়ে থাকে। অপরদিকে আল্লাহর সাথে মানুষের আরো গভীর সম্পর্ক হয়ে থাকে। তাই তাঁর নাম উচ্চারণ করার দ্বারা বান্দার অন্তরে প্রতিক্রিয়া হয়। আর বান্দা যখন আল্লাহর নাম নেয়, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকেও দয়া, করুণা ও রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয়।

## ফিকিরের সবকসমূহ

যখন মানুষ আল্লাহর প্রতি পূর্ণরূপে মনোযোগী হয়ে যায়, তখন তার চিন্তাধারায় সর্বদা আল্লাহর কথা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অবস্থা যিকিরের চেয়েও উত্তম। নকশবন্দিয়া সিলসিলার উচ্চ স্তরের যারা সবক নিয়ে থাকেন, তারা জানেন, সাত সবক পর্যন্ত যিকির করতে হয়। তারপর তাহলীলের (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকির) দুই সবক রয়েছে। তারপর আল্লাহ-আল্লাহ যিকির শেষ হয়ে যায়। আরেক যিকিরের সবক শুরু হয়। যেহেতু মানুষের অন্তরে গায়রুল্লাহ বা মাখলুকের প্রভাব বিস্তার করে, তাই মাখলুকের প্রভাব থেকে অন্তরকে মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের সালেককে পীর-মাশায়েখগণ আল্লাহ-আল্লাহ যিকিরে লাগিয়ে দেন। ফলে বান্দার যবান ও অন্তরে আল্লাহর স্মরণ পয়দা হয়। সে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একমাত্র আল্লাহর সাথে যেন মিশে যায়। তারপর তাকে আরো শোধন করার লক্ষ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকির করতে হয়। তারপর পরিপূর্ণ শোধন অর্জিত হওয়ার পর মুরাকাবায় নিমগ্ন করেন। তখন তার কোনো নামের যিকির করার প্রয়োজন হয় না। এ কারণে দশম সবক থেকে শুরু করে পয়ত্রিশ সবক পর্যন্ত যত মুরাকাবা করতে হয় ওগুলোর মধ্যে কোনো নামের যিকির করতে হয় না।

## লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর যিকির

আমাদের সিলসিলায় একজন বড় বুযুর্গ ছিলেন। এক লোক তাঁর কাছে এসে বলল, লা ইলাহা ইল্লাল্লার যিকির তো হাদীছে পাওয়া যায় না। আপনারা কোথায় পেয়েছেন? বুযুর্গ তাকে বললেন, কাছে আসো। সে এলে তিনি বললেন, মরণাপন্ন ব্যক্তির শয্যাপাশে বসে তাকে কালিমার তালকীনের কথা কি হাদীছে নেই, যাতে ওই ব্যক্তি মৃত্যুর আগে কালিমা পড়ে নিতে পারে? ওই লোক বলল, হ্যাঁ; আছে, বুযুর্গ বললেন, আমি আমার নফসকে

মৃত্যুর উপক্রম দেখতে পাই, তাই তাকে তালকীন করার লক্ষ্যে কালিমার যিকির করাই।

## 'যাতী বারকী'র তাজাল্লি ও 'যাতী দায়েমী'র তাজাল্লি

মনে রাখা চাই, যে-ব্যক্তি আল্লাহর গুণবাচক নামের যিকির বেশি-বেশি করে, যথা- সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ অথবা হাইউন, কাইয়ুম ইত্যাদির যিকির করে, তার যখন এভাবে যিকির করতে-করতে ফানা-এর স্তরে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়, তো যেহেতু তার মনে সর্বদা আল্লাহর গুণাবলির স্মরণ রয়েছে, তাই কিছুক্ষণের জন্য আল্লাহর সত্তার যিয়ারত সে লাভ করে। তারপর তার উপর সিফাতের পর্দা পড়ে যায়। এ ধরনের সালিক ব্যক্তি আল্লাহকে তার সিফাতের পর্দার মাধ্যমে দেখে থাকে। অপরদিকে যে সালিক শুধু আল্লাহ-আল্লাহ যিকির করে, তার আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অর্থাৎ– তার সাথে আল্লাহর যিয়ারতের মধ্যে কোনো পর্দা থাকে না।

এজন্য আমাদের নকশবন্দিয়ার উচ্চ স্তরের এক বুর্যুগ হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী একটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। তা হলো, যে-ব্যক্তি সিফাতের যিকির করে, যখন তার আল্লাহর পক্ষ থেকে তাজাল্লি অর্জিত হয়, তখন একে 'যাতী বারকী'র তাজাল্লি বলে। অর্থাৎ আল্লাহর তাজাল্লি তার উপর বিদ্যুতের তাজাল্লির মতো মনে হয় এবং তারপর তার উপর সিফাতের পর্দা পড়ে যায়। কোনো নববধূ ঘোমটা তুলে নিজেকে দেখাল। তারপর পুনরায় নেকাব ঢেকে দিল। কিন্তু যে সরাসরি আল্লাহর স্বত্তাগত নাম তথা আল্লাহ-আল্লাহ যিকির করে তার ওসলে উরয়ানী (وصل عریانی) অর্জিত হয়। অর্থাৎ একবার পর্দা উঠিয়ে নিলে তা আর ঢেকে দেওয়া হয় না। সব সময়ের জন্য যিয়ারত লাভ হয়। এই অবস্থাকে 'যাতী দায়েমী'র তাজাল্লি বলা হয়।

এখন সাধারণ মানুষ তো বলে, নকশবন্দিরা কেন সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, হাইউন, কাইয়ুম ইত্যাদি শব্দ যিকির করে না? ভাই! আপনি এই মারেফাত কিভাবে বুঝবেন? এটি ওই লোকই অনুভব করতে পারে, যে অন্ত র্চক্ষু দিয়ে আল্লাহর যিয়ারত লাভ করে। তারা এও বোঝেন যে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলির যে-পর্দা ওপরে এসে পড়ে, তা খানিক পেরেশানির কারণ হতে পারে। এ কারণেই আমাদের শায়েখগণ শুধু আল্লাহ-আল্লাহ যিকির সম্পর্কে বলেছেন। কেননা, ইরশাদ হয়েছে–

قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ

'বলো, আল্লাহ-ই। তারপর তাদেরকে নিরর্থক আলোচনারূপ খেয়ালে মগ্ন হতে দাও।'[১]

## দুই নম্বর পাগল

আজকাল আমাদের অন্তরের ওপর উদাসীনতার পর্দা পড়ে গেছে। এর কারণ হলো, আমরা যিকিরের প্রতি মনোনিবেশ করি না। কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, ভাই, কী আমল করছেন? তো উত্তর দিবে, ভাই, সময় পাওয়া যায় না। এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, কেউ কখনও বলে না, আমি খাওয়ার সময় পাই না। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতোই চলছে। যখন কেউ কোনো কাজে ব্যর্থ হয়, তখন আল্লাহকে খুব স্মরণ করে। পরে আর মনে থাকে না। কেউ যদি মজনুকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি লাইলাকে স্মরণ কর? তো সে যদি জবাব দেয়, আমার সময় নেই, তো আপনি তাকে কী বলবেন? এ কেমন মজনু হলো? সে তো দুই নম্বর মজনু। তো আমরাও এ রকম দুই নম্বর মজনুর মতো হয়ে গেছি।

## অন্তরের যিকিরের প্রমাণ

একথা বলতেই হয় যে, আল্লাহর যিকির সর্বদা অন্তরে রাখা চাই। আমাদেরকে তো হুকুম করা হয়েছে সর্বদা যিকিরে মশগুল থাকার জন্য। এখানে আমর-এর সীগাহ ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ

অর্থাৎ– আপনার অন্তরের মধ্যে। আপনার চিন্তা-চেতনা ও ধ্যাণ-ধারণার মধ্যে। কিভাবে স্মরণ করব? তাও বলে দেওয়া হয়েছে-

تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً

'ক্রন্দনরত ও ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়।'[২]

তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহ.) লিখেছেন, تضرعا و خفية শব্দ দ্বারা যিকরে কলবি প্রমাণিত হয়, যেন আমাদেরকে এর আদেশ করা হয়েছে।

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ৯১

২. সূরা আরাফ : আয়াত ২০৬

## আল্লাহ-আল্লাহ করার হুকুম

এ বিষয়টি আশ্চর্যজনক যে, আমাদেরকে আল্লাহ নামের যিকির করার হুকুম করা হয়েছে। যদি আমাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসা করে, আমাদের রবের নাম কী? তো আমরা বলব আল্লাহ।

আল্লাহ স্বয়ং কুরআনে ফরমান-

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ

'আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন।'[১]

রবের নাম যেহেতু আল্লাহ, তাই আল্লাহ নামের যিকির করো। এ দ্বারা বোঝা গেল, আল্লাহ নামের যিকির করা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয়।

## নিবেদিত বান্দা ও অন্তর

আমাদের সর্বদা অন্তরে আল্লাহর ধ্যান-খেয়াল রাখা চাই। একে আল্লাহ তা'আলার প্রতি নিবেদিত হওয়া বলে। আর যে অন্তরে তা আছে, তাকে নিবেদিত অন্তর বলে। আর এরকম অন্তরের অধিকারী বান্দাকে নিবেদিত বান্দা বলে। যথা– ইরশাদ হয়েছে-

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ

'তারা কি তাদের উপরস্থিত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না যে, আমি কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং সুশোভিত করেছি আর তাতে কোনো ছিদ্রও নেই?'[২]

যখন কারো অন্তরে আল্লাহর স্মরণ ও ধ্যান-খেয়াল স্থায়ী হয়ে যায়, তখন ওই ব্যক্তি নিবেদিত বান্দা হয়ে যায়। এমন অন্তরই আল্লাহ চান। এজন্য তিনি ইরশাদ ফরমান-

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. هٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ. مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ.

'যেদিন আমি জাহান্নামকে জিজ্ঞেস করব, তুমি কি পূর্ণ হয়ে গেছ? সে বলবে, আরো আছে কি? জান্নাতকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহভীরুদের জন্য অদূরে। তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে একই প্রতিশ্রুতি

---

১. সূরা মুযযাম্মিল : আয়াত ৯

২. সূরা কাফ : আয়াত ৬

দেওয়া হয়েছিল, যে না দেখে দয়াময় আল্লাহকে ভয় করত এবং বিনীত অন্তরে উপস্থিত হতো।'[১]

আল্লাহর এমন নিবেদিত অন্তরই উদ্দেশ্য। মোটকথা, আল্লাহ আমাদের কাছ থেকে এমন অন্তর চান, যে অন্তরে একমাত্র তিনি আর তাঁর চিন্তা ও ধারণা স্থান পায়।

## সর্বদা আল্লাহর যিকির

যে-ব্যক্তির অবস্থা এমন হয়, যার ওঠা-বসা, চলা-ফেরায় সর্বদা আল্লাহর স্মরণ থাকে, তাকেই বুদ্ধিমান বলা হয়। সে উদাসীন হতে পারে না। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ

'এমন বান্দারা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় যাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা এবং যাকাত প্রদান করা থেকে উদাসীন করে না।'[২]

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, মানুষের সাধারণত তিনটি অবস্থা হয়। দাঁড়ানো, বসা ও শয়ন। উপরোক্ত আয়াতে এই তিন অবস্থার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে ওঠা, বসা ও শোওয়া তথা সর্বদা আল্লাহর স্মরণ অন্তরে রাখে। এমন ব্যক্তিকেই কুরআনে বুদ্ধিমান লোক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাস্তবে যখন এমনই হয়ে যায়, তখন তার অন্তর থেকে এ আওয়াজই বের হয়। এটি মহব্বতের কারণেই ঘটে থাকে। দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহ, বসা অবস্থায়ও আল্লাহ, শোওয়া অবস্থায়ও আল্লাহ। তার অন্তরে যেন সর্বদা আল্লাহর স্মরণ এসে যায়। আর তা-ই তার অন্তর থেকে বের হয়।

## যিকির থেকে গাফেল থাকার পরিণাম

সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, ওলামায়ে কেরামও এখন যিকিরকে নফল কাজ মনে করে থাকেন। যদি কেউ আমলে মাশগুল থাকে, তো উলামা ও তালিবুল ইলমরা তাকে দেখে বলেন, সে তো তাসবীহ পড়ছে। অর্থাৎ তাদের অন্তরে এর কোনো গুরুত্ব নেই। অথচ কুরআনে এ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যাতে শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর আমি যত ধরনের আয়াত আপনাদের সামনে পেশ করেছি, এগুলোর মধ্যে

---

১. সূরা কাফ : আয়াত ৩১-৩৪

২. সূরা নূর : আয়াত ৩৭

উল্লেখিত সমস্ত নেয়ামত মানুষের যিকির করার ফলেই অর্জিত হয়। আর যে যিকির করবে না, তাকে এর জন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে।

যথা- ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً

'যে তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়, তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।'[১]

বিষয়টা এমন নয় যে, মনমতো হয়ে যাবে; বরং বলা হয়েছে, যিকির থেকে উদাসীন হলেই শাস্তি আসবে। আল্লাহ এজন্যই নারাজ হবেন যে, আমার স্মরণ ভুলে গিয়ে কেন জীবন অতিবাহিত করলে?

یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نہ باشی

شاید کہ نگاہ کند آگاہ نہ باشی

'হে বন্ধু! তুমি একটি মূহূর্তের জন্যও এই সত্তা থেকে উদাসীন হয়ো না। হতে পারে, তিনি তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন; অথচ তুমি তাঁর দিকে মনোনিবেশ করছ না।'

মেহনত করার দ্বারা মানুষের এই যোগ্যতা অর্জিত হয়। যেভাবে দুনিয়ার সমস্ত কাজ মেহনত করার দ্বারা সহজ হয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে এ কাজটি মেহনত করার দ্বারা সহজ হয়ে যায়।

## মুসা ও হারুন আলাইহিস সালামের প্রতি যিকিরের হেদায়াত

আল্লাহ যখন মুসা ও হারুন আলাইহিস সালামকে নবুওয়ত প্রদান করলেন, তখন তাদের বলে দিলেন–

اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي

'তুমি ও তোমার ভ্রাতা আমার নিদর্শনসহ যাত্রা করো এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না।'[২]

এখন আপনারা-ই বলুন, যেখানে আল্লাহ সরাসরি নবীদের যিকির থেকে গাফেল না হওয়ার ব্যাপারে সর্তক করছেন, সে ক্ষেত্রে যদি ছাত্ররা যিকির থেকে গাফেল থেকে যায়, তাহলে সে কিভাবে নবীগণের ওয়ারিস হতে

---

১. সূরা জিন : আয়াত ১৭

২. সূরা তোয়া-হা : আয়াত ৪২

পারে? দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ যদি যিকির থেকে গাফেল হয়ে করা হয়, তাহলে এটা কিভাবে নবীওয়ালা কাজ বলে গণ্য হবে? দাওয়াত ও তাবলীগের অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

## মুফতী যয়নুল আবেদীন সাহেবের বক্তব্য

এই অধম রাইবেন্ডের বার্ষিক ইজতেমায় মুফতী যয়নুল আবেদীনের বক্তব্য সরাসরি শুনেছে। এখন আমি মোটামুটি তাঁর ভাষায়ই উদ্ধৃত করছি। আর এই জায়গাটায় বসে কোনো মানুষ মিথ্যা বলার বোঝা মাথায় চাপাতে পারে না। তিনি বলেন, 'যতক্ষণ তোমরা যিকির না করবে, ততক্ষণ তোমরা তাবলীগে জুতা ক্ষয় করা ব্যতীত আর কিছুই পাবে না।' তো বোঝা গেল, যিকিরের সাথে দাওয়াতের কাজ করলে এর বরকত বৃদ্ধি পায়। সাথে-সাথে আল্লাহর সাহায্যও অর্জিত হয়।

## রণাঙ্গনে যিকিরের তালকীন

কাউকে ওয়ায-নসীহত করা আল্লাহর দিকে দাওয়াতের প্রথম ধাপ। আর এর সর্বশেষ ধাপ হলো, যখন কেউ এই দাওয়াত কবুল না করে, আত্মসমর্পণ না করে, তখন তাকে বলা যে, এখন তরবারীই আমার ও তোমার মাঝে ফয়সালা করবে। এটিই সর্বশেষ উপায়, যেখানে মানুষ স্বীয় জীবনের বাজি লাগায়। এমতাবস্থায়ও অর্থাৎ জিহাদের সময়ও আল্লাহর যিকিরের হুকুম করা হয়েছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা রণাঙ্গনে কোনো দলের মুখোমুখি হলে দৃঢ়পদ থেকো এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করো। এর ফলে তোমরা সফল হবে।'[১]

এখন বলুন, যখন গর্দান কাটা হচ্ছে, রক্তের ফোয়ারা বইছে, প্রাণ বের হয়ে যাচ্ছে, তখনও বেশি-বেশি আল্লাহকে স্মরণ করার কথা বলা হচ্ছে। যদি তা-ই হয়, তাহলে যিকিরের গুরুত্ব কতটুকু হতে পারে? দেখুন, নিম্নোক্ত আয়াতে যেকথা বলা হয়েছে, সেখানে যিকিরকে বাদ দেওয়া হয়নি। আমরা এর দ্বারা বুঝতে পারলাম, আমাদের জন্য কোনো ক্ষেত্রেই যিকির ছাড়া সফলতা অর্জন করা সম্ভব নয়।

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ৪৫

## فَاذْكُرُونِيْ أَذْكُرْكُمْ -এর মর্ম

ইরশাদ হয়েছে-

فَاذْكُرُونِيْ أَذْكُرْكُمْ

'তোমরা আমাকে স্মরণ করো; তাহলে আমি তোমাদের স্মরণ করব।'

হাদীছেও এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, যদি বান্দা তার অন্তরে আমাকে স্মরণ করে, তাহলে আমিও তাকে স্মরণ করি। এখানে একটু চিন্তা করুন, মানুষ নিজের প্রিয়জনের কল্পনা করে কত খুশি হয়। যখন প্রিয়জনের কথা স্মরণ করে, তখন তার প্রিয়জনও তার কথা স্মরণ করে। দুনিয়ার মধ্যে কারো সাথে সম্পর্ক হলে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আমার কথা তোমার মনে পড়েছিল কিনা? ভাই! দুনিয়ার কারো সাথে সম্পর্ক হলে তাকে একথা জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিতে হয়। অপরদিকে আমার মাওলা এতোই দয়ালু যে, তিনি নিজে বলে দিচ্ছেন, বান্দা! তুমি আমাকে স্মরণ করলে আমিও তোমাকে স্মরণ করব। তুমি আমাকে কোনো মজলিসে স্মরণ করলে আমি এর চেয়েও উত্তম মজলিসে (ফেরেশতাদের মজলিসে) তোমার কথা আলোচনা করব। তুমি আমার দিকে হেঁটে-হেঁটে এগিয়ে এলে আমি তোমার দিকে দৌড়ে যাব।

কুরআনের আয়াত فاذكروني أذكركم -এর শব্দগুলোকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। মাত্র দুটি শব্দে আল্লাহ কিভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন!

### একটি ইলহামী কথা

আমাদের অবস্থা হলো, সামান্য কোনো পেরেশানি কিংবা মুসিবতে পতিত হলেই আল্লাহর নামে অভিযোগ করা শুরু করি। এক বুর্যুগ বলেছিলেন, আমাকে আল্লাহ একথার ইলহাম করেছেন যে, আমার এসব বান্দাদের বলে দাও, তোমাদের রিযিকে একটু সংকীর্ণতা এলেই তোমরা তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মজলিসে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুরু কর। আর তোমাদের আমলনামা গোনাহ দ্বারা ভরে ফেলেছ; কিন্তু আমি তারপরও ফেরেশতাদের মজলিসে তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি না।

## فاذكروني أذكركم -এর দ্বিতীয় অর্থ

কুরআনের আয়াত فاذكروني أذكركم -এর অন্য আরেকটি মর্ম এও হতে পারে যে, যদি তোমরা আমার আনুগত্য কর, তাহলে আমি সমস্ত মাখলুককে তোমার অনুগত বানিয়ে দেব। বাস্তবে এমনই হয়ে থাকে। এক বুযুর্গ তাবেয়ী

বলেন, আমি দেখেছি, যখনই আমি আল্লাহর কোনো হুকুমের নাফরনামি করেছি, তখনই এর প্রভাব আমার স্ত্রী-সন্তান, অধীন লোকজন, এমনকি আমার পালিত পশুর মধ্যে দেখেছি। যেন আল্লাহ বলছেন, তুমি আমার অনুগত হয়ে যাও, আমি সবাইকে তোমার অনুগত করে দেব। এ কারণেই বান্দা একথা কিতাবে পড়ে; কিন্তু এর প্রভাব তার অন্তরে পড়ে না। তবে যদি কোনো আল্লাহওয়ালার যবান থেকে একথা শুনে আমল করে, তখন তার প্রভাব পড়ে। যেহেতু বক্তার আমলের অভ্যাস আছে, তাই সে বলার সাথে-সাথে অন্যদেরও আমল করার তাওফীক হয়।

## জান্নাতে সঙ্গীর সাথে সাক্ষাত

শায়খ আবদুল ওয়াহেদ বলেন, আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করেছি, হে আল্লাহ! জান্নাতে যে আমার সাথী হবে, তাকে তুমি আমার সাথে দেখা করিয়ে দাও। আল্লাহ আমার এই দু'আ কবুল করলেন। স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম, কে যেন বলছে, হাবশা দেশে মাইমুনা নামে এক নারী আছে, যে জান্নাতে তোমার সাথী হবে। আমি ঘুম থেকে উঠে হাবশার ওই অঞ্চলে রওনা হলাম, যেখানে যাওয়ার কথা আমাকে বলা হয়েছে। আমি ওই নারীর বসতিতে গিয়ে লোকদেরকে তার কথা জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, সে তো অমুক স্থানে বকরি চরাতে গেছে। আমি উক্ত স্থানে গিয়ে এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে হয়রান হয়ে গেলাম। বকরিগুলো একই স্থানে ঘোরাফেরা করছে। এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে না। আর এক নারীকে দেখলাম, একটা গাছের তলে নামায পড়ছে। যখন আমি ব্যাপারটি নিজে চিন্তা করলাম, তখন দেখতে পেলাম, যেখানে বকরিগুলো ঘোরাফেরা করছে, সেখান থেকে কিছু দূরে এক পাশে অনেকগুলো নেকড়ে বসে আছে। ওই নেকড়েগুলোর কারণে বকরিগুলো যাচ্ছে না। যখন ওই নারী সালাম ফেরাল, তখন বলল, আবদুল ওয়াহেদ! আল্লাহ সাক্ষাতের জায়গা জান্নাতে নির্ধারণ করেছেন। তুমি এখানে কিভাবে এলে? আমি বললাম, আল্লাহ আমার দু'আ কবুল করেছেন।

বলল, আচ্ছা! আমি আপনাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে চাই। আজকে আমি এমন দৃশ্য দেখেছি, যা আগে কখনও দেখিনি। আপনি নামায পড়ছেন, বকরিগুলো একই জায়গায় ঘোরাফেরা করছে আর এক পার্শ্বে কিছু নেকড়ে বসে আছে। ওগুলো বকরিকে কিছু করছে না। আমার এই রহস্য বুঝে আসছে না। ওই নারী বলতে লাগল, আবদুল ওয়াহেদ! বিষয়টা বোঝা একেবারে সহজ। যেদিন থেকে আমি আমার পরওয়ারদেগারের সাথে সন্ধি করেছি, সেদিন থেকে এই নেকড়েগুলো আমার বকরিগুলোর সাথে সন্ধি

করেছে। তো বোঝা গেল, উপরোক্ত আয়াত فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ -এর অপর মর্ম হলো, হে বান্দা! তুমি আমার সাথে সন্ধি করো, আমি সমস্ত মাখলুককে তোমার সাথে সন্ধি করিয়ে দেব।

## فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ -এর তৃতীয় মর্ম

কুরআনের আয়াত فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ -এর অপর একটি মর্ম হলো, তুমি আমার ইজ্জত করো, আমি তোমার ইজ্জত দিয়ে দেব। হযরত বিশ্‌র হাফীর প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা আছে। একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তিনি একটি কাগজের টুকরা দেখতে পেলেন, যেখানে আল্লাহর নাম লেখা ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেটি উঠিয়ে পরিষ্কার করে উঁচু একটি স্থানে রেখে দিলেন। আল্লাহ তাঁকে ইলহাম করলেন, হে হাফী! তুমি আমার নামকে পা থেকে উঠিয়ে মাথা পর্যন্ত উঁচু করেছ। আমি তোমার নামকে যমীন থেকে আরশ পর্যন্ত উঁচু করে দেব।

## নেসবতের সম্মান

আমরা বুঝতে পারলাম, আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক হবে, তারও সম্মান করা আবশ্যক। যথা নবীজির প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা অন্তরে রাখা চাই। কেননা, তিনি আল্লাহর প্রিয়। এমনিভাবে আল্লাহর কালাম কুরআন মাজীদের সম্মান করা আবশ্যক। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, কোনো স্থানে দেখা যায়, মসজিদে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছে। সিজদার আয়াত পড়ে কুরআন মাজীদকে পায়ের কাছে রেখে সিজদা করছে। আজকাল কিছু আধুনিকমনা লোকদের বলতে শোনা যায়, আমাদের ওস্তাদের দরকার নেই। তাদের এই অবস্থা হয়ে থাকে।

## বেয়াদবির পরিণাম

কাবাঘরের সম্পর্ক যেহেতু আল্লাহর সাথে, তাই কাবাঘরেরও সম্মান করা আবশ্যক। কথা বলতে গিয়ে এই অধমের ভয় হচ্ছে। কিন্তু সবাইকে যেহেতু বোঝানো উদ্দেশ্য, তাই বলতে বাধ্য হচ্ছি। হারাম শরীফ যিয়ারতের সময় আমাদের এক বন্ধু হারামের মসজিদের ভিতরে দেখতে পেল, একলোক মাথার নিচে কুরআন মাজীদ রেখে ঘুমাচ্ছে! আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করুন! হিন্দুস্তান ও বাংলাদেশের উলামায়ে কেরাম এ অঞ্চলের মানুষদের আদব-কায়দা শিখিয়েছেন। তাই তারা এ ধরনের দৃশ্য দেখে ভড়কে যায়। সুতরাং ওই বুযুর্গ ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি ওই লোককে জাগিয়ে বললেন, তুমি কুরআন

মাজীদ মাথার নিচে রেখে ঘুমিয়েছ! সে বলল, আমি তো মাথার নিচে রেখে ঘুমিয়েছি, পায়ের তলে তো রাখিনি। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

## চিন্তার বিষয়

এই মসজিদও আল্লাহর ঘর। এরও ইকরাম করতে হবে। আজকাল তো নওজোয়ানরা মসজিদে মাথা খোলা অবস্থায় খুব আগ্রহের সাথে গমন করে থাকে। আপনি তাকে টুপি বা পাগড়ীর কথা বললে সে বলে, এগুলো আবশ্যক বিষয় নয়। এরকম জঘন্য শব্দ এখন সাধারণ হয়ে গেছে। কখনও কি চিন্তা করে দেখেছি যে, আমার জান্নাতে যাওয়া কতটুকু আবশ্যক? আজ তো আমরা একে নীতি বানিয়ে ফেলেছি। যদি আমাদেরই পাল্টা বলা হয়, হে বান্দা! যখন তুমি আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে জরুরি মনে করলে না, তখন তোমার জান্নাতের যাওয়া কতটুকু জরুরি হতে পারে। তখন কি অবস্থা দাঁড়াবে? আবার কেউ-কেউ তো এমন করে যে, ঠাণ্ডার কারণে মাথা ঢেকে মসজিদে গমন করে। তারপর মাথা খালি অবস্থায় নামায পড়ে আর মনে করে এটি সুন্নত।

ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہیے

'বক্তা এখন মাথা কলারে ঢেকেছেন, একে কী বলবেন আপনি?'

## মসজিদে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে কুরআনের নীতিমালা

এবার আসুন, আমরা কুরআনের দিকে লক্ষ্য করি। মসজিদে গমন বিষয়ে কুরআনে একটি নীতিমালা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ করা হচ্ছে–

أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ.

'অথচ বিহ্বল না হয়ে তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সংগত ছিল না।'[১]

তখন মনে করতে হবে, আমরা যেন বাদশাহর দরবারে গমন করছি। কুরআন তো আমাদের বলে দিচ্ছে মসজিদে আসার সময় আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকতে। কিন্তু আমরা খালি মাথায় মসজিদে গমন করছি। কুরআন মাজীদে আল্লাহ ফরমান–

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ.

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১১৪

'এটি আল্লাহর বিধান এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে সম্মান করলে তা তো তার তাকওয়ার অন্তর।'[১]

আল্লাহর নির্দশনকে সম্মান করা প্রকৃতপক্ষে অন্তরে তাকওয়ার দলিল। আদব করা অত্যন্ত জরুরি। কেননা, যে আদব করে, সে সব কিছু লাভ করে। অপরদিকে যার আদব নেই, সে সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়। বর্তমান যুগে ইল্‌ম পড়ার চেয়ে আদব শেখা বেশি জরুরি। কারণ, এখন জীবন থেকে আদব উঠে যাচ্ছে।

## فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ -এর চতুর্থ মর্ম

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ -এর অপর একটি অর্থ এও হতে পারে যে, তোমরা গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য আমাকে স্মরণ করো, তাহলে আমি তোমাদেরকে গোনাহ থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে স্মরণ করব।

দেখুন, ইউসুফ (আ.)-এর উপর পরীক্ষা এল। তিনি যে ঘরে থাকতেন, সেই ঘরের মহিলা তাঁকে গোনাহের দাওয়াত দিতে লাগল। এখানে কুরআনের সৌন্দর্য লক্ষ্য করুন। বলা হয়নি, মিসরের শাসকের স্ত্রী গোনাহ করতে আহ্বান করল। যদি নাম নিয়ে বলা হতো, তাহলে গীবত হয়ে যেত। অথচ গীবতকে শরীয়ত হারাম সাবস্ত্য করেছে। এ কারণেই আল্লাহ এ ঘটনা বলতে গিয়ে নাম উল্লেখ করেননি। তিনি এভাবে বলেছেন-

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا

'সে যে মহিলার ঘরে ছিল...'।[২]

শব্দ উল্লেখ করেছেন বটে, তবে নাম উল্লেখ করেননি। এখান থেকে আমরা এও শিখতে পারছি যে, আল্লাহ যেভাবে মানুষের গোনাহের ওপর পর্দা দিয়ে ঢেকে দেন, ঠিক আমরাও আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের গোনাহের উপর পর্দা দিয়ে দেই। যখন উক্ত নারী ইউসুফ (আ.)কে গোনাহের দিকে আহ্বান করল, তখন তিনি এর উত্তরে বললেন, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই। যখন ইউসুফ (আ.) আল্লাহকে স্মরণ করেছিলেন, তখন ওই মহিলা তার স্বামীকে বলল, এই যুবক আমাকে গোনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে; এর শাস্তিস্বরূপ তাকে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হোক।

---

১. সূরা হজ : আয়াত ৩২

২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২৩

এই আয়াতের তাফসীরে একটি সূক্ষ্ম বিষয় এই যে, ভালোবাসা যখন নফসের তাড়নায় হয়, তখন নিজের মনমতো কামনা পূরণ না হলে যাকে ভালোবেসেছিল, তাকেই মুসিবতে ফেলে দেয়। এটা মিথ্যা ভালোবাসার সবচেয়ে বড় দলিল। প্রথমে ভালোবসার বড়-বড় দাবি করে। পরে স্বীয় মনোবাসনা চরিতার্থ করা হয়ে গেলে সমস্ত দায়ভার যাকে ভালোবেসেছে নফসের তাড়নায়, তার উপরই চাপিয়ে দেয়। আর এই কাজটাই ওই মহিলা করেছিল। যখন তার স্বামী ঘটনা জানতে পারল, তখন বলল, ওই যুবক আমাকে তার কাছে ডেকেছিল; তাই তাকে জেলে পাঠানো হোক। পরিশেষে ইউসুফ (আ.)কেই জেলে পাঠানো হলো।

## ক্ষমতার মসনদে ইউসুফ আলাইহিস সালাম

হযরত ইউসুফ (আ.) এক যুগ পর্যন্ত জেলে ছিলেন। পরে আল্লাহ তাঁকে মুক্তি দিলেন। মুক্তি দেওয়ার পর তাঁকে গোলামের মতো করে রাখেননি। বরং তাকে মিসরের শাসক বানিয়ে দিলেন। যখন তিনি আযীযে মেসেরের সামনে এলেন এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিলেন, তখন আযীযে মেসের বললেন,

إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ.

'আজ তুমি আমাদের নিকট মর্যাদাশীল ও বিশ্বাসভাজন হলে।'[১]

ইউসুফ (আ.) বললেন,

اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ

'আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন।'[২]

যথারীতি ইউসুফ (আ.)কে খাজাঞ্চির দায়িত্ব দেওয়া হলো। তিনি গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহকে স্মরণ করলেন। তো আল্লাহ তাঁকে মুসিবত থেকে উদ্ধার করলেন, গোলামির যিন্দেগি থেকে রেহাই দিলেন এবং দুনিয়াকে তাঁর ক্ষমতার আওতায় এনে দিলেন। এর আগে মিসরের বাজারে বিক্রি হয়েছিলেন। যখন তিনি গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর সাহায্য চাইলেন, তখন যে শহরের বাজারে তিনি তিরস্কৃত হয়েছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওই শহরেরই বিচারক বানিয়ে দিলেন।

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৫৪
২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৫৫

## ইল্‌মের মোকাবেলায় সৌন্দর্য

এখানে আরেকটি কথা মনে এসেছে; আমি তা বলতে চাচ্ছি। তা হলো, হযরত ইউসুফ (আ.) শিশুকাল থেকে প্রকৃতিগতভাবেই সুন্দর ছিলেন। কিন্তু তারপরও তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে বিক্রি করে দিল। কত দামে বিক্রি করল? কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ.

'এবং তারা তাকে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করল; মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে।'[১]

এখানে শিখার বিষয় আছে। বোঝা গেল, যদি কারো কাছে শুধু সৌন্দর্য থাকে তো আল্লাহর কাছে এর কোনো মূল্য নেই। তারপর যখন আল্লাহ ইউসুফ (আ.)কে ইল্‌ম দ্বারা সজ্জিত করলেন, তখন–

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ.

'সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলো, তখন আমি তাকে হেকমত ও জ্ঞান দান করলাম এবং আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করি।'[২]

তাকে আমল করারও তাওফীক দিলেন এবং তার পাশাপাশি জেল থেকেও মুক্তি পাওয়ার পর ক্ষমতা দান করে সম্মানিত করলেন।

## فاذكروني أذكركم -এর পঞ্চম মর্ম

فاذكروني أذكركم -এর আরেক অর্থ হলো, হে বান্দা! যখন তুমি আরাম ও সুখের অবস্থায় আমাকে স্মরণ করবে, তখন আমি তোমার বিপদ-মুসিবতের সময় তোমাকে স্মরণ করব।

## একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

বনী ইসরাঈলের এক নারী স্বীয় বাচ্চাকে নিয়ে জঙ্গল দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা নেকড়ে এসে তার উপর আক্রমণ করল। সে ভয় পেয়ে গেল। ফলে তার কোল থেকে বাচ্চাটা নিচে পড়ে গেল। তখন ওই নেকড়ে তার বাচ্চাকে কামড়ে ধরে দৌড় দিল। যখন মা এই দৃশ্য দেখল, তখন আহ বলে চিৎকার দিল। তারপর মা দেখতে পেল, একলোক গাছের আড়াল থেকে ওই

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২০
২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২২

নেকড়ের সামনে এসে দাঁড়াল। নেকড়ে হঠাৎ নিজের সামনে কাউকে দেখে ঘাবড়ে গেল। ফলে বাচ্চাটা তার মুখ থেকে পড়ে গেল।

তখন লোকটি বাচ্চাকে উদ্ধার করে মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিল। এই কাণ্ড দেখে মা তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে; আমার বাচ্চাকে বাঁচিয়েছ? বলল, আমি ফেরেশতা, আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন। একবার তুমি ঘরে বসে খানা খাচ্ছিলে। তখন এক ভিক্ষুক তোমার ঘরের সামনে এসে রুটি চাইল। তোমার ঘরে ওই রুটি ছিল, যা তুমি খাচ্ছিলে। ওই সময় ভেবেছিলে, আমি আল্লাহর নামে ভিক্ষাকারীকে কিভাবে খালি হাতে ফিরিয়ে দেই? তখন তুমি তোমার নিজের লোকমাটি ভিক্ষুককে দিয়েছিলে। তাই আজ আল্লাহ নেকড়ের লোকমা বের করে তোমার হাওয়ালা করে দিলেন।

## তিনটি মূল্যবান কথা

এ তিনটি কথা লিখে রাখার মতো।

১. মানুষ যে পরিমাণ আল্লাহকে মহব্বত করবে, ঠিক সে পরিমাণ সমস্ত মাখলুক তাকে মহব্বত করবে। আমরা কী দেখতে পাই? বলুন, আল্লাহওয়ালাদের প্রতি আমাদের মহব্বত লাগে না? তাদের কাছে যাওয়া, তাদের সোহবত অর্জন করাকে আমরা সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করি। এটি এ কারণেই যে, আল্লাহর সাথে তাঁদের মহব্বত আছে, যার ফলে সমস্ত মাখলুকের অন্তরে আল্লাহ তাদের প্রতি মহব্বত ঢেলে দিয়েছেন।

২. যে-ব্যক্তি যে পরিমাণ আল্লাহর ইবাদাত করবে, সেই পরিমাণ মাখলুক তার খেদমত করবে। মায়েরা লোকদের আযাদ করেই জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু তারা আল্লাহওয়ালাগণের জুতা উঠানোকে সৌভাগ্যের বিষয় মনে করে। হযরত থানভী (রহ.)কে এক নবাব দাওয়াত দিয়েছিলেন। তখন নবাব নিজে তাঁর জুতা উঠিয়ে নিয়ে ঘর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

৩. মানুষ যে পরিমাণ আল্লাহকে ভয় করবে, ঠিক সেই পরিমাণ মাখলুক তার প্রতি নত থাকবে। আপনারা দেখে থাকবেন, আল্লাহওয়ালাদের মাহফিলে এক ধরনের ভীতি কাজ করে।

نہ تاج و تخت میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے
جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے

না মুকুট ও সিংহাসনে, না লশকর ও সৈন্যবাহিনীতে (কোথাও সেই শান খুঁজে পাবে না) যে শান হৃদয়বান ব্যক্তির দরবারে পাবে।

নবীদের আল্লাহ এ নেয়ামত দান করেছিলেন। নবীজি ফরমান–

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ

'আমাকে প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে।'

অন্য হাদীছে আছে, নবীজি কোনো পথ দিয়ে চলার সময় সেখান থেকে এক মাসের দূরত্ব পরিমাণ অঞ্চলে তাঁর প্রতি ভীতি ছড়িয়ে পড়ত। বাঘ জঙ্গলের বাদশাহ। তার প্রতি একটা ভীতি জঙ্গলে বিরাজ করে। বাঘ খাঁচার ভিতরে থাকাবস্থায়ও মানুষ তাকে দেখে ভয় পায়। এমনিভাবে যে আল্লাহর বাঘ হয়, তার প্রতি সবার মনে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে।

## দুশ্চিন্তা দূর করার সহজ উপায়

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল, যদি আমরা আল্লাহকে ভয় করি, তার হুকুমমতো জীবন অতিবাহিত করি, তাহলে আল্লাহ আমাদের সমস্ত পেরেশানি ও বিপদ-মুসিবত দূর করে দিবেন এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিবেন। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

'আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?'[১]

তো আমাদের জন্য একটি সহজ পন্থা হলো, আমরা আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ করব এবং গোনাহ ছেড়ে দেব। স্মরণ রাখতে হবে, যে-ব্যক্তি ইল্‌ম ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা গোনাহ ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তার নাম সিদ্দীকীনের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। আজকের এ মাহফিলে আমরা এই প্রতিজ্ঞা করি, হে দয়াময় রব! আমরা ইল্‌ম ও ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে গোনাহ ছেড়ে দিচ্ছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে সফল হওয়ার জন্য সাহায্য করুন। কেননা, আমাদের পক্ষে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন। কিন্তু আপনার জন্য আমাদেরকে গোনাহ থেকে রক্ষা করা সহজ। যখন আমরা এভাবে শক্তভাবে নিয়ত করব, তখন আল্লাহ আমাদের নেকী ও পরহেযগারীর জীবন দান করবেন।

## দৃঢ়তার অবস্থা

আজ সবখানে পেরেশানির যিন্দেগি চলছে। কিন্তু এই পরিবেশেও যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রেখে চলবে, আল্লাহ তাকে প্রশান্তির জীবন দান করবেন। দেখুন, পেরেশানির পরিবেশ এবং অন্তর পেরেশান হওয়া দুটি

---

১. সূরা যুমার : আয়াত ৩৬

স্বতন্ত্র বিষয়। আল্লাহওয়ালাদের আশপাশের পরিবেশও এমন হতে পারে। চারদিকে পেরেশানি থাকবে; কিন্তু তাদের অন্তর প্রশান্ত থাকবে। যথা- কোনো লোক কাচনির্মিত কক্ষের ভিতর অবস্থান করছে এবং বাইরে অন্ধকার এবং এছাড়া বাইরে বিজলি চঈশাচ্ছে। তার আশেপাশে যদিও অন্ধকার; কিন্তু বাইরের বিজলির কারণে তার কাছে অন্ধকার মনে হচ্ছে না। সুতরাং যেলোক আল্লাহওয়ালা যিন্দেগি অবলম্বন করবে, চারদিকে পেরেশানি থাকলেও আল্লাহ্ তাকে প্রশান্তির যিন্দেগি দান করবেন। কোনো কবি বলেছেন-

طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف
دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے

'দুনিয়াবাসী মনে করে, তাদের নৌকা পানিতে ঘুরপাক খাচ্ছে। বাস্তবতা হলো, সে জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে?'

মুফতী তাকী উসমানী লিখেছেন, যার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক আছে, তার পেরেশানির সাথে কিভাবে সম্পর্ক থাকতে পারে? আশেপাশে সবাই যদিও পেরেশানিতে হতাশাগ্রস্ত, কিন্তু আল্লাহ তাকে প্রশান্তির যিন্দেগি দান করেন।

## একটি উদাহরণ

আমি কয়েবার দেখেছি আর এটি যুক্তিগতভাবেও সম্ভব। তা হলো, একটি বারান্দার অর্ধেক বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে; কিন্তু বাকি অর্ধেক ভিজেনি। একটি গাছের একটি শাখা শুকনা; কিন্তু অপর শাখা ফলে-ফুলে ভরপুর। একটি ভেড়ার কিংবা বকরির ওলানে এক পাশে দুধ আছে; কিন্তু আরেকপাশে দুধ নেই। একই সমুদ্রের পানি; কিন্তু এক পাশের পানি মিঠা অপর পাশের পানি লবণাক্ত। এমনিভাবে আমাদেরও অবস্থা হবে। যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ি, তাহলে আশেপাশে পেরেশানি থাকলেও আল্লাহ তা থেকে আমাদের মুক্তি দিবেন।

## হাশরের দিনের অবস্থা

এমন অবস্থা কেয়ামতের দিনেও হবে। ঈমানদার বান্দারা যখন কবর থেকে উঠবে, তখন মুনাফিকরা তাদের বলবে,

انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُوْرِكُمْ

'আমাদের দিকে লক্ষ্য করো; আমরা তোমাদের নূর থেকে অংশ নিতে চাই।'[১]

---

১. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৩

কিন্তু তাদের বলা হবে,

اِرْجِعُوْا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا

'তোমরা দুনিয়াতে ফিরে যাও; ওখানে গিয়ে কোনো নূর তালাল করো।'[১]

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهُ بَابٌ

'আল্লাহ মুমিন ও মুনাফিকদের মাঝে একটি প্রাচীর দিয়ে দিবেন।[২]

بَاطِنُهُ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

'এই দেওয়ালের ভিতরে রহমত ও শান্তি আর এর বাইরে আযাব ও অশান্তি।'[৩]

তো এভাবেই বুঝে নিন যে, আল্লাহওয়ালাদের চারপাশ রহমতের চাদর দ্বারা বেষ্টিত থাকে। আশেপাশে সবাই পেরেশানিতে আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তার ভিতরে রহমত থাকে।

## فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ -এর ষষ্ঠ মর্ম

فَاذْكُرُوْنِيْ أَذْكُرْكُمْ -এর অপর মর্ম হলো, হে বান্দা! তোমরা আমাকে পাপের অনুভূতির সাথে স্মরণ করো; তাহলে আমি তোমাদেরকে মাগফেরাত দ্বারা স্মরণ করব।

আল্লাহর নবী হযরত ইউনুস (আ.)কে যখন মাছ গিলে ফেলল, তখন মাছ তাকে সমুদ্রের তলদেশে নিয়ে গেল। সেখানে তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি আল্লাহকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ইরশাদ করলেন, হে ইউনুস! এটা সমুদ্রের তলদেশের কংকর-পাথরের আওয়াজ। তারা আমার পবিত্রতা বর্ণনা করছে। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ

'পৃথিবীর সব কিছু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। কিন্তু তোমরা তা বুঝতে পার না।'[৪]

---

১. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৩
২. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৩
৩. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৩
৪. সূরা বনি ইসরাইল : আয়াত ৪৪

ইউনুস আলাইহিস সালাম কংকরের মুখে আল্লাহর যিকির শুনে আল্লাহর প্রতি অধিক মনোনিবেশ করলেন। তিনিও যিকির শুরু করে দিলেন–

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

'তুমি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই; তুমি পবিত্র, মহান। আমি তো সীমালংঘনকারী।'[১]

চিন্তা করে দেখুন, যখন ইউনুস আলাইহিস সালাম ওযরের সাথে আল্লাহকে স্মরণ করলেন, তখন আল্লাহও তাঁকে মাগফেরাতের সাথে স্মরণ করলেন। তাঁকে মাছের পেট থেকে মুক্তি দিয়ে স্বীয় কওমের নবী ও বাদশাহ বানিয়ে দিলেন।

## আমাদের জন্য মাছের পেট

এখানে একটি ঘটনা খেয়াল করা চাই। তা হলো, আমাদেরও প্রত্যেকের মাছের পেট আছে। একেকজনেরটা একেক রকম। কারো দোকান তার মাছের পেট। ওই দোকান তার জন্য মাছের পেটের অন্ধকারের মতো অন্ধকার হয়ে রয়েছে। তাকে এই দোকান আটক করে রেখেছে। আবার কারো জন্য তার বিবি মাছের পেট। কোনো যুবকের জন্য যুবতী তার মাছের পেট। বেচারা সেখান থেকে মুক্ত হতে পারছে না। আমরা যদি এভাবে চিন্তা করি, তাহলে দেখব, আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মাখলুকের মধ্যে গ্রেফতার হয়ে গেছি। এ অবস্থা থেকে বাঁচার একটাই উপায়। অর্থাৎ– যেভাবে ইউনুস (আ.) মাছের পেটে অপরাধের অনুভূতির সাথে আল্লাহকে স্মরণ করেছেন, ফলে আল্লাহও তাঁকে মাগফেরাতের সাথে স্মরণ করে মাছের পেট থেকে মুক্তি দিয়েছেন, ঠিক তদ্রূপ আমরা আল্লাহর কাছে মাফ চাইলে তিনি আমাদেরকে সমস্ত পেরেশানি থেকে মুক্তি দিবেন।

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ . لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

'যদি সে তাসবীহ আদায় না করত, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত সে মাছের পেটেই থাকত।'[২]

তো বোঝা গেল, আমরা মাছের পেট থেকে উদ্ধারের জন্য যতক্ষণ আল্লাহর কাছে সাহায্য না চাইব, তাঁকে স্মরণ না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই

---

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮৭

২. সূরা সফ্ফাত : আয়াত ১৪৩-৪৪

হবে না। এভাবে চলতে থাকলে আমরাও মৃত্যু পর্যন্ত এ অবস্থাতেই ফেঁসে থাকব।

## فاذكروني أذكركم -এর সপ্তম মর্ম

فاذكروني أذكركم -এর অপর মর্ম হলো, হে বান্দা! তোমাদের জমীনের নরম বিছানায় আমাকে স্মরণ করো। তাহলে আমি তোমাদেরকে কবরের মধ্যে স্মরণ করব। এই শব্দে আল্লাহ যিন্দেগির হাকীকত বলে দিয়েছেন। আর অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শীভাবে বলেছেন, তোমরা আমাকে স্মরণ করো; আমি তোমাদের স্মরণ করব। তোমরা আমাকে ভালোবাসবে; আমি তোমাদের ভালোবাসব। তোমরা আমাকে চাও; আমি তোমাদের চাইব। তোমরা আমার আনুগত্য করো; আমি সমস্ত মাখলুককে তোমাদের অনুগত করে দেব। তোমরা আমার ইজ্জত করো; আমি তোমাদের ইজ্জত করব। তোমরা আমাকে সুখের সময় স্মরণ করো; আমি তোমাদের পেরেশানি ও দুঃখের সময় স্মরণ করব। তোমরা আমাকে ওযরের সাথে স্মরণ করো; আমি তোমাদের মাগফেরাতের সময় স্মরণ করব। হে বান্দা, তুমি আমার হয়ে যাও; আমি তোমার হয়ে যাব। তুমি তোমার অন্তরে আমাকে স্থান করে দাও; আমি তোমার চোখ হয়ে যাব, যা দ্বারা তুমি দেখবে। আমি তোমার কান হয়ে হয়ে যাব, যা দ্বারা তুমি শুনবে। আমি তোমার পা হব, যা দ্বারা তুমি হাঁটবে।

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর বানিয়ে নিন। আমাদেরকে তাঁর অনুগত ও বাধ্য থাকার যিন্দেগি নসিব করুন। সাথে-সাথে তিনি আমাদেরকে গোনাহের অপমান থেকে রক্ষা করুন।

## যিকরে ইলাহীর মূল উদ্দেশ্য

হযরত থানুভি (রহ.) বলেন, যিকিরের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের শিরা ও রগ থেকে গোনাহের সুড়সুড়ি দূর হয়ে যাওয়া। আমাদের শুধু তাসবীহ পড়লেই হবে না, যাতে এমন না হয়ে যায় যে, উপর দিয়ে তাসবীহ পড়ছি; কিন্তু অন্তরে এর বিপরীত অবস্থা বিরাজ করছে। এমন তাসবীহ দিয়ে আমাদের কী উপকার হবে? আমাদের কাছে যিকিরের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এর দ্বারা আমাদের যিন্দেগি শরীয়ত ও সুন্নাতের অনুসারে ছেড়ে দেব। এমন যিন্দেগি শুরু হলে যিকিরের বরকত ও ফায়দা আমরা অর্জন করতে পারব। এ কারণে আমাদের মাশায়েখ বলেন, হে বন্ধু! শোনো, না আমরা কেঁদেছি, না কাঁদিয়েছি। না নিজে উড়েছি, না অন্যকে উড়িয়েছি। আমাদের তো উচিত

শুধু আল্লাকেই মেনে চলা। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁকে বেশি-বেশি স্মরণ করার তাওফীক দান করুন এবং আমাদের মতো দুর্বল-অসহায়কে যিকির করা সহজ করে দিন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

# রহমাতুল্লিল আলামীন

'নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ এবং বিশেষভাবে স্বীয় গুনাহগার উম্মাতের জন্য রহমত হয়ে প্রেরিত হয়েছেন। এমনিভাবে তাঁর প্রত্যেকটি কাজ রহমত হিসেবে গণ্য।'

# রহমাতুল্লিল আলামীন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

## রহমতের নবীর মমতা

আমাদের নবী সারা জাহানের জন্য রহমত হয়ে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি স্বীয় উম্মতের প্রতি অনেক দয়ালু ও মেহেরবান ছিলেন।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

'তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।'[১]

অপরদিকে নবীর প্রতি উম্মতের অন্তরে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কোন পর্যায়ের, তাও উল্লেখিত হয়েছে কুরআনে।

ইরশাদ হয়েছে-

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

'নবী মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক প্রিয়।'[২]

## দুটি অতুলনীয় নেয়ামত

আল্লাহর দুটি নেয়ামত আছে অতুলনীয়। প্রথম নেয়ামত হলো ইসলাম। কোনো লোক যতই নাফরমানি করুক-না কেন, ইসলাম গ্রহণ করার সাথে-সাথে তার পিছনের সব কিছু মাফ হয়ে যায়।

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ১২৮

২. সূরা আহযাব : আয়াত ৬

اَلْإِسْلَامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ

'ইসলাম তার আগেকার সব কিছু মুছে দেয়।'

এই নেয়ামতের কথা কুরআনে এভাবে ইরশাদ হয়েছে-

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

'আজ আমি তোমাদের প্রতি তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করে দিলাম।'[১]

দ্বিতীয় নেয়ামত নবীজির আগমন। আপনি নিজেই অনুমান করুন, আল্লাহ আমাদের কত ধরনের নেয়ামত দ্বারা ঢেকে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন–

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا.

'তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।'[২]

এতো নেয়ামত দেওয়ার পর আল্লাহ এর খোটা দিলেন না। চক্ষু, যবান, দিল, দেমাগ এবং অনেক রকমের রিযিক দিলেন; কিন্তু তিনি আমাদেরকে খোটা দেননি। যমীনের জন্য সূর্য, চন্দ্র, তারকা দিয়েছেন; কিন্তু এর জন্যও খোটা দেননি। বরং তিনি আমাদেরকে এমন এক নেয়ামত দিয়েছেন, যার কথা বলতে গিয়ে নিজেই আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি ফরমান-

لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا

'আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের উপর ইহসান করেছেন যে, তিনি তাদের নিকট রাসূল পাঠিয়েছেন।'[৩]

অর্থাৎ– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি মহান নেয়ামত।

উক্ত দুটি নেয়ামত এমন যে, এর কোনো তুলনা হতে পারে না।

## মায়ের অন্তরে সন্তানের মহব্বত

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারা জাহানের জন্য রহমত হয়ে প্রেরিত হয়েছেন। এর উদাহরণ এভাবে বুঝুন যে, নারীর অন্তরে তার নিজ

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৪
২. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৪
৩. সূরা নিসা : আয়াত ১৬৪

বাচ্চার প্রতি মহব্বত স্বভাবগত বিষয়। সব কিছুর প্রতি নারীর আকর্ষণ আছে তা স্বাভাবিক পর্যায়ে। অপরদিকে তার বাচ্চার প্রতি তার বিশেষ আকর্ষণ ও মায়া থাকে। যদি কোথাও কয়েকজন বড় বুযুর্গ ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন এবং সেখানে কোনো বাচ্চা কান্না শুরু করে, তাহলে তারা তার প্রতি তেমন একটা মনোনিবেশ করবেন না এটাই স্বাভাবিক। অপরদিকে একজন নারীও যদি এখানে থাকে আর বাচ্চার কান্না তার কানে পৌঁছে, তখনি তিনি বুঝে ফেলবেন কেন সে কান্না করছে। তার দিকে তিনি দৌড়ে যাবেন।

## একটি বিস্ময়কর মামলা

একটি বাচ্চা নিয়ে দুজন নারী মামলা করল। তারা দুজনই এ বাচ্চাকে নিজের গর্ভজাত সন্তান বলে দাবি করল। তখন বিচারপতি বলল, বাচ্চা তো দুজনই দাবি করছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি কার বাচ্চা তা তো প্রমাণ করা সম্ভব নয়। তাই বাচ্চাকে দুই টুকরা করে ফেলা হোক। তখন এক নারী এই ফয়সালায় সম্মতি জানাল এবং অপরজন সাথে-সাথে বলল, না, বাচ্চাকে দুই টুকরা করা যাবে না। দরকার হলে বাচ্চাটি ওই নারীকেই দিন; তবুও তাকে টুকরো করা থেকে বিরত থাকুন। এভাবেই বিচারপতি বুঝে নিলেন, বাচ্চার প্রকৃত মা কে। মা এমনই হন যে, স্বয়ং নিজেই কুরবান হয়ে যাবেন; কিন্তু স্বীয় বাচ্চাকে কোনো কষ্টে ফেলতে দিবেন না।

## প্রত্যেক কাজের জন্য রহমত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন এবং বিশেষভাবে স্বীয় গুনাহগার উম্মতের জন্য রহমত হয়ে এসেছেন। এমনিভাবে তাঁর প্রত্যেকটি কাজ রহমত বলে পরিগণিত।

## নবীজির ভুলও রহমত

একবার যোহর কিংবা আসরের নামাযে নবীজি চার রাকাতের পরিবর্তে দু-রাকাত পড়ে সালাম ফেরালেন। সাহাবাগণের মাঝে এতো আদব ছিল যে, তাঁরা এ ব্যাপারে নবীজিকে সরাসরি জিজ্ঞাসা না করে এভাবে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আজ থেকে কি আসরের নামায চার রাকাতের পরিবর্তে দুই রাকাত হয়ে গেল? তখন নবীজি বললেন, না; চার রাকাতই বহাল আছে। সাহাবাগণ বললেন, আপনি দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়েছেন। একথা শুনে নবীজি ইরশাদ করলেন–

لَا نَسِيْتُ بَلْ نُسِيْتُ

'আমি ভুলিনি; বরং আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এই ভুলের কারণে আমার উম্মতের সামনে সাজদায়ে সাহুর মাসআলা প্রকাশ পেল। যে নবীর ভুলও উম্মতের জন্য রহমত হয়, সেই নবীর জাগ্রত ও সচেতন থাকাবস্থায় ঘটিত নির্দেশনা ও কার্যক্রম উম্মতের জন্য কত বড় রহমত বলে গণ্য হতে পারে?

## নবীজির নিদ্রাও রহমত

একবার নবীজি সাহাবাগণের সাথে জিহাদ থেকে ফিরে আসছিলেন। ফিরতে-ফিরতে দেরি হয়ে গেলে নবীজি রাতে বিলাল (রাযি.)কে পাহারা দিতে এবং ফজর নামাযের সময় জাগিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বিলাল (রাযি.) একাকি পাহারা দিতে লাগলেন। একপর্যায়ে বিলাল (রাযি.) একস্থানে হেলান দিলে ঘুমে ঢলে পড়লেন। এমতাবস্থায় সূর্য উদিত হয়ে গেল। এ ঘটনার মধ্যে আল্লাহর এক বিশেষ হেকমত ছিল। সূর্যের আলো নবীজির চেহারা মুবারকে পড়লে তিনি জাগ্রত হলেন। তখন নবীজি বললেন, বেলাল! তুমি ঘুমিয়ে গেছ আর আমাদেরও জাগালে না। বিলাল (রাযি.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! যে আল্লাহ আপনাকে ঘুমিয়ে রেখেছেন, ওই আল্লাহই আমার উপর ঘুম চাপিয়ে দিয়েছেন। তখন নবীজি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর এজন্য ঘুম চাপিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমাদের ওপর একটি নামায কাজা হয় এবং তোমরা কাজা নামাযের মাসআলা ভালোভাবে শিখে নিতে পার।

এখানে ভাববার বিষয় হলো, যে নবীর ঘুমানো উম্মতের জন্য রহমত হলো, সেই নবীর জাগ্রত থাকা কত বড় রহমত হবে?

## নবীজির বদ দু'আ নেক দু'আয় পরিণত হওয়ার জন্য দু'আ

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নবীজি আল্লাহর কাছে দু'আ করেছেন, হে আল্লাহ! আমি যদি কাউকে বদ দু'আ দিয়ে ফেলি কিংবা মারি, তাহলে আপনি আমার এই বদ দু'আ অথবা প্রহারকে উক্ত ব্যক্তির জন্য রহমত বানিয়ে দিন। আর এর বিনিময়ে আপনি তাকে স্বীয় নৈকট্য দান করুন। অতএব যে নবীর রাগান্বিত অবস্থায় ধমকি কিংবা বদ দু'আ রহমত বলে গণ্য হতে পারে, তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকার সময় পবিত্র যবান থেকে বের হওয়া দু'আ কত বড় রহমত হতে পারে?

## নবীজির রহমত আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত বণ্টনের অংশ

রহমতের নবীর রহমত থেকে সকলেই অংশ পেয়েছে।

### মায়ের অংশ

নবীজির রহমত থেকে পৃথিবীর মায়েরা অংশ পেয়েছেন। মায়ের উঁচু মর্তবার কথা পৃথিবীরও জানা ছিল না। নবীজি এসে তা জানিয়ে দিয়েছেন।

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ

'জান্নাত মাদের পায়ের নিচে।'

একমাত্র নবীজিই প্রথমে ঘোষণা করলেন, ছেলে বা মেয়ে যখন স্বীয় মা-বাবার দিকে দয়া ও করুণার দৃষ্টিতে তাকায়, আল্লাহ এর প্রত্যেক দৃষ্টিপাতের বিনিময়ে তাদের একটি হজ ও ওমরার ছাওয়াব দান করেন।

### কন্যার অংশ

নবীজির রহমত থেকে কন্যাসন্তানও অংশ পেয়েছে। আরবের লোকেরা কন্যাসন্তানকে জীবিত কবর দিত। কোনো নারীর গর্ভে কন্যাসন্তান জন্ম হলে তাদের চেহারা বিষাদে ছেয়ে যেত। সেই আরবদের নবীজি তালিম দিলেন, 'যার ঘরে দুটি কন্যাসন্তান থাকে এবং পিতা তাদের উত্তম শিক্ষা ও আচরণ শেখায় এবং উপযুক্ত বয়সে বিবাহ দেয়, আমি আর সে জান্নাতে এমনভাবে পাশাপাশি থাকব, যেমনিভাবে দুই আঙুল পাশাপাশি হয়।'

সুবহানাল্লাহ! ইসলাম কন্যাসন্তানকে কত উচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছে। এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, যেলোকের ছেলে ও মেয়ে উভয় সন্তান আছে, সে যখন ঘরে কোনো নির্দিষ্ট জিনিস নিয়ে আসে, তখন তার উচিত হলো, সে যেন তা আগে মেয়েকে দেয় এবং পরে ছেলেকে দেয়। এভাবেই কন্যাসন্তানের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, কন্যাসন্তান কোনো অশুভ কিছু নয়; বরং তা রহমতস্বরূপ।

### স্ত্রীর অংশ

রহমতের নবী থেকে স্ত্রীও অংশ পেয়েছে। আরব লোকেরা স্বীয় স্ত্রীদের এমন মুসিবতের মধ্যে ফেলে দিত যে, তাদের কোনো উপায় থাকত না। না তাদের ওয়ারিস বানানো হতো, না তাদের তালাক দিয়ে ছেড়ে দিত আর না ভালোভাবে নিজের ঘরে স্থান দিত। তাদের হকের স্বীকৃতি দেওয়া হতো না। কিন্তু নবীজি স্ত্রী লোকদের অধিকার ঘোষণা করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন-

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ

'তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে পছন্দনীয়।'

তিনি আরো ইরশাদ করেন, পৃথিবী পুরোটাই সম্পদ। আর নারী এর মধ্যে সর্বোত্তম সম্পদ। তিনি আরো ইরশাদ করেন, আমার কাছে তিনটি বস্তু খুবই প্রিয়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে নারী।

উপরোক্ত ঘোষণার মাধ্যমে নবীজি সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন।

## স্বামীর অংশ

রহমতের নবী থেকে স্বামীরাও অংশ পেয়েছেন। স্বামীর মর্যাদার কথা তো কারুরই জানা ছিল না। নবীজি ইরশাদ করেছেন, আল্লাহকে ছাড়া যদি আমি কাউকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে নারীদের নির্দেশ দিতাম স্বীয় স্বামীদের সেজদা করার জন্য।

## বড় ও ছোটদের অংশ

রহমতের নবী থেকে ছোটরাও রহমতের অংশ পেয়েছে। তিনি এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন-

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا، فَلَيْسَ مِنَّا.

'যে ছোটদের প্রতি দয়া করল না এবং বড়দের সম্মান করল না, সে আমার উম্মতের মধ্য থেকে নয়।

এসব

## আলেমগণের অংশ

নবী থেকে আলেমগণও অংশ পেয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন–

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

'আলেমরা নবীগণের ওয়ারিস।'

অন্যস্থানে ইরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের আলেমগণকে বনী ইসরাঈলের নবীগণের মতো করে উঠানো হবে।

তিনি আরো বলেছেন, যেব্যক্তি আমলদার কোনো আলিমের পিছনে নামায পড়ল, সে যেন আমার পিছনে নামায পড়ল। কেননা, কাজ বড় হলে মর্যাদাও বড় হয়।

নবীজি এও বলেছেন–

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

'একজন ফকীহ্ শয়তানের বিপক্ষে হাজারো আবেদ থেকেও ভয়ংকর।'

## তালিবুল ইল্‌মের অংশ

নবীজির রহমতের অংশ থেকে তালিবুল ইল্‌ম ভাইয়েরাও পেয়েছেন। নবীজি ইরশাদ করেন,

مَنْ كَانَ فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَتْ فِي الْجَنَّةُ طَلَبِهِ

'যে ইল্‌ম অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়, জান্নাতে তাকে অনুসন্ধান করা হয়।'

অন্য হাদীছে নবীজি ইরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তি ইল্‌ম অর্জন করার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালে ফেরেশতারা তার পায়ের নিচে পাখা বিছিয়ে দেন। তাদের এই মর্যাদা একমাত্র রহমতের নবীর কারণেই অর্জিত হয়েছে।

## মুজাহিদের অংশ

মুজাহিদগণও রহমতের নবীর অংশ পেয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন, যখন কেউ আল্লাহর রাস্তায় বের হয় এবং কোনো প্রকারের কষ্ট ও মুসিবতের সম্মুখীন হয়, আল্লাহ এর প্রত্যেকটির বিনিময়ে তাকে ছাওয়াব দান করেন। আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ.

'কারণ, আল্লাহর পথে তাদের তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় ক্লিষ্ট হওয়া এবং কাফিরদের ক্রোধ উদ্রেক করে এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং নিকট হতে কিছু প্রাপ্ত হওয়া, তাদের সৎ কর্মরূপে গণ্য হয়।'[১]

অন্য এক রেওয়ায়েতে নবীজি ইরশাদ করেন, যখন কোনো মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা অবস্থায় আহত হয়, তখন তার রক্তের প্রথম ফোঁটাটি মাটিতে পড়ার আগেই আল্লাহ তার সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন।

অন্য স্থানে তিনি বলেন, যখন কোনো লোকের রূহ কব্‌জ করার সময় হয়, তখন মালাকুল মওত তার রূহ কব্‌জ করেন। অপরদিকে কোনো

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ১২০

মুজাহিদের শহীদ হওয়ার সময় হলে আল্লাহ তার অমোঘ ফয়সালা পরিবর্তন করে পেলেন। তিনি মালাকুল মওতকে বলেন, হে মওতের ফেরেশতা! আমার এই বান্দা আমার নামে স্বীয় জান কোরবানি করছে। এখন তার রূহ কব্জ করার সময় হয়েছে। তাই তুমি পিছনে সরে যাও। আমি নিজে তার রূহ বের করব। তারপর যথারীতি আল্লাহ নিজে ওই মুজাহিদের দেহ থেকে রূহ বের করে আনেন।

নিয়ম তো এটা ছিল যে, যত বড় ওলী, গাউস, কুতুব হোন না কেন, যেহেতু তাকে এখন আল্লাহর দরবারে হাযিরা দিতে হবে, তাই তাকে গোসল দিয়ে পরনের কাপড় খুলে সাদা কাপড়ে কাফন দিয়ে একটি বিশেষ ইউনিফর্মে আল্লাহর কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু মুজাহিদ হলে আল্লাহ স্বয়ং তার মহব্বতে এই নির্দিষ্ট রীতি পাল্টে ফেলেন। তাকে গোসলও দেওয়া হয় না। কেননা, সে তো রক্ত দ্বারা গোসল করেছে। তাই এখন পানি দ্বারা গোসল দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তার কাপড়ে রক্তের দাগ লেগে আছে। তো সে আমার কাছে ফুলের মতো প্রিয়। আমি চাই, কেয়ামতের দিন তাকে রক্তাক্ত কাপড়ে আমার সামনে উপস্থিত করা হোক।

সুবহানাল্লাহ!

## ব্যবসায়ীদের অংশ

রহমতের নবী থেকে ব্যবসায়ীরাও অংশ পেয়েছেন। যথা তিনি ইরশাদ করেন, সত্যবাদী ব্যবসায়ীগণকে কেয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট নবী রাসূলগণের সাথে উঠানো হবে।

## দিনমজুর লোকের অংশ

দিনমজুর লোকেরাও নবীজির রহমতের ভাগীদার হওয়া থেকে বঞ্চিত হননি। নবীজির দরবারে এক সাহাবী এসে তাঁর সাথে মুসাফাহা করলেন। নবীজি দেখতে পেলেন, তার হাতের তালু খুব শক্ত। নবীজি এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞাসা করলে সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি পাথর ভাঙি, যার কারণে আমার হাত এমন শক্ত হয়ে গেছে। তখন নবীজি তার হাত আপন হাতে নিয়ে বললেন,

اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللهِ

'নিজ হাতে উপার্জনকারী আল্লাহর প্রিয়ভাজন।'

এভাবেই নবীজি দিনমজুরদের রহমতের অংশীদার বানিয়েছেন।

## প্রতিবেশীর অংশ

প্রতিবেশীও নবীজির রহমত থেকে অংশ লাভ করেছে। নবীজি ইরশাদ করেন, পাড়া প্রতিবেশীর বিষয়ে জিবরীল আমাকে এতো তাকিদ দিয়েছেন যে, আমার মনে হয়েছিল, না জানি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দেওয়া হয়। এখন চিন্তা করে দেখুন, প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে কত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

## এতিমের অংশ

নবীজির রহমত থেকে এতিমও অংশ লাভ করেছে। সাধারণত সমাজে এতিমের হক সম্পর্কে কেউ গুরুত্ব দিতে চায় না। কিন্তু নবীজি ইরশাদ করেন,

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ هٰكَذَا.

'আমি ও এতিমের যিম্মাদার জান্নাতে একসাথে এমনভাবে থাকব, যেভাবে দুটি আঙুল পাশাপাশি থাকে।

## নবীজির দৃষ্টিতে এতিমের অবস্থান

প্রসিদ্ধ রেওয়ায়েতে আছে, একবার নবীজি ঈদের দিন ঘর থেকে মসজিদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথিমধ্যে তিনি দেখতে পেলেন, অনেকগুলো শিশু ঈদের নতুন জামা পরে খেলাধুলা করছে। তারা নবীজিকে দেখতে পেয়ে সালাম দিল। নবীজি তাদের সালামের জবাব দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। একটু সামনে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, একটি ছেলে বিষণ্ন মনে একপাশে চুপচাপ বসে আছে। নবীজি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এভাবে ঈশা বসে আছ কেন? ছেলেটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এতিম। আমার বাবা নেই। পিতার ছায়া থেকে আমি বঞ্চিত। আমার মা আমাকে গোসল দিয়ে পুরাতন কাপড় পরিয়ে দিয়েছেন। এজন্য আমি এখানে বসে আছি। নবীজি তাকে বললেন, তুমি আমার সাথে আসো।

নবীজি তাকে নিয়ে ঘরে গেলেন। আয়েশা (রাযি.)কে ডেকে বললেন, একে গোসল করিয়ে দাও। গোসল শেষ হওয়ার পর নবীজি স্বীয় চাদরের দুই টুকরা তাকে দিলেন। একটি তাকে লুঙ্গি বানিয়ে পরিয়ে দিলেন এবং অপরটি গায়ে জড়িয়ে দিলেন। তারপর ছেলেটির মাথায় তেল লাগিয়ে চুল আঁচড়িয়ে দিলেন। এবার তাকে নিয়ে রওনা হলেন। নবীজি তাকে বললেন, তুমি আমার কাঁধে উঠো। আজ তুমি আমার কাঁধে চড়ে যাবে। এপর নবীজি

তাকে কাঁধে নিয়ে ওই রাস্তায় গেলেন, যেখানে অনেক শিশু একসাথে খেলা করছিল। তারা সবাই এই কাণ্ড দেখে কাঁদতে লাগল আর বলতে লাগল, হায়! আমরাও যদি ওর মতো এতিম হতাম, তাহলে আমাদেরও নবীজির কাঁধে চড়ার সৌভাগ্য নসিব হতো।

তারপর নবীজি তাকে নিয়ে মসজিদের দিকে চললেন। মসজিদে প্রবেশ করার পর যখন নবীজি মিম্বরে উঠছিলেন, তখন এতিম ছেলেটি নিচে বসে ছিল। কিন্তু নবীজি তাকে বললেন, আজ তুমি নিচে বসবে না; বরং আমার সাথে মিম্বরে বসবে। তারপর নবীজি তার মাথায় হাত বুলিয়ে ইরশাদ করলেন, যেব্যক্তি এতিমের যিম্মাদার হবে এবং আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিবে, আল্লাহ ওই এতিমের মাথার চুলের সমপরিমাণ নেকী তার আমলনামায় দিয়ে দিবেন।

## ভিক্ষুক ও বঞ্চিত লোকের অংশ

ভিক্ষুক এবং বঞ্চিত লোকদেরও নবীজি স্বীয় রহমত থেকে বঞ্চিত করেননি। যথা- কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

'তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের জন্য প্রাপ্য রয়েছে।'[১]

## কারিগরের অংশ

নবীজি কারিগরকেও রহমতে স্থান দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন, কারিগর লোকেরা আল্লাহর নিকট অদক্ষ লোকের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়। এভাবেই তিনি তাদেরও অংশ দিয়েছেন।

## দাস-দাসীদের অংশ

দাস-দাসীদেরও নবীজি স্বীয় রহমতের ভাগীদার বানিয়েছেন। নবীজি পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় উম্মতকে নসীহত করতে গিয়ে বলেছেন-

اَلصَّلَاةُ اَلصَّلَاةُ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

'নামায! নামায! এবং তোমাদের অধীন দাস-দাসীদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো।'

---

১. সূরা যারিয়াত : আয়াত ১৯

## অন্যান্য প্রাণীকুলের অংশ

মানুষ তো মানুষই অন্যান্য প্রাণীকুলও নবীজির রহমত থেকে বঞ্চিত হয়নি। নবীজি ইরশাদ করেন, জাহিলিয়াতের যমানায় যেভাবে প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া হতো, সেভাবে তোমরা তাদের কষ্ট দিয়ো না। জাহেলি যুগে বৃষ্টি না হলে লোকেরা পশুর কোনো স্থানে যখম করত। সেখান থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে আগুন ধরিয়ে দিত। ফলে ওই পশু যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলে তারা উল্লাসে ফেটে পড়ত আর বলত, এখন বৃষ্টি আসবে। নবীজি এমন জঘন্য কাজ থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন, যে নিজের জন্য কোনো প্রাণীকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করবে, সে যেন তার সাওয়ারীর দানা-পানির যথাযথ ব্যবস্থা করে। তিনি এও শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে কেউ কোনো প্রাণীকে অযথা কষ্ট না দেয়।

## জিন জাতির অংশ

জিন জাতিকেও রহমতের নবী বঞ্চিত করেননি। তিনি ইরশাদ করেন, যখন কেউ স্বীয় প্রয়োজন পুরা করার জন্য বসে, তখন যেন সে বিসমিল্লাহ পড়ে। এর ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আড় বা পর্দা তাকে আড়াল করে নেয়, যাতে জিন জাতি তার সতর দেখতে না পায়। এছাড়া নবীজি এও ইরশাদ করেছেন, তোমরা কেউ হাড় বা এ জাতীয় বস্তু দ্বারা ঢিলা নিয়ো না। কেননা, এগুলো হচ্ছে জিন জাতির খাদ্য। এছাড়া জিনদের হক সম্পর্কে তিনি এভাবে বলেছেন, তোমরা এমন কিছু করো না, যাতে জিন জাতির কষ্ট হয়।

## গাছপালার অংশ

গাছপালা ও বৃক্ষরাজিও নবীজির রহমত থেকে বঞ্চিত হয়নি। নবীজি ইরশাদ করেন, গাছের পাতা বিনা প্রয়োজনে ছেঁড়া উচিত নয়। কেননা, গাছের সবুজ পত্র-পল্লব আল্লাহর যিকির করে। তিনি আরো ইরশাদ করেন, তোমরা ফলদার বৃক্ষের কাছে বা এর নিচে পেশাব-পায়খানা করো না। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর মধ্যে কী হেকমত রয়েছে? তিনি ইরশাদ করলেন, তোমরা দেখে থাকবে, যখন সূর্য উদিত হয় এবং তার উত্তাপ ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে, তখন গাছের ছায়া বাড়ে ও কমে। সাহাবীগণ বললেন, হাঁ; এমন তো হয়ে থাকে। তখন নবীজি বললেন, যখন গাছের ছায়া বাড়ে ও কমে, তখন গাছ আল্লাহকে সিজদা করে। এ হলো হেকমত। এজন্য তোমরা গাছের ইবাদাতের মধ্যে বাধা সৃষ্টি করো না।

## মৃত ব্যক্তির অংশ

রহমতের নবীর রহমত থেকে যেভাবে মানুষ, জীন, উদ্ভিদ এবং নিষ্প্রাণ বস্তু বঞ্চিত হয়নি, তদ্রূপ মৃত ব্যক্তিও বঞ্চিত হয়নি। নবীজি এ বিষয়ে উম্মতদের শিক্ষা দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন,

اُذْكُرُوْا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ

তোমরা তোমদের মৃতদের ভালো দিকগুলো স্মরণ করো। মৃতব্যক্তির মন্দ বিষয়গুলো উল্লেখ করতে তিনি নিষেধ করেছেন।

## ফেরেশতাগণের অংশ

রহমতের নবীর রহমত থেকে ফেরেশতারাও অংশ পেয়েছেন। একবার নবীজি জিবরীল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরীল! আমাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া রহমত থেকে আপনিও কিছু পেয়েছেন কি? জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, হাঁ; ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে! জিবরীল বললেন, আপনার আগমনের আগে আমি নিজচোখে শয়তানের কর্মকাণ্ড দেখেছি। এজন্য আপনার ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হচ্ছিল, আমার পরিণাম কী হবে জানা নেই। কিন্তু যখন আপনি তাশরীফ আনার পর আল্লাহ কুরআনে এভাবে ইরশাদ করেছেন–

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ. مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ.

'নিশ্চয় এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী, যে সামর্থ্যশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন, যাকে সেখানে মান্য করা হয়। তদুপরি সে বিশ্বাসভাজন।'[১]

তখন আমি নিশ্চিত হয়েছি, আমার পরিণতি এবার অবশ্যই ভালো হবে। এভাবেই আমি আপনার রহমতের ভাগীদার হয়েছি।

## তোমার ছায়াও অনেক ঘন...

এখন ভাবার বিষয় হলো, যে নবীর রহমতের অংশ থেকে সারা জাহানের সবাই ভাগীদার হলো, তিনি কেমন রহমতস্বরূপ পৃথিবীতে প্রেরিত হলেন। এজন্য কোনো কবি বলেছেন–

---

১. সূরা তাকভীর : আয়াত ১৯,২০

وہ جو شیریں سخنے ہے میرے مکی مدنی
تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی

'ওই যে যিনি বড় মিষ্টভাষী, তিনি আমার মাক্কী-মাদানি (নবী)।
এ তো তোমার ঠোঁটনিসৃত হে আমার মাক্কী-মাদানি (নবী)।'

تیرا پھیلاؤ بہت ہے تیرا قامت ہے بلند
تیری چھاؤں بھی گھنی ہے میرے مکی مدنی

'তোমার বিশালতা অনেক, তোমার উচ্চতাও অনেক। তোমার ছায়াও অনেক ঘন হে আমার মাক্কী-মাদানি (নবী)।'

دست قدرت نے تیرے بعد پھر ایسی تصویر
نہ بنائی نہ بنی ہے میرے مکی مدنی

'কুদরতি হাত তোমার উপর এমন ছবি। বানাওনি, বনেওনি হে আমার মক্কী-মাদানি (নবী)।'

نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم
تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی مدنی

প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমরা তোমার করুণার কাছে ঋণী। তুমি অমুখাপেক্ষীর প্রতিনিধি, বেনিয়ায হে আমার মক্কী-মাদানি (নবী)।'

## উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ করুণা

নবীজির মুবারক ও মকবুল দু'আ থেকেও এই গুনাহগার উম্মত পূর্ণ অংশ লাভ করেছে। কিতাবে লেখা হয়েছে, নবীজির দু'আর ওসীলায় আল্লাহ এই উম্মতের ওপর থেকে অনেক বালা-মুসিবত উঠিয়ে নিয়েছেন। যথা- আদম (আ.)-এর ভুলের কারণে তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয়। এমনকি জান্নাতের পোশাকও তার দেহ থেকে খুলে নেওয়া হয়। কুরআনে এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে আশ্চর্যজনক মুআমালা আল্লাহ করেছেন। তাদের কেউ যদি জেনে-বুঝেও গুনাহ্ করে, আল্লাহ এই কারণে তাকে স্বীয় দরবার থেকে সরিয়ে দেন না। বরং তার তাওবা কবুল করেন। যদি কেউ দেহের কাপড় খুলেও গুনাহ করে, তারপরও আল্লাহ তার দেহ থেকে কাপড় সরিয়ে নেন না। যদি কেউ ঘর থেকে বের হয়ে গুনাহ করে, আল্লাহ তারপরও তাকে পুনরায় ঘরে ফিরিয়ে দেন।

■ বনী ইসরাঈলের কেউ গোপনে গোনাহ করে ফেললে তার ঘরের দরজায় লিখে দেওয়া হতো, এই লোক গোপনে গুনাহ করছে। তখন তার একথা সবাই জানলে সমাজে সে চরম অপমানিত হতো। কিন্তু নবীর উম্মতের কেউ গোপনে গুনাহ করলে আল্লাহ তা গোপন রাখেন, যাতে সে লাঞ্ছিত না হয়। কেউ কবীরা গুনাহ করলে আল্লাহ তাকে সাথে-সাথে পৃথিবীতে শাস্তি না দিয়ে রহমতের চাদর দ্বারা ঢেকে দেন, যাতে সে তাওবার সুযোগ পায়।

■ হাদীছে আছে, বনী ইসরাঈলের লোকেরা যখন বাছুরপূজা শুরু করল, তখন আল্লাহ তাদেরকে তাওবা করানোর জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার হুকুম দিলেন। তারপর বৃষ্টির মাধ্যমে চারপাশ অন্ধকার করে দিলেন। তারপর নির্দেশ দিলেন, যারা পূজা করনি, তারা ছুরি নিয়ে বের হও এবং যারা বাছুর হত্যা করেছে তাদের হত্যা করো। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

فَاقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

'তোমরা নিজেদের হত্যা করো।'[১]

এভাবেই কঠিন শর্তারোপ করে আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন। কিন্তু এ নবীর উম্মতের বেলায় এরকম কঠিন শর্ত আরোপ করা হয়নি। এমনকি কোনো কাফির ও মুশরিকও যদি খালেস দিলে তাওবা করে, আল্লাহ তাকেও মাফ করে দেন।

■ প্রথম দিককার উম্মতের ব্যাপারে কিতাবে লেখা হয়েছে, তাদের কাপড়ে কোনো নাপাকি লাগলে তা কেটে ফেলতে হতো। কিন্তু এই নবীর উম্মতের কাপড়ে নাপাকি লাগলে এ ব্যাপারে আল্লাহ বিধানকে সহজ করে দিয়েছেন। এমনকি শরীরেও যদি নাপাকি লাগে, তাহলে তা পানি দ্বারা ধুয়ে ফেললেই পাক হয়ে যায়।

■ বনী ইসরাঈলের কেউ স্বীয় দেহের কোনো অঙ্গ দ্বারা গোনাহ করলে সেই অঙ্গ কেটে ফেলার নির্দেশ ছিল। অন্যথায় গুনাহ মাফ হতো না। কিন্তু এই নবীর উম্মতের বেলায় আল্লাহ অনেক সহজ করে দিয়েছেন। তাওবা করলেই মাফ পাওয়া যায়।

■ বনী ইসরাঈলের লোকেরা যখন যাকাত দিত, তখন তাদের ওপর হুকুম ছিল, যাকাতের মাল কোনো পাহাড়ের চূড়ায় রেখে আসতে হতো। আগুন এসে তা জ্বালিয়ে ফেললে যাকাত কবুল হতো। অন্যথায় যাকাত

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ৫৪

আদায় হতো না। যদি তার মধ্যে হারাম মাল থাকত, তাহলে তা কবুল হতো না; আগুনও জ্বালিয়ে ফেলত না। তখনই মালের মালিককে সমাজে খুঁজে বের করা হতো এবং সবার সামনে তাকে অপমান করা হতো একথা বলে যে, সে হারাম মাল উপার্জন করেছে।

কিন্তু এই নবীর উম্মতের বেলায় আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন। কত আশ্চর্যজনক কথা, এই উম্মতের কেউ যাকাত দিতে চাইলে তা স্বীয় আপন গরিব ভাইকেও দিতে পারে। এছাড়া স্বীয় আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী লোকদেরও দিতে পারে। মানুষের মাল-সম্পদ আগুন জ্বালিয়ে ফেলত এবং তা কোনো কাজে আসত না। এর বিপরীতে এই নবীর উম্মত স্বীয় মালের যাকাত এমন খাতে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে যে, কোনো গরিব লোকদেরও দিতে পারল আবার তা ব্যবহারের উপযোগীও থাকল। আর যদি ওই মালে কোনো ভেজাল থাকে, তাহলে এ বিষয়টি আল্লাহ আখেরাতের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এজন্য তাকে এই পৃথিবীতে অপমানিত করেন না।

- আল্লাহ রহমতের নবীর উম্মতের ওপর আরো কিছু বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন। যথা- নবীজি ইরশাদ করেন, আল্লাহ আমার উম্মতের জন্য পুরো যমীনকে নামাযের উপযোগী করেছেন। তিনি আরো বলেন, আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করেছি, হে আল্লাহ! তুমি আমার উম্মতের আকারকে বিকৃত করো না। আল্লাহ তা'আলা আমার দু'আ কবুল করেছেন। অথচ আগের উম্মতের গুনাহের ফলে তাদের বিকৃতি ঘটেছে। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ

'তোমরা নিকৃষ্ট বানরে পরিণত হয়ে যাও।'[১]

নবীজি এই দু'আও করেছেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতের উপর এমন কোনো অত্যাচারী নিযুক্ত করবেন না, যে আমার উম্মতের সবাইকে সমূলে মূলোৎপাটন করে। আল্লাহ এই দু'আও কবুল করেছেন। তারপর নবীজি আরো কিছু বিশেষ দু'আ করেছেন। নবীজি বলেন, আমার ওই দু'আগুলোও কবুল হয়েছে। যথা–

• যেব্যক্তি মহামারিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে, সে কেয়ামতের দিন শহীদের কাতারে শামিল হবে।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ৬৫

• যেব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যাবে, সেও শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

• যেব্যক্তি আগুনে পুড়ে মারা যাবে, সেও শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

• যেব্যক্তি ঘর ধসে কিংবা কোনো দুর্ঘটনায় মারা যাবে, সে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

• এমনকি কোনো নারী যদি বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে, সেও শহীদদের কাতারে শামিল হবে।

## উম্মতের চিন্তায় নবীজির ক্রন্দন

হাদীছে বর্ণিত আছে, নবীজি যখন তাহাজ্জুদের নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং ওই সব আয়াত যখন আসত, যেখানে উম্মতের পরিণতির কথা উল্লেখ হয়েছে, তখন তিনি স্বীয় গুনাহগার উম্মতের কথা স্মরণ করে কাঁদতেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَعَاداً وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً . وَكُلاًّ ضَرَبْنَا لَهُ الأَمْثَالَ وَكُلاًّ تَبَّرْنَا تَتْبِيراً

'আমি ধ্বংস করেছি আদ ছামুদ ও রাস-এর অধিবাসীকে এবং তাদের অন্তর্বর্তী কালের বহু সম্প্রদায়কেও এবং আমি তাদের প্রত্যেকের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি এবং তাদের সকলকেই আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছি।'[১]

## নবীজির দু'আর নিদর্শন

নবীজির দাড়িতে কয়েকটি সাদা চুল পাওয়া গেল। তখন কেউ জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার দাড়ি দ্রুত সাদা হয়ে যাচ্ছে। নবীজি বললেন, আমাকে সূরা হুদ এবং এ জাতীয় অন্যান্য সূরাগুলো বুড়া বানিয়েছে। তো যখন নবীজি আগের উম্মতের কথাসম্বলিত আয়াত পড়তেন, তখন স্বীয় গুনাহগার উম্মতের কথা স্মরণ করে দু'আ করতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতের সাথে রহমতের মু'আমালা করুন। দু'আ করার সময় নবীজির দাড়ি মুবারক চোখের অশ্রুতে ভিজে যেত। কখনও নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে পা মুবারক ফুলে যেত। এক রেওয়ায়াতে আছে, খাওয়ার সময় নবীজির স্বীয় উম্মতের কথা স্মরণ হলে তিনি খাওয়া ছেড়ে দিতেন এবং দু'আয় লিপ্ত হয়ে যেতেন। নবীজির দু'আর ফলেই এই উম্মত চারপাশ থেকে

---

১. সূরা ফুরকান : আয়াত ৩৮,৩৯

নিরাপদ হয়ে গেছে। এ কারণেই এই উম্মত সার্বিকভাবে নিরাপত্তা লাভ করেছে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বক্ষেত্রে রহমতের মুয়ামালা লাভ করছে।

## নবীজির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

মনে রাখতে হবে, উম্মতের চিন্তায় কাঁদা আগের নবীদের জীবনীতে আমরা পাই না। এটি একমাত্র আমাদের নবীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এটি নবীজির বৈশিষ্ট্যই ছিল যে, তিনি উম্মতের চিন্তায় يَا رَبِّ أُمَّتِيْ (ইয়া রাব্বি উম্মাতী) বলে কাঁদতেন। আগের নবীদের উম্মতের বেলায় দেখা যায়, তাঁদের কওম দাওয়াত কবুল না করলে তারা তাদের বিরুদ্ধে বদ দু'আ করতেন। নূহ আলাইহিস সালাম স্বীয় কওমের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করতে গিয়ে এভাবে বলেছেন-

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا

'পৃথিবীতে একটা কাফেরকে ছেড়ে দিয়ো না।'[১]

তিনি কোনো কাফিরকেই ছাড়েননি। অপরদিকে নবীজি রাতের বেলায় নামাযে উম্মতের জন্য কাঁদতেন আর দু'আ করতেন।

## প্রত্যেক নবীকে প্রদত্ত একটি দু'আর অধিকার

নবীজি ইরশাদ করেন, আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে যেকোনো একটি দু'আ করার সুযোগ দিয়েছেন এভাবে যে, তারা যে দু'আই করুন-না কেন, আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রত্যেক নবী কি এই দু'আ করে ফেলেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। তখন সাহাবীগণ বললেন, হে নবী! আপনি কী দু'আ করেছেন? নবীজি বললেন, আমি আমার জন্য নির্ধারিত বিশেষ ওই দু'আ কেয়ামতের দিনের জন্য রেখে দিয়েছি। ওই দিন আমি এই দু'আর মাধ্যমে আমার উম্মতের জন্য ক্ষমা চাইব। সুবহানাল্লাহ!

## কেয়ামতের দিন উম্মতে মুহাম্মাদীর পরিচিতি

নবীজি ইরশাদ করেন, আমার উম্মতকে কবর থেকে উঠানোর সময় আমি তাদের জন্য শাফায়াত করব। একে শাফায়াতে কুবরা বলা হয়। এই শাফায়াতের ফলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আয়েশা (রাযি.)

---

১. সূরা নূহ : আয়াত ২৬

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেদিন তো অনেক মানুষ উঠবে। এতো মানুষের ভিড়ে আপনার উম্মতকে কিভাবে চিনবেন?

নবীজি বললেন, ওইদিন আমার উম্মতের ওযুর অঙ্গগুলো ঝলমল করতে থাকবে, যা অন্যদের বেলায় হবে না।

এভাবে আমি আমার উম্মতকে চিনে নেব।

## বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ

নবীজি ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সত্তর হাজার লোককে বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন। আর এই সত্তর হাজারের প্রত্যেকেই সত্তর হাজার করে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এই সত্তর হাজারের মধ্যে ধরুন ইমাম আবু হানীফা রয়েছেন। তিনি তার অনুসারীদের মধ্যে থেকে সত্তর হাজারকে নিয়ে যাবেন। এভাবে প্রত্যেক ফকীহ তার অনুসারীদের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোককে জান্নাতে সাথে করে নিয়ে যাবেন। দেখুন, এভাবে মোট কতজন জান্নাতে যাবে? সত্তর হাজারকে সত্তর হাজার দিয়ে গুণ করলে যা হয় এই পরিমাণ জান্নাতে বিনা হিসাবে প্রবেশ করবে। সুবহানাল্লাহ!

আল্লাহ তা'আলা যখন এই ওয়াদা দিলেন, তখন পুনরায় দু'আ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! এ তো অনেক কম হয়ে গেল। আরো অনেক লোক বাকি রয়ে গেছে, যারা এখনও ক্ষমা পায়নি। তখন আল্লাহ বলবেন, হে আমার নবী! আমার ওয়াদা আমি দিচ্ছি যে, আপনার কাঁদা ও দু'আ আমি কবুল করেছি। আর আমি এই ওয়াদাও করছি যে, কেয়ামতের দিন আমি আপনার উম্মতের দুই হাত ভরে জাহান্নাম থেকে বের করে আনব এবং তাদেরকে স্বীয় রহমতে জান্নাত দান করব।

## আদমের মিরাস থেকে নবীজির অধিক অংশ

আল্লাহর নবী ইরশাদ করেন, কেয়ামতের দিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মোট ১২০টি কাতার হবে। এর মধ্যে শুধু আমার উম্মতের কাতার ৮০টি হবে এবং অন্যান্য সমস্ত নবীগণের উম্মতের কাতার হবে ৪০টি। সুবহানাল্লাহ! আপনারা দেখে থাকবেন, পিতার সম্পত্তি বণ্টনের সময় ছেলে দুই অংশ এবং কন্যা এক অংশ পায়। এমনিভাবে আদম আলাইহিস সালামের মিরাস বণ্টনের সময় নবীগণের অংশে নির্দিষ্ট এবং শেষ নবীর ভাগে বেহিসাব অংশ লাভ হবে।

## কেয়ামতের দিনে উম্মতে মুহাম্মদীকে সিজদার হুকুম

অন্যস্থানে নবীজি ইরশাদ করেন, আল্লাহ কেয়ামতের দিন আমার উম্মতকে সিজদাহ করার অনুমতি দিবেন। তখন যারা সিজদা করবে, তাদেরকে তিনি জান্নাত দান করবেন।

## উম্মতের ব্যাপারে চিন্তার অবসান

এক রেওয়ায়েতে আছে, একবার জিবরীল নবীজির দরবারে আগমন করলেন। তখন তিনি বিষণ্ন ছিলেন। নবীজি তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আজ আমি জাহান্নাম পরিদর্শন করেছি। যা দেখেছি, তাতে আমি হয়রান হয়ে গেছি। তখন নবীজি বললেন, জাহান্নামের কী অবস্থা দেখেছেন বলুন। জিবরীল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহান্নাম সাত স্তর বিশিষ্ট হবে। সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে মুনাফিক। এর উপরে ষষ্ঠ স্তরে থাকবে মুশরিক। এর উপরে পঞ্চম স্তরে সূর্য ও চন্দ্রপূজারীরা থাকবে। এর উপরে চতুর্থ স্তরে থাকবে অগ্নিপূজারীরা। এর উপরে তৃতীয় স্তরে থাকবে ইয়াহুদিরা। এর উপরে দ্বিতীয় স্তরে থাকবে খ্রিষ্টানরা। তারপর জিবরীল আলাইহিস সালাম চুপ হয়ে গেলেন। নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, ভাই জিবরীল! আপনি চুপ হয়ে গেলেন কেন? বলুন, প্রথম স্তরে কারা থাকবে? তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, প্রথম স্তরে থাকবে আপনার গুনাহগার উম্মতরা। একথা শুনে নবীজি বিষণ্ন হয়ে গেলেন। তিনি তখনই তাঁর উম্মতের কথা মনে করে দু'আ করতে লাগলেন। কিতাবে লিখা আছে, একথা শোনার পর নবীজির অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তিন দিন পর্যন্ত তিনি শুধু নামাযের সময় মসজিদে আসতেন। নামায পড়িয়ে স্বীয় রুমে চলে আসতেন। রুমের দরজা বন্ধ করে পরওয়ারদেগারের দরবারে আহাজারি করতেন। সবার সাথে যোগাযোগ ছেড়ে দিয়েছিলেন।

নবীজির এই অবস্থা দেখে সাহাবাগণ পেরেশান হয়ে গেলেন। হঠাৎ কী হলো যে, নবীজি কারো সাথে কথা বলছেন না; নামায পড়ে ঈশাকি চলে যাচ্ছেন? ঘরেও যাচ্ছেন না; এর কারণ কী? তিন দিন পর এই অবস্থা আবুবকর (রাযি.) আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি নবীজির রুমের সামনে গিয়ে তিনবার আসসালামু আলাইকুম লাব্বাইকা ইয়া রাসূলল্লাহ বললেন। কিন্তু ভিতর থেকে কোনো উত্তর পেলেন না। বারবার ব্যর্থ হয়ে আবুবকর (রাযি.) কাঁদতে-কাঁদতে ফিরে গেলেন। ওমর (রাযি.)কে ডেকে নবীজির কাছে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। তিনি ওমর (রাযি.) কে বললেন, আপনি যান; হয়তোবা সাড়া পাওয়া যাবে। ওমর (রাযি.) নবীজির দরজায়

গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে তিনবার সালাম দিলেন। কিন্তু নবীজির পক্ষ থেকে কোনো সাড়া নেই। তিনিও মনে করলেন, মনে হয় এখন দরজা খোলার অনুমতি নেই। সুতরাং তিনিও ফিরে গেলেন। ফেরার পথে সালমান (রাযি.)-এর সাথে ওমর (রাযি.)-এর সাক্ষাৎ হলো। ওমর (রাযি.) বললেন, হে সালমান! আপনার ব্যাপারে নবীজি বলেছেন–

سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ

'সালমান আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত।'

এজন্য আপনিই নবীজির কাছে যান। হয়তোবা আপনার ওসীলায় আল্লাহ দরজা খোলার ব্যবস্থা করবেন। সালমান (রাযি.) নবীজির দরবারে গেলেন, সালাম দিলেন। কিন্তু কোনো জবাব পেলেন না। তারপর আলী (রাযি.)কে এ ব্যাপারে বলা হলো। তিনি অন্য চিন্তা করলেন। তিনি নবীজির কাছে না গিয়ে স্বীয় ঘরে আগমন করলেন। স্বীয় স্ত্রী ও নবীর কন্যা ফাতেমা (রাযি.)কে ঘটনা খুলে বললেন। তিন দিন ধরে নবীজির কোনো খবর নেই। তিনি একাকি সময় কাটাচ্ছেন। যখন মসজিদে গমন করেন, তখন চেহারায় বিষণ্নতার ছাপ থাকে। তিনি কারো সাথেই কোনো কথা বলছেন না। তুমি গিয়ে দরজায় করাঘাত করো। হতে পারে, তোমার ওসীলায় দরজা খোলা হবে। যথারীতি ফাতেমা (রাযি.) গিয়ে নবীজিকে সালাম দিলেন। নবীজি সালামের জবাব দিয়ে দরজা খুললেন। নবীজি তাঁকে ভিতরে আসতে বললেন। ফাতেমা (রাযি.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর নবী! তিন দিন ধরে আপনার কী হলো? মজলিসে গমন করছেন না, কারো সাথে কথা বলছেন না, একাকি রুমে সময় কাটাচ্ছেন, আপনার চেহারা মলিন হয়ে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

নবীজি বললেন, জিবরীল এসে আমাকে বলেছে, আমার কিছু গোনাহগার উম্মত জাহান্নামে যাবে। হে ফাতেমা! আমার গোনাহগার এসব উম্মতের জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে। আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করছি, তিনি যেন তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি দেন। একথা বলে নবীজি আবারও সিজদায় পড়ে গেলেন। আহ! কী দীর্ঘ এক লম্বা সিজদা। এই সিজদায়ও নবীজি অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওয়াদা এল–

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

আল্লাহ অচিরেই আপনাকে এতো দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হবেন।[১]

---

১. সূরা যোহা : আয়াত ৫

নবীজি অন্য জায়গায় ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা আমার সাথে ওয়াদা করেছেন, তিনি কেয়ামতের দিন আমাকে সন্তুষ্ট করবেন। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত সন্তুষ্ট হব না, যতক্ষণ না আমার শেষ উম্মত জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। তারপর নবীজি স্বীয় কক্ষ থেকে বের হলেন।

## কেয়ামতের দিনে আদমের সন্তানদের অবস্থা

সালমান ফারসি থেকে বর্ণিত আছে, কেয়ামতের দিন সূর্য পৃথিবীর চেয়ে দশগুণ বেশি উত্তপ্ত হবে। তখন প্রত্যেক মানুষের মনে হবে, সূর্য যমীন থেকে কয়েক গজ উপরে। সূর্যের তাপের কারণে মানুষ ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খেতে থাকবে। তবে সাত ধরনের লোক আরশের ছায়ার নিচে আশ্রয় পাবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, সমস্ত মাখলুক ধোঁয়া এবং পিপাসার কারণে ছটফট করতে থাকবে। এভাবেই কয়েক হাজার বছর কেটে যাবে।

## আদম আলাইহিস সালামের কাছে আবেদন

অবশেষে সমস্ত লোক পেরেশান হয়ে আদম আলাইহিস সালামের কাছে যাবে এবং বলবে,

يَا أَبَانَا! قَدِّمْ مَعَنَا

হে আমাদের বাবা! আপনি আমাদের সাথে আগে চলুন এবং আল্লাহর কাছে আবেদন পেশ করুন, হে আল্লাহ! এই কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আপনি তাড়াতাড়ি আমাদের হিসাব নিয়ে নিন, যাতে আমরা যার যেখানে যাওয়ার সেখানে তাড়াতাড়ি যেতে পারি। তখন আদম আলাইহিস সালাম বলবেন, আমি ভুল করে জান্নাতের নিষিদ্ধ ফল খেয়েছিলাম, যার ফলে ৩০০ বছর কাঁদার পর আমাকে ক্ষমা করা হয়েছিল। হাদীছে বর্ণিত আছে, পুরো পৃথিবীর সমস্ত মানুষের যে পরিমাণ চোখের অশ্রু রয়েছে, তা হলো দশ ভাগের এক ভাগ আর বাকি নয় ভাগ আদম আলাইহিস সালামের চোখের পানি, যা তার ৩০০ বছর যাবত চোখ থেকে কাঁদতে-কাঁদতে ঝরেছে। দীর্ঘ ৩০০ বছর কাঁদার পর আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেন। এত কান্না ও মাফ চাওয়ার পর এবং তাওবা কবুল হওয়ার পর অবশেষে তিনি কাবাঘর নির্মাণ করেন এবং পর-পর তিনবার হজ করেন পায়ে হেঁটে। অথচ এরপরও তিনি কেয়ামতের দিন বলবেন, আল্লাহর সামনে যেতে আমার লজ্জা করছে।

চিন্তা করে দেখুন, আদম আলাইহিস সালামের তাওবা কবুল করা হয়েছে, অথচ তিনি তাঁর কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হচ্ছেন। যখন কেয়ামতের ময়দানে আমাদের বাবার এই অবস্থা; এমতাবস্থায় আমরা গুনাহ থেকে তাওবা না করে মারা যাওয়ার পর আল্লাহর দরবারে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়ানো কত কঠিন হবে! এজন্য কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

আপনি যদি দেখতেন, যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে মাথা নুয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে।'[১]

কেয়ামতের দিন যখন এতই লজ্জিত হতে হবে, তখন সবচেয়ে উত্তম হলো, আমরা গুনাহ থেকে আজই তাওবা করে নেই।

## নূহ আলাইহিস সালামের প্রতি আবেদন

তারপর আদম আলাইহিস সালাম সবাইকে নূহ আলাইহিস সালামের কাছে যেতে বলবেন। তখন সবাই নূহ আলাইহিস সালামের অনুসন্ধান শুরু করবে। তাঁকে পাওয়ার পর সবাই তাঁর প্রতি আবেদন জানাবে, হে দ্বিতীয় আদম! আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করুন। আমাদেরকে আল্লাহর সামনে নিয়ে যান। তখন নূহ আলাইহিস সালাম বলবেন, না; আমি পারব না। আমি আমার এক পুত্রের জন্য দু'আ করলে আল্লাহ আমাকে এ বলে সতর্ক করে দেন–

إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ

'আমি তোমাকে মূর্খ লোকদের মতো হওয়া থেকে সতর্ক করছি।'[২]

হে নূহ! আপনি এমন দু'আ করবেন না। অন্যথায় আপনার থেকে আমি নবুওয়ত উঠিয়ে নেব। এজন্য আমার ভয় হয়, আমি ওই দু'আ আবার করি। আমি এর জন্য আল্লাহর কাছে সাথে-সাথে মাফ চাইছি। তাই আমি এখন আল্লাহর সামনে যেতে পারব না। নূহ আলাইহিস সালামের প্রকৃত নাম আবদুল গাফফার ছিল। তিনি উক্ত দু'আ করার পর আল্লাহর দরবারে এতো কেঁদেছেন যে, তার নাম নূহ হয়ে গিয়েছে। নূহ শব্দের অর্থ হলো বিলাপকারী। এতো কাঁদার পরও যখন কেয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে যেতে ভয় লাগবে, তাহলে চিন্তা করার বিষয় যে, আমরা তো গোনাহ করে

---

১. সূরা নূহ : আয়াত ২৬
২. সূরা হুদ : আয়াত ৪৬

কাঁদি না। বরং গোনাহ করে তা আনন্দের সাথে অন্যকে বলি। আসুন, আমরা চিন্তা করি, কেয়ামতের দিন আমরা কিভাবে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হব।

## ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি আবেদন

তারপর নূহ (আ.) সবাইকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে যেতে বলবেন। তখন সবাই ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে আরজ করবে, হে আল্লাহর খলীল! আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে আর্জি পেশ করুন। কিন্তু তিনি বলবেন, না; আমি পারব না। আমার আল্লাহর সামনে যেতে ভয় লাগছে। কারণ, আমার জীবনে তিনটি কথা এমন ছিল, যা যুক্তির বিবেচনায় ঠিক থাকলেও বাস্তবতার বিপরীত ছিল। আজ আমার এই তিন কথার কারণে লজ্জা লাগছে। এর মধ্যে প্রথম কথা হলো, একবার ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কওমের লোকেরা তাঁকে কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে তিনি বলেছিলেন, আমি অসুস্থ। বাস্তবে এই কাফিরদের সাথে কোথাও যাওয়া রূহের অসুস্থতা ছিল। এজন্য তিনি আপত্তি পেশ করেছিলেন। আল্লাহ কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

'আমি অসুস্থ।'[১]

তিনি তো আপত্তি পেশ করেছিলেন অসুস্থতার কথা বলে; কিন্তু তা বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এজন্য তিনি আল্লাহর সামনে যেতে লজ্জাবোধ করবেন।

দ্বিতীয় কথা হলো, একবার তিনি স্বীয় বিবি সারা (রাযি.)কে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানকার বাদশাহ অত্যাচারী শাসক ছিল। উক্ত জালিম তার বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল, কোথাও কোনো সুন্দরী মেয়ে পেলে আমার কাছে নিয়ে আসবে। এভাবে সে নারীদের সম্ভ্রমহানিতে মেতে উঠত। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বিবি সারা (রাযি.) অত্যধিক সুন্দরী ছিলেন। ওই বাদশাহর বাহিনীর লোকেরা সারাকে দেখতে পেয়ে তাকে পাকড়াও করে বাদশাহর কাছে নিয়ে গেল। বাদশাহর রীতি ছিল, কোনো নারীর সাথে তার স্বামী থাকলে তাকে মেরে ফেলত। অপরদিকে নারীর ভাই কিংবা পিতা হলে মারত না। কিন্তু সে হারাম কাজ করত। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বীয়

---

১. সূরা সাফফাত : আয়াত ৮৯

জান বাঁচানোর জন্য ওই বাদশাহর সামনে বললেন, এ আমার বোন হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

'ঈমানদার পরস্পর ভাই ভাই।'[১]

এজন্যই ঈমানের সূত্রে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে পরস্পরে ভাই-বোন বলা হয়। ইবরাহীম আলাইহিস সালামও সেই আলোকে সারাকে নিজের বোন বলেছেন। একথা তো শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে শতভাগ সঠিক ছিল। প্রাণ বাঁচাতে তো হারাম জিনিস হালাল হয়ে যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজের ব্যাপারে আশঙ্কা করবেন।

তাঁর তৃতীয় কথা ছিল এই যে, একবার তিনি তাঁর কওমের কাফিরদের সমস্ত মূর্তি ভেঙে ফেললেন। কাফিররা তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তোমাদের সবচেয়ে বড় মূর্তিকে জিজ্ঞাসা করো। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মূর্তিগুলো ভেঙে তরবারীটা বড় মূর্তির কাঁধে রেখে দিয়েছিলেন। এজন্য তিনি বড় মূর্তিকে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাটি বড় বা গুরুতর কোনো ব্যাপার ছিল না। কিন্তু বাস্তবতার বিপরীত ছিল। এতদসত্ত্বেও একথার কারণে তাঁর এতো আফসোস হবে যে, আল্লাহর খলীল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সামনে যেতে অপারগতা পেশ করবেন।

এখন আমরা চিন্তা করি, আমরা রাত-দিন যত মিথ্যা কথা বলি, মিথ্যা কসম খাই, মিথ্যা সাক্ষ্য দেই, মানুষের সামনে নিজের ভুল আড়াল করার জন্য পৃথিবীর লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য মিথ্যা কথা বলি, কেয়ামতের দিন আমরা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কিভাবে দাঁড়াব?

## মুসা আলাইহিস সালামের প্রতি আবেদন

তারপর ইবরাহীম (আ.) সবাইকে মূসা আলাইহিস সালামের কাছে যেতে বলবেন। তখন সবাই মুসা আলাইহিস সালামের কাছে এসে আরজ করবে, হে কালীমুল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য সুপারিশ করুন। তখন মুসা আলাইহিস সালাম অপারগতা পেশ করে বলবেন, আমি পারব না। কারণ, একবার আমার বিরোধী এক লোক আমার অনুগত অপর একজনের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছিল। তখন আমি তার সংশোধনের লক্ষ্যে তাকে একটা

---

১. সূরা হুজরাত : আয়াত ১০

চড় মেরেছিলাম। কিন্তু আমার থাপ্পড়ের আঘাত সইতে না পেরে লোকটি মৃত্যুবরণ করেছিল। আমি তাৎক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে মাফ চাই। যদিও আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করার ঘোষণা দিয়েছেন; কিন্তু তারপরও আমার আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে লজ্জাবোধ হচ্ছে।

## ঈসা আলাইহিস সালামের প্রতি আবেদন

একথা বলে মুসা আলাইহিস সালাম সবাইকে ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে যেতে বলবেন। কিন্তু তিনিও অপারগতা পেশ করে বলবেন, আমি তা করতে পারব না। কারণ, আমার উম্মত আমাকে এবং আমার মাকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে। তাই আমার ভয় হয়, না জানি আজ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করে ফেলেন। এজন্য আজ আমার আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে ভয় করছে।

## নবীজির প্রতি সুপারিশের আবেদন

তারপর ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়ার জন্য সবাইকে বলবেন। তখন যথারীতি সবাই নবীজির কাছে সমবেত হবে। তারগীব ওয়াত তারহীব কিতাবে হাফিয মুনযিরী (রহ.) লিখেছেন, ওই সময় আল্লাহর সমস্ত নবী ও রাসূলের জন্য মিম্বর স্থাপিত হবে। সমস্ত নবী মিম্বরে স্ব-স্ব স্থানে বসবেন। নবীজির জন্যও মিম্বর আনবেন। কিন্তু তিনি মিম্বরে বসবেন না। কেননা, তখন নবীজির একথা মনে হবে যে, হয়তোবা আমি এই মিম্বরে বসে পড়লে তা উড়ে জান্নাতে ঢুকে যাবে আর আমার গোনাহগার উম্মত পিছনে পড়ে যাবে। তখন নবীজিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আপনি কেন মিম্বরে বসছেন না? তিনি আরজ করবেন, হে আল্লাহ! আমার গোনাহগার উম্মতের ব্যাপারে তো এখনও কোনো ফয়সালা হয়নি। আমি কিভাবে মিম্বরে বসব।

তখন আল্লাহ্ নবীজির প্রতি একটি বিশেষ তাজাল্লি দিবেন। নবীজি বলেন, তারপর আল্লাহ্ আমাকে প্রতিশ্রুত 'মাকামে মাহমুদ' দান করবেন। আমি সেখানে একটি সিজদা করব। উক্ত সিজদায় আমি আল্লাহর এমন প্রশংসা করব, যা আগে কেউ করেনি। পরেও কেউ করবে না। সিজদায় গিয়ে আমি কাঁদতে থাকব। আল্লাহ্ এই সিজদা কবুল করবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন, হে আমার প্রিয় মাহবুব! আপনি কী চান বলুন? তখন আমি বলব, হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দাদের হিসাব নেওয়া শুরু করুন। তখন আল্লাহ্ সমস্ত মাখলুকের হিসাব নেওয়া শুরু করার ঘোষণা দিবেন।

## আবুবকর (রাযি.)-এর হিসাব

হাদীছে এসেছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর নবীজি আবুবকর (রাযি.)-এর হাত ধরে বলবেন, আপনি আল্লাহর সামনে যান; তাহলে হিসাব নেওয়া শুরু হবে। একথা শুনে আবুবকর (রাযি.)-এর চোখে অশ্রু এসে যাবে। তিনি বলবেন, হে আল্লাহর নবী! আমি আমার জীবনের শেষ দিকে মুসলমান হয়েছি। জীবনের অধিকাংশই আমার ইসলাম ছাড়া অতিবাহিত হয়েছে। এজন্য আমি চাই, সবার আগে আমি আল্লাহর সামনে না যাই। কিন্তু নবীজি বলবেন, হে আবুবকর! আপনাকেই আগে যেতে হবে। তারপর আবুবকর আগে যাবেন। তিনি ওই কাজই করবেন, যা নবীজি করেছেন। তিনিও আল্লাহর দরবারে সিজদায় পড়ে যাবেন এবং কাঁদতে থাকবেন।

কিতাবে লেখা আছে, আবুবকর এতো কাঁদবেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ডেকে বলবেন, হে আমার মাহবুবের গুহার সহযোগী! আপনি কেন কাদছেন? সিজদা থেকে মাথা উঠান। বলুন, কী চান? তারপর আল্লাহ তাঁর সিজদাকেও কবুল করবেন।

হাদীছে এসেছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ স্বীয় বান্দাগণের ওপর সাধারণভাবে তাজাল্লি দিবেন। কিন্তু আবুবকরের ওপর বিশেষ তাজাল্লি দিবেন। আবুবকর (রাযি.)-এর ওপর খুশি হয়েই আল্লাহ তাঁর উপর বিশেষ তাজাল্লি দান করবেন।

## ওমর (রাযি.)-এর হিসাব

তারপর ওমরকে পেশ করা হবে। হাদীছে এসেছে, যখন ওমর (রাযি.) সামনের দিকে এগোবেন, তখন আল্লাহ বলবেন,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرُ!

হে ওমর! আপনাকে সালাম!

অন্য হাদীছে এসেছে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন ওমর (রাযি.)কে সর্বপ্রথম সালাম দিবেন। তিনি এতো পবিত্রতার সাথে যিন্দেগি অতিবাহিত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর আমল দেখে খুশি হয়ে যাবেন।

## ওসমান (রাযি.)-এর হিসাব

তারপর নবীজি ওসমান (রাযি.)কে আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করবেন। কিতাবে লেখা আছে, যখন ওসমান (রাযি.) আল্লাহর সামনে

দাঁড়াবেন, তখন আল্লাহ তা'আলা খুব দ্রুত তাঁর হিসাব নিয়ে ফেলবেন। কারণ, একবার এক ঈদের দিন যখন নবীজি ঈদের নামাযের জন্য গমন করছিলেন, তখন আয়েশা (রাযি.) বললেন, হে আল্লাহর নবী! ঘরে কিছু ব্যবস্থা করে যান, যাতে কিছু রান্না করতে পারি। মদীনার অসহায় নারী ও এতিম শিশুরা অনেক আশা নিয়ে আমাদের কাছে আসবে। তাদের যাতে কিছু দিতে পারি। তখন নবীজি বললেন, আমার কাছে তো এ মুহূর্তে কিছুই নেই।

একথা বলে নবীজি ঈদের নামাযে চলে গেলেন। ঈদের নামাযের পর নবীজি ঘরে এসে দেখলেন, ঘরে অনেক রান্না-বান্নার আয়োজন চলছে। মদীনার অসহায় নারী ও শিশুরা প্রত্যেকের অংশ নিয়ে যাচ্ছে। নবীজি জিজ্ঞাসা করলেন, কী অবস্থা! এগুলো কোথা থেকে এল? আয়েশা (রাযি.) বললেন, আপনি নামাযে যাওয়ার পর ওসমান এক একটা উট বোঝাই করে আপনার প্রত্যেক ঘরে খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুনে নবীজি এতো আনন্দিত হলেন যে, তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন,

يَا رَحْمٰنُ! سَهِّلِ الْحِسَابَ عَلَي عُثْمَانَ-

হে রহমান খোদা! আপনি ওসমানের হিসাবকে সহজ করে দিন।

আল্লাহ তা'আলা নবীজির এই দু'আ কবুল করেছেন। আর এজন্যই ওসমান (রাযি.)-এর হিসাব খুব দ্রুত হয়ে যাবে।

## আলী (রাযি.)-এর হিসাব

তারপর আলী (রাযি.)কে আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করা হবে। হাদীছে এসেছে–

أَسْرَعُ الْمُحَاسَبَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابُ عَلِيٍّ

'কেয়ামতের দিন সবচেয়ে সহজ ও দ্রুত হিসাব হবে আলীর।'

## পুলসিরাতের ভ্রমণ

যখন নবীজির চার বন্ধুর হিসাব নেওয়া হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলার গাম্ভীর্য সৌন্দর্যে পরিণত হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন,

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

'হে অপরাধীরা! তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও।'[১]

---

১. সূরা ইয়াসীন : আয়াত ৫৯

তারপর কাফির ও মুশরিকদের এক পাশে নিয়ে যাওয়া হবে এবং অন্য পাশে নেক বান্দাদের নিয়ে যাওয়া হবে। তারপর আল্লাহ নেক বান্দাদের নির্দেশ দিবেন পুলসিরাতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করতে। তখন কিছু নেক বান্দা বিজলির গতিতে পোলসেরাত পার হয়ে যাবে। কিছু বান্দা বাতাসের গতিতে পার হবে। কিছু বান্দা দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে পার হবে। কিছু বান্দা পলায়নরত লোকের গতিতে পার হবে। আবার কেউ সাধারণ গতিতে পার হবে। যারা-ই পোলসেরাত অতিক্রম করতে সক্ষম হবে, তাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দান করবেন। পুলসিরাতের উপর দিয়ে সবাইকেই অতিক্রম করতে হবে।

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا

'তোমাদের সবাইকে পোলসেরাত অতিক্রম করতে হবে।'[১]

## নবীজির জান্নাতে প্রবেশ

যখন আল্লাহ তা'আলার নেক বান্দাগণ পোলসেরাত অতিক্রম করে ফেলবেন, তখন নবীজি মনে করবেন, আমার সমস্ত উম্মত আমার সাথে পোলসেরাত অতিক্রম করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে। ওই সময় নবীজি সবাইকে নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এমনকি জান্নাতে প্রবেশ করার পর কয়েক যুগ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে।

## জাহান্নামে মুসলিমদের প্রতি কাফিরদের কটাক্ষ

বর্ণিত আছে, যারা পোলসেরাত অতিক্রম করতে গিয়ে জাহান্নামে পড়ে যাবে, তারা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। জাহান্নামের সর্বোচ্চ স্তরে ঈমানদার গোনাহগার বান্দারা থাকবে। এভাবে কিছু দিন যাওয়ার পর আল্লাহ স্বীয় হেকমতের মাধ্যমে গোনাহগার মুমিন ও কাফির-মুশরিকদের আগুনের মাঝে সিসার প্রাচীর নির্মাণ করে দিবেন। এদিকে কাফির ও মুশরিকরা যখন মুমিনদের আগুনে জ্বলতে দেখবে, তখন তারা খোঁচা দিবে। বলবে, আমরা আল্লাহকে অস্বীকার করেছিলাম; তাই আমাদের এই দশা হয়েছে। তোমরা তো আল্লাহকে মানতে। তোমাদের কী উপকার হলো? তোমরাও তো আমাদেরই মতো জ্বলছ!

---

১. সূরা মারয়াম : আয়াত ৭১

## জাহান্নামে মুসলিমদের সাথে জিবরীল (আ.)-এর সাক্ষাত

হাদীছে এসেছে, যখন কাফিররা গোনাহগার মুসলমানদের খোঁচা দিতে শুরু করবে, তখন আল্লাহ জিবরীলকে ডেকে বলবেন, হে জিবরীল! আজ আমার ওপর বিশ্বাসকারীদের খোঁচা দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বাসীদের সাথে ওই আচরণ করা হচ্ছে, যা অবিশ্বাসীদের সাথে করা হচ্ছে। হে জিবরীল! তুমি জাহান্নামের গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসো; দেখো, সেখানে কী হচ্ছে। জিবরীল আলাইহিস সালাম জাহান্নামে যাবেন। জাহান্নামের ফেরেশতা মালিক জাহান্নামের দরজা খুলে দিবেন। গোনাহগার মুসলমানরা তাঁকে দেখে মালিককে জিজ্ঞেস করবেন, তিনি কে? মালিক বলবেন, তিনি ওই ফেরেশতা, যিনি তোমাদের নবীর কাছে ওহী নিয়ে আসতেন।

## নবীজির প্রতি গোনাহগার মুসলিমদের পয়গাম

নবীর কথা বলার সাথে-সাথে গোনাহগার মুসলমানদের স্বীয় নবীর কথা স্মরণ হবে। তারা বলতে থাকবে, হায় মুহাম্মদ! হায় মুহাম্মদ! জাহান্নামীরা কাঁদতে-কাঁদতে জিবরীল আলাইহিস সালামকে বলবে, হে জিবরীল! আপনি তো নবীজির কাছে আল্লাহ তা'আলার পয়গাম নিয়ে যেতেন। আজ আপনি আমাদের মতো গোনাহগার লোকদের পয়গাম নবীজির কাছে নিয়ে যান। নবীজিকে বলুন, আপনি তো আমাদের কথা ভুলে গেছেন। আমরা জাহান্নামে জ্বলছি আর আপনি তো জান্নাতে অবস্থান করছেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম তাদের একথা বলে আশ্বস্ত করবেন যে, আমি অবশ্যই তোমাদের কথা নবীর কাছে পৌঁছিয়ে দেব।

## মহা সুপারিশ

জিবরীল আলাইহিস সালাম জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলবেন, তুমি আমার প্রিয় নবীর গোনাহগার উম্মতের কাছে যে ওয়াদা করেছ, তা পূর্ণ করা আবশ্যক। তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম জান্নাতের ভিতর সমস্ত নবীগণের মজলিসে মিম্বরে বসা থাকবেন। জিবরীলকে দেখে নবীজি জিজ্ঞাসা করবেন, আজ আপনি কেন এখানে? জিবরীল বলবেন, আজ আমি আপনার গোনাহগার উম্মতের পয়গাম নিয়ে আপনার সামনে উপস্থিত হয়েছি।

নবীজি যখন শুনবেন, তাঁর কিছু গোনাহগার উম্মত এখনও জাহান্নামে রয়ে গেছে, তখন তিনি হতবিহ্বল হয়ে বলবেন, আমার তো বিষয়টি মনেই ছিল না। তখনই নবীজি পুনরায় আল্লাহর সামনে সিজদায় পড়ে যাবেন আর

বলবেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার গোনাহগার উম্মতকে আপনি মাফ করে দিন। তখন আল্লাহ তাকে 'শাফা'আতে কুবরা'র অনুমতি প্রদান করবেন। আল্লাহ বলবেন, আপনি যার ব্যাপারে ইচ্ছা হয়, তার জন্য সুপারিশ করুন। আমি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেব।

এই সুসংবাদ শুনে নবীজি জাহান্নামের দিকে যাবেন। তখন জিবরীল ঘোষণা করবেন, হে জান্নাতীরা! নবীজি জাহান্নামে তাঁর গোনাহগার উম্মতের জন্য সুপারিশ করার জন্য যাচ্ছেন। তোমরাও সাথে চলো। এ সময় বিশাল এক কাফেলা নবীজির সাথে চলবেন। তারপর নবীজি তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। সবাইকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। এমনকি যদি কেউ পৃথিবীতে কোনো মুমিনকে এক পেয়ালা পানিও পান করিয়ে থাকে, এই আমলের বরকতে আল্লাহ তাকেও জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন।

## রহমানের আযাদপ্রাপ্ত বান্দা

সবার সুপারিশ শেষ করার পর আল্লাহ বলবেন, হে আমার প্রিয় নবী! আমি আপনার সাথে ওয়াদা করেছিলাম, আমি আপনার উম্মতের তিন মুঠো পরিমাণ জাহান্নাম থেকে বের করে আনব। তারপর আল্লাহ যথারীতি স্বীয় কুদরতি হাতদুটো দ্বারা তিন মুঠো পরিমাণ মানুষ জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। অর্থাৎ মানুষ যেমনিভাবে স্বীয় উভয় হাত দ্বারা আটার খামিরা বানায়, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর কুদরতি হাতের এই মুঠোয় এই উম্মতের অসংখ্য লোক হবে, যাদেরকে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। এই লোকদের শরীর আগুনে জ্বলে কয়লার মতো হয়ে যাবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে এদের নহরে হায়াতের পানিতে গোসল করানোর হুকুম হবে। গোসলের পর তাদের শরীর পূর্ণ সুস্থ ও সৌন্দর্যময় হয়ে যাবে। তাদের মাথায় 'উতাকাউর রহমান' লেখা থাকবে, যার অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত। তারপর তাদের জান্নাতে পাঠানো হবে। তখন নবীজির কোনো গোনাহগার উম্মত অবশিষ্ট থাকবে না। সবাইকে মাফ করে দেওয়া হবে।

## আযাদপ্রাপ্ত বান্দাদের ফরিয়াদ

হাদীছে এসেছে, এসব লোক জান্নাতে প্রবেশ করার পর আগের জান্নাতীগণ তাদের সাথে রসিকতা করবে। তারা বলবে, আল্লাহ আমাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে আগেই আমাদের মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু তোমাদেরকে বিশেষ বিবেচনায় মাফ করা হয়েছে। তোমাদের মাথায় 'উতাকাউর রহমান' (রহমানের আযাদপ্রাপ্ত বান্দা) লিখে দেওয়া হয়েছে। একথা শুনে 'উতাকাউর

রহমান' উপাধিপ্রাপ্ত জান্নাতীগণ আল্লাহর কাছে এই নামটি উঠিয়ে নেওয়ার জন্য ফরিয়াদ করবে। তারা বলবে, সবাই আমাদের চিনে ফেলবে। তখন আল্লাহ তাদের এই ফরিয়াদ কবুল করে বলবেন, আমি এই নাম এজন্য দিয়েছি, যাতে তোমরা আমার কাছে চাও আর আমি তোমাদের দান করি। তারপর তাদের মাথা থেকে এই নাম মুছে দেওয়া হবে।

## সুপারিশের জন্য দু'আ

হায়! আমরা যদি কেয়ামতের দিন এই উপাধিপ্রাপ্ত লোকদের অর্ন্তভুক্তও হতে পারতাম! আমাদের স্বীয় আমল তো এর উপযুক্ত নয়; কিন্তু নবীজির সুপারিশ যাতে আমরাও লাভ করতে পারি। অন্যান্য সমস্ত নবী ও সমস্ত জান্নাতীগণের সুপারিশও লাভ করতে পারি। হায়! যদি এখন কেউ আমাদের চিনে রাখতেন, আমরাও কাউকে চিনে রাখতাম, যাতে আমরা জাহান্নামের আগুনে জ্বললে সে আল্লাহর কাছে বলে, হে আল্লাহ! এই লোক আমার সাথে সম্পর্ক রাখত, আমাকে সম্মান করত। হায়! যদি এ রকম কেউ আমাদের হতো, যে আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে দিত।

হে দয়াময় রব! আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আপনি স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে কেয়ামতের দিন ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নিন। আমাদের আমল তো এর উপযুক্ত নয়, তবে আল্লাহর রহমত এবং রহমত স্বরূপপ্রেরিত নবীজির ওসীলায় যাতে আমরা নাজাত পাই। আমরা আশা রাখি, আল্লাহ আমাদেরকে এই রহমতের নবীর ওসীলায় তিরস্কারপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত না করেন। বরং আমাদেরকে স্বীয় রহমতপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

# নেসবতের আলো

'আল্লাহ্ কারো অন্তর দীনের জন্য খুলে দিলে তার অন্তর আলো দ্বারা পূর্ণ করে দেন। তখন তার জন্য শরীয়তের ওপর আমল করা সহজ হয়ে যায়। শরীয়তে অপছন্দনীয় কাজগুলো তার স্বভাবগত অপছন্দনীয় কাজে পরিণত হয়ে যায়। তার চিন্তাধারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী হয়ে যায়। মানুষ এর জন্য মেহনত করতে থাকলে তার অবস্থান এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তার মন আল্লাহর নাফরমানি করতে চায় না।'

# নেসবতের আলো

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

أَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ.

وَقَالَ فِيْ مَقَامٍ آخَرَ: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ.

وَقَالَ فِيْ مَقَامٍ آخَرَ: وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ.

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

## نور ও ظلم -এর অর্থ

نور আরবি ভাষার একটি শব্দ, যার অর্থ আলো। অপরদিকে ظلم অর্থ অন্ধকার। কেউ কালিমায়ে তায়্যেবা পড়লে তার অন্তরে আলো চলে আসে। এমনিভাবে কোনো মুমিন নেক আমল করলে তার বিনিময়ে অন্তরে আলো আসবে। এর বিপরীতে গোনাহ করলে অন্তরে দাগ পড়বে। আর যদি গোনাহ বারবার করতে থাকে, তাহলে দাগ লাগতে-লাগতে অন্তর কালো ও মলিন হয়ে যাবে। কুরআনে আলো বোঝাতে গিয়ে نور শব্দ এবং অন্ধকার বোঝাতে গিয়ে ظلم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

## আলোকিত ও আচ্ছন্ন অন্তর

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّوْرُ

'অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোক কখনও সমান হয় না। আর আলো ও অন্ধকারও সমান নয়।'[১]

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ১৯, ২০

এই আয়াত অনুযায়ী যেমন দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোক ও অন্ধ লোক কখনও সমান হতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে আলো ও অন্ধকার কখনও সমান হতে পারে না। সুতরাং আলোতে ভরপুর অন্তরওয়ালা লোক এবং কালো দাগে ভরা অন্তরওয়ালা লোক কখনও সমমর্যাদার অধিকারী হতে পারে না।

## শরীয়তের অপছন্দনীয় বিষয়কে মন থেকে অপছন্দ করা

আল্লাহ কারো অন্তর দীনের জন্য খুলে দিলে তার অন্তর আলো দ্বারা পূর্ণ করে দেন। তখন তার জন্য শরীয়তের ওপর আমল করা সহজ হয়ে যায়। শরীয়তে অপছন্দনীয় কাজগুলো তার স্বভাবগত অপছন্দনীয় কাজে পরিণত হয়ে যায়। তার চিন্তাধারা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী হয়ে যায়। মানুষ এর জন্য মেহনত করতে থাকলে তার অবস্থান এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, তার মন আল্লাহর নাফরমানি করতে চায় না।

## কবীরা গোনাহ থেকে মুক্ত ব্যক্তি

দারুল উলূম দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপন করার সময় শায়খ কাসেম নানুতবি (রহ.) ঘোষণা দিলেন, আজ আমি এমন এক ব্যক্তির হাত দ্বারা ভিত্তি স্থাপন করাব, যাঁর কবীরা গোনাহ করা তো দূরের কথা, কবীরা গোনাহ করার কথা মনেও আসেনি।

## হালাল রিযিকের নূর

মাওলানা আসগর হোসাইন কান্দলবীর মামা শাহ হোসাইন আহমাদ 'মনেশাহ' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। দেখতে তিনি খাট ছিলেন। কিন্তু আল্লাহর নিকট তাঁর মর্যাদা অনেক উঁচুতে ছিল। তিনি অতি সাদারণ উপায়ে উপার্জন করতেন। তিনি মাঠে ঘাস কেটে বাজারে নিয়ে বিক্রি করতেন। প্রতিদিন অল্প-অল্প করে পয়সা জমাতেন। বছর শেষে তাঁর একবার এতো পয়সা উদ্বৃত্ত রইল যে, তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের সমস্ত ওস্তাদকে দাওয়াত করলেন। দেওবন্দের ওস্তাদগণ বলতেন, আমরা সারা বছর তাঁর দাওয়াতের অপেক্ষায় থাকতাম। কেননা, আমরা যেদিন তার ঘরে খানা খেতাম, তারপর লাগাতার চল্লিশ দিন যাবত আমাদের নামাযে খুশুখুজু বৃদ্ধি পেত। সুবহানাল্লাহ! কত হালাল ও পবিত্র রিযিক ছিল!

## আলোকিত অন্তরের বরকত

মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) স্বীয় পত্রসমূহে লিখেছেন, এই উম্মতের মাঝে এমন এমন বুযুর্গ অতিবাহিত হয়েছেন, বিশ বছর যাবত গোনাহ লিখার

কাজে নিয়োজিত ফেরেশতাদের তাঁদের আমলনামায় গোনাহ লেখার সুযোগ হয়নি। এটি অন্তরের আলোরই বরকতে হয়েছে।

## নূর থেকে বঞ্চিত লোকদের দূরবস্থা

কেয়ামতের দিন এই নূরই মানুষের সামনে থাকবে। আল্লাহ বলেন–

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ

'সেদিন আপনি মুমিনদের দেখবেন, তারা তাদের সামনে ও আশেপাশে ছড়িয়ে পড়া নূর দেখে-দেখে পথ চলছে।'[১]

মুনাফিকরাও ওই দিন কাছাকাছি থাকবে। তারা ঈমানদারদের বলবে–

انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ

'আমাদের দিকে খেয়াল রাখো; আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু অংশ খুঁজছি।'[২]

যেমন– অন্ধকার রাস্তায় কেউ টর্চ লাইট নিয়ে চললে অন্যজন তাকে বলে, ভাই! লাইটটা একটু এদিকে মারেন, যাতে রাস্তা দেখে নিতে পারি। কিয়ামতে এই অবস্থা-ই ঘটবে। কিন্তু বলা হবে-

ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا

'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও; সেখানে নূর তালাশ করো।'[৩]

## নূর অর্জন করার মাপকাঠি

আমার বন্ধুগণ! এই পৃথিবী নূর অর্জন করার স্থান। এজন্য এখানে বেশি-বেশি নেক আমল করা উচিত। সত্য কথা বলা, সততার সাথে জীবন পরিচালনা করা, উত্তম গুণাবলি অর্জন করা এবং প্রতিটি কাজ শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী করা চাই। এভাবে প্রতিদিন অন্তরে আলো অর্জিত হবে। এর উদাহরণ হলো, এক ওয়াটের যেমন বাল্ব হয়, তেমনি পাঁচ-দশ ওয়াটেরও হয়। পাওয়ার যত বাড়ে, আলোও তত বৃদ্ধি পায়। যে কালিমা পড়ল, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু আলো পেল। এখন এই লোক যত বেশি নেক আমল করতে থাকবে, ততই তার ঈমানি শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

---

১. সূরা হাদীদ : আয়াত ১২
২. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৩
৩. সূরা হাদীদ : আয়াত ১৩

## আলোকিত চেহারার রহস্য

আল্লাহওয়ালাগণ স্বীয় ঈমানকে এতো শক্তিশালী করে নেন যে, তাঁদের অন্তর আলোকিত হয়ে যায়। এমনকি আল্লাহ তাঁদের চেহারাও আলোকময় করে দেন। তাঁদের চেহারা এমন হয়ে যায় যে, তাঁদের দিকে দৃষ্টি দিলে আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ হয়। কেউ যদি তাঁদের উজ্জ্বল চেহারার দিকে তাকায়, তাহলে তাঁদেরও আল্লাহর কথা স্মরণে এসে যায়। তাঁদের চেহারায় যেন উজ্জ্বল আলো ঝলমল করতে থাকে। তাদের অন্তরের আলো যেন তাঁদের চেহারায় ফুটে ওঠে। কোনো অপরিচিত লোকের কাছেও তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না।

## হযরত খাজা আব্দুল মালিকের গ্রহণযোগ্যতা

শায়খ বলতেন, খাজা আব্দুল মালিক যখন রেলগাড়িতে সফর করতেন, তখন কোনো কারণে কোন স্টেশনে গাড়ি এসে থেমেছে তা দেখার প্রয়োজন হলে বগির জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতেন। তখন স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়ানো অপরিচিত লোকও তার চেহারা দেখে বুঝে নিত, তিনি একজন বুযুর্গ লোক। কোনো সময় এমন হতো যে, মানুষ তাঁর কাছে এসে সালাম দিয়ে আরজ করত, আমাকে বায়'আত করে নিন। সুবহানাল্লাহ!

مرد حقانی کی پیشانی کا نور
کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور

## ইসলাম গ্রহণ করার বিস্ময়কর কারণ

একবার কিছু লোক আনোয়ার শাহ কাশ্মিরির হাতে মুসলমান হলো। অন্যান্য হিন্দুরা বলতে লাগল, তোমরা কী করলে? স্বীয় বাপ-দাদাদের ধর্ম ছেড়ে মুসলমান হয়ে গেলে! তখন তারা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরির চেহারার দিকে ইশারা করে বলল, এ লোকটির দিকে দেখো। এটি মিথ্যাবাদী লোকের চেহারা হতে পারে না।

## জঙ্গলে মঙ্গল

একবার শায়খ আমাকে বললেন, এখন আল্লাহ আমার অবস্থা এমন করে দিচ্ছেন যে, আমি জঙ্গলে গিয়ে বসলেও আল্লাহ ওখানেও মঙ্গল করে দিচ্ছেন।

তারপর তিনি পাঞ্জাবি ভাষায় বললেন,

ہن تے میڈی پٹھیاں وی سدھیاں تھی ویندیاں ہن

অর্থাৎ– এখন যদি উল্টা দিকে পা উঠাই, তাহলে আল্লাহ ওই উল্টাকেও সোজা করে দিবেন। একপর্যায়ে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, আল্লাহ যবান থেকে বের হওয়া কথাকেও বাস্তবে পরিণত করে দেন।

## হযরত মুরশিদের ইবাদাতের উচ্চতা

একবার শায়খ মসজিদে অবস্থানরত ছিলেন। কেন জানি আমি আরজ করলাম, আপনি ঘর থেকে অনেক আগে বের হয়েছেন। আপনি নতুন করে ওযু করলে ভালো হয়। হযরত হাসি দিয়ে ঘরে গেলেন। পরের দিন আবার এমন হলো। আমি বললাম, অনেকক্ষণ হয়েছে। আপনি খেয়ে নিন। তিনি হাসি দিয়ে ঘরে খাওয়ার জন্য গেলেন। তৃতীয় দিন পুনরায় এমন হলে হযরত বললেন, এমন একটা সময় আসে, যখন বান্দার কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আল্লাহ তাকে মাখলুকের সামনে প্রশ্ন করারও সুযোগ দেন না। বরং তিনি মাখলুকের অন্তরে তার প্রয়োজনের কথা ঢেলে দেন। তখন মাখলুক নিজেই বলে, আপনি এটা গ্রহণ করুন। তারপর বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে এমন অবস্থা করে দিয়েছেন যে, মাখলুকের সামনে আমার কোনো কিছু চাওয়া লাগে না। সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইতে-চাইতে তিনি মাখলুকের কাছে চাওয়ার সুযোই দেন না। তিনি আরো বললেন, যার মাথা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো প্রতি নত হয় না, তাকে অন্যের কাছে কেন হাত পাতার সুযোগ দেওয়া হবে?

## পাঁচ প্রকারের নূর

কেয়ামতের দিন নেক আমলের নূর মানুষের সাথে-সাথে থাকবে। হাদীছে এসেছে, এই নূর পাঁচ প্রকারের হবে। এভাবে বুঝুন যে, একটি কক্ষে আলো রয়েছে এবং এর বিভিন্ন স্থানে বাল্ব লাগানো রয়েছে। এমনিভাবে কেয়ামতের দিন মানুষের পাঁচ দিকে আলো থাকবে। আলেমগণ লিখেছেন, কালিমার নূর মানুষের সামনে থাকবে। এর উদাহরণ হলো, টিউব লাইটের আলো আছে, আবার বাল্বেরও আলো আছে। এর মধ্যে বাল্বের আলো বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। আলো তো সবারই আছে; কিন্তু সবগুলোর আলো এক রকম নয়। এমনিভাবে কেয়ামতের দিন একেক আমলের আলো একেক রকম হবে। আল্লাহু আকবারের নূর ডান দিকে হবে। কেননা, এই শব্দ দ্বারা আল্লাহর

বড়ত্ব বর্ণনা করা হয়। আর বড়ত্বের দাবি হলো, এই আলো মানুষের ডান দিকে হবে। কেননা, ডান দিকে ভালো জিনিস হয়। অপরদিকে সুবহানাল্লাহর আলো বাম দিকে হবে। কেননা, এই শব্দের অর্থ হলো পাক-পবিত্র। আর বাম দিকে দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্তি থাকার কথা দাবি করে। এজন্য আল্লাহ সুবহানাল্লাহর আলোকে মানুষের বাম দিকে করে দিয়েছেন। আলহামদু লিল্লার আলো কেয়ামতের দিন পিছনে হবে। ঈমানের আলো মানুষের মাথার দিকে হবে।

তাকে বলা হবে–

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ

'হে প্রশান্ত অন্তর! তুমি তোমার রবের দিকে প্রত্যাবর্তন করো।'[১]

ফেরেশতাগণ তাঁকে তাঁর আলোর সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

## নেসবতের নূরের মর্ম

যিকিরকারী বান্দার সত্তার মধ্যে আল্লাহ যিকিরের প্রভাব দিয়ে দেন। আপনি দেখবেন, নাজুক স্বভাবের কোনো লোক ধূমপায়ীর পাশ দিয়ে গেলেই বুঝতে পারবে, কেউ ধূমপান করছে। যদি এমনই হয়, তাহলে আল্লাহওয়ালা কারো সামনে দিয়ে গেলে এর প্রভাবও তেমনিভাবে হয়ে থাকে।

## এক মহিলার ইসলাম গ্রহণ

একবার আমি আমেরিকায় নামায পড়ে মসজিদ থেকে বের হই। মসজিদের সামনে রাস্তা ছিল। আমরা দুজন একপাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম। রাস্তা দিয়ে এক মহিলা দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। কিছু দূর গিয়ে সে গাড়ি ব্রেক করল। মহিলা গাড়ি ঘুরিয়ে দুই মিনিটের মধ্যে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল। আমরা মনে করেছি, মহিলা হয়ত ঠিকানা ভুলে আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছে।

আমি আমার সঙ্গীকে বললাম, আপনি তাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আমি তো আমার ঘরে যাচ্ছিলাম। আর প্রত্যেকের কাছে নিজ ঘরের ঠিকানা থাকে। তখন আপনি গাড়ি থামিয়ে কেন এদিকে এলেন? মহিলা আমাকে দেখিয়ে বলল, উনি কে? আমার সঙ্গী বলল, তিনি একজন মুসলমান। মহিলা তাকে বলল, তাকে বলো, আমাকে মুসলমান

---

১. সূরা ফাজ্‌র : আয়াত ২৭, ২৮

বানাবে কিনা? নাম-ঠিকানা কিছুই জানা নেই। আমার গায়ে শুধু নবীর সুন্নাত দেখেই তার অন্তরে পরিবর্তন এল। আল্লাহ তাকে এভাবেই প্রভাবিত করলেন যে, সে গাড়িতে বসেই কালিমা পড়ল। আমি তাকে আমার রুমালটা দিয়ে দিলে সে তা দিয়ে গা ঢেকে ঘরের দিকে রওনা হলো।

সুবহানাল্লাহ!

## ইসলামের মহত্ত্ব

আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে হেদায়েতের নূর এমনভাবে দিয়ে দেন যে, শুধু বাহ্যিক অবয়ব দেখেই কালিমা পড়ে মানুষ মুসলমান হয়ে যেত। এর মধ্যে বড়ত্ব বা মহত্ত্বের কিছুই নেই। বরং এটি সুন্নতের বরকত। আল্লাহ তা'আলার দীনের এতোই আকর্ষণ যে, কেউ কোনো মুসলিমের বাহ্যিক অবয়ব দেখলে সে নিজেই আকর্ষিত হয়ে এই দীনের প্রতি ঝুঁকে পড়ে।

## নেসবতের বরকতসমূহ

নেসবতের বরকত অনেক আশ্চর্যজনক। এর কিছু উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

## মসজিদের মর্যাদা

পৃথিবীর পুরো জমিন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু এই পুরো যমিনকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের অন্তর্ভুক্ত করার ইচ্ছা করেননি। কিন্তু যমিনের যে অংশে মসজিদ নির্মাণ করা হয়, সেটা আল্লাহর ঘরের অংশ হয়ে যায়। যমীনের এই অংশ আল্লাহর নামের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। আলেমগণ লিখেছেন, কেয়ামতের দিন পৃথিবীর সকল মসজিদকে আল্লাহর ঘরের অংশ করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। অথচ ওই যমীনই মসজিদ নির্মাণ করার আগে জুতা পরে মানুষ তার উপর দিয়ে হেঁটে যেত। পশু-পাখি ওই যমীনের উপর প্রশ্রাব পায়খানা-করত। কিন্তু আল্লাহর নামের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে এর মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এই যমীন আখেরাতে জান্নাতের অংশ হবে।

## এক বৃক্ষকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ওয়াদা

উস্তুয়ানায়ে হান্নানা নামে একটি গাছের খুঁটি ছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খুঁটিকে খুব মহব্বত করতেন। নবীজির সাথে যেহেতু এই গাছের সম্পর্ক ছিল, তাই এই খুঁটি জান্নাতে যাবে।

## কুকুর জান্নাতে প্রবেশ করবে

আসহাবে কাহাফ-এর সাথে একটি কুকুর ছিল। মুফাসসিরগণ লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন এই কুকুরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ভালো কাজের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে যদি কুকুরও জান্নাতে যেতে পারে, তাহলে মুমিন বান্দা আল্লাহওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে কেন জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না?

## উট জান্নাতে যাবে

হযরত সালেহ আলাইহিস সালামের উট সম্পর্কে মুফাসসিরগণ লিখেছেন, আল্লাহ তা'আলা একেও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। অথচ দুনিয়ার অন্য সব উট জান্নাতে যাবে না। কিন্তু সালেহ আলাইহিস সালামের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে এই উট জান্নাতে যাবে।

## সাকীনার বাক্সের বরকত

আল্লাহওয়ালারা যা ব্যবহার করেন, তার মধ্যেও নেসবতের বরকত রয়েছে। কুরআনে এর বর্ণনা এসেছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, দুজন ফেরেশতা একটা বড় বাক্স নিয়ে তালুত আলাইহিস সালামের দিকে এলেন। সূরা বাকারায় এই ঘটনার উল্লেখ আছে। ইরশাদ হয়েছে, সাকীনা ওই রহমত, বরকত ও নূরকে বলে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়, কুরআনের এক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ

'তারপর আল্লাহ তাঁর নিকট থেকে তাঁর রাসূলের উপর প্রশান্তি নাযিল করেন।'[১]

আল্লাহ তা'আলা এই বাক্সের ব্যাপারে সাকীনা শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং ইরশাদ করেছেন–

فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُ.

'যাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে চিত্তপ্রশান্তি এবং মূসা ও হারুন বংশীয়রা যা পরিত্যাগ করেছে, তার অবশিষ্টাংশ থাকবে; ফেরেশতারা তা বহন করে আনবে।'[২]

---

১. সূরা তাওবা : আয়াত ২৬
২. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৮

অতএব বোঝা গেল, উপরোক্ত মহামনীষিদের রেখে যাওয়া জিনিসের মধ্যে আল্লাহ সাকীনা রেখেছেন। চিন্তা করার বিষয় হলো, যে জিনিস আল্লাহওয়ালারা ব্যবহার করেন, সেসব জিনিসের মধ্যে যদি বরকত আসতে পারে, তাহলে তাঁদের অন্তরের নূর ও বরকত সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?

## ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর জুব্বার বরকত

কিতাবে লেখা আছে, ইমাম শাফেয়ী (রহ.) একবার স্বপ্নে দেখলেন, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) কুরআনের মাখলুক হওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া দিতে গিয়ে কিছু বিপদের সম্মুখীন হবেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কামিয়াব করে দিবেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ছাত্র ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এক ছাত্রকে পাঠালেন, তুমি আহমাদ ইবনে হাম্বলকে বিষয়টি জানিয়ে দাও। উক্ত ছাত্র ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)কে জানালেন, খলকে কুরআনের মাসআলার ব্যাপারে আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষায় সম্মুখীন হবেন এবং আল্লাহ তা'আলা এই পরীক্ষায় আপনাকে কামিয়াব করবেন।

বাহ্যিকভাবে এটা কষ্টকর ও দুঃখজনক সংবাদ ছিল। কিন্তু আল্লাহওয়ালাগণ এভাবে চিন্তা করেন যে, আমি এ পরীক্ষায় কামিয়াব হব কিনা? এ স্বপ্নের ভিতর ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)কে সুসংবাদ শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে। নবীজির সুন্নত হলো কেউ কাউকে সুসংবাদ শোনালে তাকে কিছু হাদিয়া দেওয়া। তখন ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর নিকট একটি জুব্বা ছিল। তিনি ওই ছাত্রকে জুব্বাটি দিয়ে দিলেন। যখন ওই ছাত্র ইমাম শাফেয়ীকে এখবর শোনাল, তখন ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ছাত্রের কাছে ওই জুব্বাটি চাইলেন। ছাত্র জুব্বাটি ইমাম শাফেয়ী (রহ.)কে দিলেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) উক্ত জুব্বা পানির নিচে চুবিয়ে রাখলেন এবং ওই পানি অসুস্থ ব্যক্তিদের খাওয়াতেন। আল্লাহর ইচ্ছায় অসুস্থ ব্যক্তি ভালো হয়ে যেত। আল্লাহ তা'আলা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর জুব্বার মধ্যে এতো বরকত দিয়েছিলেন যে, ইমাম শাফেয়ীর মতো ব্যক্তিত্ব তাঁর জুব্বা থেকে বরকত লাভের চেষ্টা করতেন।

## নবীজির স্পর্শের বরকত

একবার ফাতেমা (রাযি.) চুলায় রুটি বানাচ্ছিলেন। এ সময় নবীজি তাঁর ঘরে আগমন করলেন। নবীজি তাঁর এই কন্যাটিকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। নবীজি তাঁকে বললেন, ফাতেমা! আমিও একটি রুটি বানিয়ে দেই। তারপর

নবীজিও তাঁকে একটি রুটি বানিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, রুটিটি চুলায় দাও। ফাতেমা (রাযি.) রুটিটি চুলায় দিলেন। ফাতেমা (রাযি.) যখন রুটি বানানো শেষ করলেন, তখন তিনি নবীজিকে বললেন, আব্বাজান! সব রুটি পাকানো হয়েছে। কিন্তু একটি রুটি তো আপনি বানিয়েছিলেন; তা যেভাবে ছিল ওভাবেই রয়ে গেছে। আগুন ওই রুটিকে স্পর্শ করতে পারেনি। তখন নবীজি হেসে বললেন, যে রুটির মধ্যে আমার হাত লেগেছে, সেই রুটিকে আগুন স্পর্শ করতে পারবে না।

এক সাহাবী বলেন, আমি আনাস (রাযি.)-এর ঘরে গেলাম। আমার পেট ভরা ছিল। আনাস (রাযি.) স্বীয় দাসীকে ডেকে তোয়ালে আনতে বললেন। দাসী তোয়ালে আনলে আনাস (রাযি.) দেখলেন, এর মধ্যে ময়লা রয়েছে। আনাস (রাযি.) রাগত স্বরে দাসীকে তা পরিষ্কার করে নিয়ে আসতে বললেন। তিনি বলেন, দাসী দ্রুত গিয়ে তোয়ালেটি চুলায় নিক্ষেপ করল। কিছুক্ষণ পর তা চুলো থেকে বের করার পর দেখা গেল, তা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তারপর তা গরম-গরম আমার সামনে পরিবেশন করা হলো। আমার তো হাত পরিষ্কার ছিল। আমি আনাস (রাযি.)-এর দিকে তাকালে তিনি হেসে বলতে লাগলেন, একবার নবীজি আমার ঘরে তাশরীফ এনেছিলেন। আমি এটি নবীজিকে হাত পরিষ্কার করার জন্য দিয়েছিলাম। যেদিন নবীজি তা দিয়ে হাত পরিষ্কার করেছেন, সেদিন থেকে একে আগুন জ্বালাতে পারেনি। তাই এটি যখন ময়লা হয়ে যায়, তখন আমরা একে আগুনে নিক্ষেপ করি। আগুন ময়লা চুষে নিলে এটি পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন একে চুলা থেকে বের করে আনি।

## কাপড়ের সাথে নেসবতের বরকত

হযরত উমর ইবনে খাত্তার (রাযি.)-এর শাসনামলে একবার মদীনায় আগ্নেয়গিরি উদগীরণ হয়েছিল। তিনি তামীমদারী (রাযি.)কে তা নিভানোর জন্য পাঠালেন। তামীমদারী (রাযি.) স্বীয় রুমালকে চাবুকের মতো বানিয়ে আগুনের ওপর মারা শুরু করলেন। আগুন এমনভাবে পিছনে হটতে লাগল, যেমন চাবুকের মার খেয়ে কোনো প্রাণী পলায়ন করে। নবীজি তামীম (রাযি.)কে দু'আ দিয়েছিলেন। তাই তাঁর কাপড়ের মধ্যে এমন বরকত ও প্রভাব ছিল যে, কাপড়ের মার খেয়ে আগুন যেখান থেকে বের হয়েছিল, সেখানেই ঢুকে গেল।

## ঈমানের নেসবতের বরকত

হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাযি.)-এর খেলাফতের যামানায় মুসাইলামা কাযযাব নবুওতের মিথ্যা দাবি করেছিল। এই কাযযাব প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু মুসলিম খাওলানি (রহ.)কে কৌশলে গ্রেফতার করে তাঁকে নবী হিসেবে মেনে নিতে চাপ দেয়। কিন্তু আবু মুসলিম খাওলানি তা প্রত্যাখান করেন। তখন কাযযাব তাকে আগুনে নিক্ষেপ করার হুমকি দেয়। আবু মুসলিম খাওলানি বললেন, তোমার যা ইচ্ছা হয় করো। তারপর কাযযাব আগুন জ্বালিয়ে আবু মুসলিম খাওলানিকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করল। তিনি আল্লাহু আকবার ও বিসমিল্লাহ পড়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হন। আগুন তাকে একটুকুও জ্বালাতে সক্ষম হয়নি। মুসাইলামা কাযযাব যখন দেখতে পেল, আগুন আবু মুসলিমের কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, তখন সে চিন্তিত হয়ে গেল। সে বলতে লাগল, এই লোকের কারণে আবার আমার ওপর কোনো বিপদ যেন না আসে। তখন সে বলল, আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। একথা বলে সে আবু মুসলিম খাওয়ানিকে ছেড়ে দিল।

ঘটনাটি ইয়ামামাতে ঘটেছিল। তারপর এ খবর জানাজানি হতে-হতে আবুবকর ও ওমর (রাযি.) পর্যন্ত পৌঁছল। আবু মুসলিমের মনে হলো, তিনি নবীজির সাথে দেখা করবেন। মিথ্যা নবী তো আমাকে জ্বালিয়ে ফেলতে চেয়েছিল; কিন্তু পারে নাই। এখন কেন আমি সত্য নবীর দরবারে উপস্থিত হব না? তারপর তিনি ইয়ামামা থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় হাজির হলেন। মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে দু-রাকাত নামায আদায় করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমতাবস্থায় উমর (রাযি.) তাঁর কাছে এলেন। তিনি অপরিচিত লোক দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি আবু মুসলিম খাওলানি। উমর (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কোথা থেকে এসেছেন? তিনি বললেন, ইয়ামামা থেকে। উমর (রাযি.) তাঁকে ইয়ামামার এক ব্যক্তিকে আগুনে নিক্ষেপ করা এবং আগুন তাকে জ্বালাতে পারেনি এ ঘটনা জিজ্ঞাসা করলেন।

আবু মুসলিম বললেন, হাঁ, সেই ব্যক্তিই আমি। একথা শুনে উমর (রাযি.) অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি বললেন, চলুন, আমি আপনাকে রাসুলের খলীফার কাছে নিয়ে যাব। উমর (রাযি.) আবু মুসলিম খাওলানিকে আবুবকর (রাযি.)-এর কাছে নিয়ে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আজ আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাঝে এমন লোক দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে আমাদেরকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঈমানের বদৌলতে দুনিয়ার

আগুন থেকে হেফাযত করেছেন। ঠিক তদ্রূপ ঈমানদার লোক যখন কেয়ামতের দিন জাহান্নামের ওপর দিয়ে পোলসেরাত অতিক্রম করবে, তখন জাহান্নামের আগুন তাদের বলবে, হে মুমিন বান্দা! তাড়াতাড়ি পার হোন। আপনার ঈমানের নূর তো আমার তাপের তীব্রতাকে শীতল করে দিচ্ছে।

## ধারাবাহিক নেসবতের বরকত

একবার মুসা আলাইহিস সালাম ও খিজির আলাইহিস সালাম কোনো এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন, একটা ঘরের দেওয়াল কাত হয়ে আছে। ওই ঘরে দুজন শিশু ছিল। কুরআনে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যথা-

كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

'তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।'[১]

খিজিরকে বলা হলো, ওই দেওয়াল সোজা করে দিতে। কেন তাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল? তা এ কারণে যে, উক্ত দুটি শিশুর পিতা নেককার ছিল। তাদের পিতা নেককার হওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের সম্পত্তির হেফাযতের দায়িত্ব নিলেন। শুধু বাহ্যিক সম্পদ হেফাযত করা হয় না; বরং আল্লাওয়ালাদের প্রজন্ম পরম্পরায় আগত বংশধরের ঈমানের হেফাযত আল্লাহ করে থাকেন। তিনি ইরশাদ করেন–

كَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا

'এর নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন।'[২]

## মুফাসসিরগণের অভিমত

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ লিখেছেন, আল্লাহওয়ালাগণ পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার পর তাদের উত্তরসূরীরা যদি তাদের রেখে যাওয়া পথ ও আর্দশের উপর চলে, এর জন্য চেষ্টা করে, তাহলে পূর্বসূরীদের তুলনায় উত্তরসূরীদের ঈমান ও আমল কেয়ামতের দিন সবাইকে একসাথে মিলিয়ে দিবেন।

## ভালোবাসার বন্ধন

আলেমগণ কিতাবে বিস্তারিতভাবে লিখেছেন, যদি দুই বান্দার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মহব্বত হয় এবং এ দুজনের মধ্যে একজনের

---

১. সূরা কাহ্‌ফ : আয়াত ৮২

২. সূরা কাহ্‌ফ : আয়াত ৮২

তাকওয়া ও আল্লাহর নৈকট্য বেশি হয়, অপরদিকে দ্বিতীয়জনের এ ব্যাপারে দুর্বলতা থাকে, তবে এ ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকে, অন্তরে মহব্বতের সাথে-সাথে আমলের চেষ্টা করতে থাকে, তাহলে হাদীছের সুসংবাদ অনুযায়ী আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকওয়া ও আমলের বিষয়ে যে দুর্বল ছিল, তাকে অধিক তাকওয়াসম্পন্ন বন্ধুর মর্তবা দান করবেন এবং উভয়কে আল্লাহ মিলিয়ে দিবেন।

## নকশবন্দি সিলসিলার নেসবতের বরকত

এই হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী আমরা চিন্তা করে দেখি, নবীজির সাথে আবুবকরের মহব্বত থাকার কারণে আবুবকর (রাযি.) নবীজির সাথে কেয়ামতের দিন মিলিত হবেন। এভাবে আবুবকরকে যারা মহব্বত করেন, তারা কেয়ামতের দিন আবুবকর (রাযি.)-এর সাথে মিলিত হবেন। এ সুযোগে নবীজির কাছাকাছি হতে পারবেন। এভাবে পরম্পরায় যারা মহব্বত করবেন, তারা এই সূত্রে সর্বশেষ নবীজির সাথে কেয়ামতের দিন অবস্থান করবেন। অতএব বোঝা গেল, আমরা যারা আমাদের মাশায়েখগণের সাথে মহব্বত ও সম্পর্ক রাখি, কেয়ামতের দিন যখন তারা নবীজির সাথে মিলিত হবেন, তখন আমরা তাদের দেখানো পথ ও নির্দেশনা অনুসারে জীবন কাটানোর ওসীলায় আল্লাহ তাদের মাধ্যমে আমাদেরও নবীজির সাথে অবস্থান করার তাওফীক দিবেন।

## নেসবতের বরকতে দু'আ কবুল হয়

আল্লাহ নেসবতের বরকতে বান্দার দু'আ কবুল করেন। এর প্রমাণ হলো, আদম আলাইহিস সালাম স্বীয় ভুলের কারণে দুনিয়াতে নেমে আসার পর দুশত অথবা তিনশত বছর পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে অনেক কাকুতি-মিনতি করে চোখের পানি ফেলেছেন। তিনি এতো কেঁদেছেন যে, তাঁর চোখের পানি যদি একত্রিত করা হয়, তাহলে নদী হয়ে যাবে। অবশেষে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসীলা দিয়ে মাফ চেয়েছেন। তিনি নবীজির ওসীলা দিয়ে তাওবা করেছেন। আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আদম! তুমি জানলে কিভাবে যে, আমার একজন প্রিয় বান্দা রয়েছে? আদম আলাইহিস সালাম বললেন, আমি জান্নাতে থাকাবস্থায় আপনার আরশে কালিমা لا إله إلا الله লেখা দেখেছিলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম, যার নাম আপনার নামের সাথে লেখা আছে, তিনি অবশ্যই আপনার সর্বাধিক নৈকট্যপ্রাপ্ত হবেন। এজন্য আমি আপনার এই

নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দার কথা মনে করে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েছি। তখন আল্লাহ তাঁকে বললেন, তিনি হচ্ছেন শেষ নবী। তিনি তোমার সন্তানদের বংশধর। তিনি না হলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না।

## জান্নাতে আদম আলাইহিস সালামের উপনাম

হাদীছে আছে, কেয়ামতের দিন এই নেসবতের কারণেই আদম আলাইহিস সালামের আকাঙ্ক্ষা হবে, তাঁকে আদম নামে না ডেকে শেষ নবীর দিকে নেসবত করে ডাকা হোক। আলেমগণ লিখেছেন, এজন্য তাকে ওই দিন আবু মুহাম্মদ নামে ডাকা হবে। তার আকাঙ্ক্ষা হবে, আমার যে সন্তানের ওসীলায় আমার তাওবা কবুল হয়েছে, জান্নাতে আমাকে তাঁর নামে ডাকা হোক।

## বেশ্যা নারীর ওপর নেসবতের বরকত

আল্লাহ তা'আলা এই নেসবতের বরকতে বান্দার ঈমান-আমল হেফাযত করেন। তাকে বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করেন। জুনায়েদ বাগদাদির যমানায় এক অহংকারী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তার ধন-সম্পদের কোনো অভাব ছিল না। অনেক সুন্দরী যুবতী তার বাঁদী ছিল। যৌবনের আনন্দে আর মদ নিয়ে তার সময় কেটে যেত। একদিন কেউ তার সামনে জুনায়েদ বাগদাদির ঈমান ও বুযুর্গির কথা আলোচনা করল। তখন সে বলল, আচ্ছা, আমি জুনায়েদ বাগদাদিকে পরীক্ষা করব। তারপর সে তার সবচেয়ে সুন্দরী বাঁদীকে ডেকে নির্দেশ দিল, সাজ-গোজ করে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে জুনায়েদ বাগদাদির কাছে গিয়ে একটা মাসআলা জিজ্ঞেস করবে। তখন হঠাৎ তুমি তার সামনে তোমার মুখের নেকাব সরিয়ে ফেলবে। তারপর দেখবে, কী হয়। বাঁদী সেজে জুনায়েদ বাগদাদির কাছে গিয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা শুরু করল। একপর্যায়ে হঠাৎ সে তার নেকাব সরিয়ে মুচকি হাসি দিল। জুনায়েদ বাগদাদির দৃষ্টি হঠাৎ তার দিকে পড়ে গেলে তিনি আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করলেন। জুনায়েদ বাগদাদির এ শব্দ এতো প্রভাব ফেলল যে, বাঁদী ভয়ে লজ্জা পেল এবং সাথে-সাথে নেকাব ফেলে দিল। বাঁদী যখন ফিরে আসছিল, তখন তার আত্মার জগতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়ে গিয়েছিল। সে তার মালিকের কাছে গিয়ে বলল, আমি এখন আপনার সাথে আর থাকতে পারি না। আমি আল্লাহর নাম শুনেছি। এ কারণে আমার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত এতো এসেছে যে, এখন আমি তাঁর ইবাদতেই যিন্দেগি অতিবাহিত করতে চাই। তারপর ওই বাঁদী সারাদিন রোযা রাখত এবং রাতভর ইবাদাত করত।

ওই অহংকারী বিলাসী লোকটি স্বীয় বন্ধুদের বলতে লাগল, আমি জুনায়েদ বাগদাদিকে কী করেছিলাম যে, সে আমার সর্বাধিক সুন্দরী বাঁদীটাকে এমন ক্ষতি করে দিল যে, এখন আর সে আমার কোনো কাজেই আসছে না।

## হযরত শিবলি (রহ.)-এর নেসবতের বরকত

আল্লাহ তা'আলা নেসবতের কারণে বান্দাকে নিজের আপন করে নেন। শিবলি (রহ.) আল্লাহ তা'আলার মহব্বতে পাগল ছিলেন। কিতাবে লিখা আছে, একবার কেউ তাকে পাগল মনে করে পাথর মারল, যার কারণে তার শরীর থেকে রক্ত বের হলো। দূর থেকে এক লোক তাকে দেখল। সে যখন শিবলি (রহ.)-এর ক্ষত থেকে রক্ত বের হতে দেখল, তখন বলল, চলুন, পট্টি বেঁধে দেই। ওই লোকটি উক্ত বাচ্চাটিকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিল। লোকটি দেখতে পেল, শিবলি (রহ.)-এর শরীর থেকে যে রক্তের ফোঁটা মাটিতে পড়ছে, তা আল্লাহ শব্দের রূপ নিচ্ছে। এ অবস্থা দেখে সে হতবাক হয়ে গেল। সে চিন্তা করতে লাগল, এই বান্দার শিরা-উপশিরায় কত মহব্বত সঞ্চারিত হচ্ছে যে, রক্তের ফোঁটাও আল্লাহ শব্দে পরিণত হচ্ছে। তারপর লোকটি শিবলি (রহ.)-এর জখমে পট্টি বেঁধে দিল। শিবলির অন্তরে আল্লাহ তা'আলার এতো মহব্বত ছিল যে, যখনই কেউ তাঁর সামনে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করত, তখন তিনি তাকে মিষ্টি খাওয়াতেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞাস করল আপনি কেন এরকম করেন? তিনি বললেন, যে মুখ থেকে আমার প্রিয় সত্তার নাম বের হয়, তার মুখে মিষ্টি দেব না তো কী করব?

একবার শিবলি (রহ.) রাস্তা দিয়ে চলার সময় তার অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম এল, হে শিবলি! এমন অসম্পূর্ণ ওযু করে তুমি আমার ঘরের দিকে যাচ্ছ? তখন তিনি ভয়ে পিছু হটলেন। দ্বিতীয়বার ইলহাম হলো, হে শিবলি! তুমি আমার ঘর ছেড়ে কোথায় যাবে? এবার তিনি আবার ভয় পেলেন এবং জোরে-জোরে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে লাগলেন। যখন তিনি আল্লাহর নাম উচ্চারণ করছিলেন, তখন আবার এলহাম এল, হে শিবলি! তুমি আমাকে স্বীয় আগ্রহ ও উৎসাহ দেখাচ্ছ। শিবলি একথা শুনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার ইলহাম এল, হে শিবলি! তুমি আমাকে স্বীয় ধৈর্য দেখাচ্ছ। তখন শিবলি (রহ.) বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ফরিয়াদ করছি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের সাথে এভাবেই মহব্বতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান।

একবার শিবলি (রহ.)-এর উপর আশ্চর্যজনক অবস্থা বিরাজ করছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইলহাম করলেন, হে শিবলি! তুমি কি চাও যে, আমি

তোমার দোষগুলো মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেই, যাতে তুমি দুনিয়াতে কারো সামনে মুখ দেখাতে না পার? একথা শুনে শিবলি (রহ.) আল্লাহর দরবারে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আপনি কি চান, আমি আপনার রহমতের কথা মানুষকে খুলে বলি, যার ফলে দুনিয়াতে কেউ আপনাকে সিজদা না করে। তখন আল্লাহ তা'আলা শিবলিকে আবার ইলহাম দিলেন, হে শিবলি! না আমি তোমাকে আমার কথা বলব, না তুমি তোমার কথা বলবে। চিন্তা করে দেখুন, নেসবতের কারণে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার সাথে কিভাবে মহব্বত ও আন্তরিকতাপূর্ণ আলোচনা করেন।

## আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের কামনা

একবার হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর নিকট এক লোক এসে বলল, হযরত আমার জীবন যিকির আর ইবাদতে কেটে গেল। অথচ একটি আকাঙ্ক্ষার কারণে আমার অন্তর জ্বলে যাচ্ছে। আমার মনে চাইল, ওই আকাঙ্ক্ষার কথা আজ আপনার কাছে বলি। তিনি জিজ্ঞাসা করার পর লোকটি বলল, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) স্বপ্নে একশবার আল্লাহকে দেখেছেন। আমার মন চায়, আমি আল্লাহর দিদার লাভ করি।

হাজী সাহেবও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি বললেন, তুমি আজ ঈশার নামায না পড়ে ঘুমিয়ে যেয়ো। একথা বলার মাঝে একটি হেকমত ছিল। কিন্তু লোকটি বুঝল না। লোকটি ঘরে এসে মাগরিবের পরে চিন্তা করল, হাজী সাহেব তো আমাকে ঈশার নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়তে বলেছেন। কিন্তু ফরজের হুকুম তো আবশ্যকীয় ব্যাপার। সে চিন্তা করল, আমি ফরজ নামায পড়ে সুন্নত না পড়ে ঘুমিয়ে যাব। সুতরাং সে তা-ই করল। রাতে স্বপ্নে সে নবীজির জিয়ারত লাভ করল।

নবীজি তাকে বললেন, তুমি ফরজ পড়ে সুন্নত কেন ছেড়ে দিলে। তারপর তার চোখ খুলে গেল। সকালে হাজী সাহেবের নিকট এ ঘটনা খুলে বলল। হাজী সাহেব বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি এতোদিন যাবৎ নামায পড়ে কাটিয়েছ। আল্লাহ তোমার নামায কাজা হতে দিতেন না। বরং তিনি তোমার আমলের হেফাযত করতেন। যদি তুমি মাগরিবের পর ঘুমিয়ে যেতে, তাহলে স্বপ্নে আল্লাহর দিদার লাভ করতে। তিনি তোমাকে জাগিয়ে দিতেন। কিন্তু তুমি আমার কথার রহস্য বুঝতে পারনি। তুমি শুধু সুন্নত ছাড়ার কারণে নবীজির দিদার লাভ করেছ। যদি ফরজও ছেড়ে দিতে, তাহলে আল্লাহর দিদার লাভ করতে।

## হযরত পীর মেহের আলী শাহ্ এবং নেসবতের বরকত

হযরত পীর মেহের আলী শাহ্ সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। তিনি একবার হজে গেলেন। তখন তিনি খুব ক্লান্ত ছিলেন। তাই তিনি ঈশার নামাযের শুধুই ফরজ পড়ে ঘুমিয়ে গেলেন। স্বপ্নে তিনি নবীজির যিয়ারত লাভ করেন। নবীজি তাঁকে বললেন, মেহের আলী! তুমি ফরজ পড়ে সুন্নত ছেড়ে দিয়েছ। যখন তুমি সুন্নত ছেড়ে দিবে, তখন অন্যান্য লোকদের অবস্থা কেমন হবে? জাগ্রত হওয়ার পর তিনি অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। তারপর তিনি ঈশার নামায শেষ করে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ কবিতাটি লিখলেন।

## না'তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

اج سک متراندی ودھیری اے • کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے

لوں لوں وچ شوق چنگیری اے • اج نیناں لائیاں کیوں جھڑیاں

مکھ چند بدر لاثانی اے • متھے چمکے لاٹ نورانی اے

کالی زلف تے اکھ مستانی اے • مخمور اکھیں ہن مدہ بھریاں

اس صورت نوں میں جان آکھاں • جان آکھاں کہ جان آکھاں

سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں • جس شان تو شاناں سب بنیاں

ایہا صورت شالا پیش نظر • رہے وقت نزع تے روز حشر

وچ قبر تے پل تھیں جد ہو گزر • سب کھوٹیاں تھیسن تد کھریاں

انہاں سکدیاں تے کرلاندیاں تے • لکھ واری صدقے جاندیاں تے

اتے بردیاں مفت وکاندیاں تے • شالاوت پیاں آون ایہہ گھڑیاں

سبحان اللہ ما اجملک • ما احسنک ما اکملک

کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا • گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں

## আল্লাহর নামের বরকত

এখন একটি ইল্‌মি আলোচনা করি। আশা করি, ছাত্ররাও এতে আনন্দিত হবে। আরবি 'বা' অক্ষরটি দেখতে কেমন? যেন তা শুয়ে আছে। আর

আলিফ দেখতে দণ্ডায়মান দেখা যায়। অর্থাৎ তা দাঁড়িয়ে আছে। ইবতেদায়ীর ছাত্ররাও এভাবে পড়ে থাকে যে, আলিফ দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে আর বা শোওয়া অবস্থায় থাকে। লিখার সময় এভাবেই লিখতে হয়। একথা সবাই জানেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হলো, যখনই বা অক্ষরকে আল্লাহ নামের সাথে মিলিয়ে লিখবেন, তখন বা অক্ষর আর শোওয়া অবস্থায় থাকে না। বরং তা আল্লাহর নামের আলিফের সাথে মিলে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। বা অক্ষরের যদি আল্লাহর নামের সাথে মিলার কারণে এ অবস্থা হয়, তাহলে হে মুমিন! তুমিও যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোল, তাহলে আল্লাহ তোমাকে অবনত রাখবেন না। তোমার মর্তবা আল্লাহ উঁচু করে দিবেন। আল্লাহর নামের নেসবতের এ পরিমাণ বরকত হলে তার সত্তার সাথে নেসবতের বরকত কেমন হবে ভেবে দেখুন! আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার সাথে সম্পর্ক গড়ার তাওফীক দান করুন।

## একটি বিস্ময়কর সূক্ষ্ম বিষয়

মুফাসসিরগণ এক আশ্চর্যজনক কথা লিখেছেন। যদি কোনো মুমিন লোকের মাল হেফাযত করার পরও চুরি হয়, তাহলে সে উদ্ধার করতে গিয়ে নিহত হলে শহীদ হবে। আশ্চর্য, মাল-সম্পদের কারণে নিহত হওয়ার কারণে তাকে শাহাদাতের মর্তবা দান করা হয়েছে!

আমাদের বিবেক হয়রান হয়ে যায় যে, যে মালকে মূল্যহীন বলা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, মালের মহব্বতও অন্তরে রাখা যাবে না; আল্লাহর কাছে এই মাল-সম্পদের মূল্য মশার পাখার সমানও নয়, এই মাল রক্ষা করতে গিয়ে কোনো মুমিন নিহত হলে তাকে শহীদের মর্তবা দেওয়া হবে। এমনিভাবে ফকিহগণ লিখেছেন, যদি কেউ রান্না করার জন্য কোনো কিছু চুলায় দিয়ে নামাযে দাঁড়ায় এবং নামাযে দাঁড়িয়ে তার খাবার পুড়ে যাওয়ার জন্য আশঙ্কা হয় আর এই ভয় হয় যে, আমার খাওয়ার আর কোনো ব্যবস্থা থাকবে না, তাহলে এমতাবস্থায় সে নামায ছেড়ে দিবে। পরে নামায আবার পড়ে নিবে।

হয়রান হতে হয় যে, যে মালের কোনো মূল্য নেই, তা রক্ষা করার জন্য নামায ছেড়ে দিতে বলা হচ্ছে। ওই মাল রক্ষা করতে গিয়ে শহীদ হয়ে যাচ্ছে। ছাত্রদের মনে প্রশ্ন জাগে, এর কারণ কী? সে কোনো কাফিরের বিরুদ্ধে বা দীনের জন্য লড়ছে না। নিজের মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে। মুহাদ্দিছগণ এখানে একটি ব্যাখ্যা করেছেন।

হাদীছে আছে–

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهٖ فَهُوَ شَهِيْدٌ

এখানে মাল শব্দের সর্বনাম ফিরেছে মুমিনের দিকে। আর এখন তা শুধু মাল নয় বরং তা মুমিনের মাল। আর মুমিন ব্যক্তি মুমিনের মাল রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে শহীদ হবে। মুমিনের সাথে মালের নেসবত হওয়ার কারণে তার মূল্য বেড়ে গেছে। তাহলে মুমিনের দাম কত হতে পারে? সুবহানাল্লাহ!

## ইমাম রাযী (রহ.)-এর নিকট বিসমিল্লাহর বরকত

ইমাম রাযী (রহ.) লিখেছেন, নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর নৌকায় আরোহণ করার পর আল্লাহ বললেন, ঈমানদারদের নিয়ে উঠো আর পড়ো بسم الله مجرها। আল্লাহ এই দু'আ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, আল্লাহ নূহ আলাইহিস সালামকে বিসমিল্লাহ শব্দের মাধ্যমে তাঁর নাম দান করে তা উচ্চারণ করে নৌকা চালাতে এবং থামাতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর নূহ (আ.) সে অনুযায়ী নৌকা চালিয়েছেন আবার থামিয়েছেন। তো নূহ আলাইহিস সালামের উম্মত যদি আল্লাহর নামের বরকতে তুফান থেকে রক্ষা পেতে পারে, তাহলে অবশ্যই শেষ নবীর উম্মত আল্লাহর নামের বরকতে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাবে আশা করা যায়।

## আমাদের সার্বিক জগত

বন্ধুগণ! দুনিয়াদাদের সম্পর্ক তাদের মাল-সম্পদের সাথে হয়। আর আমাদের সম্পর্ক হয় একমাত্র আল্লাহ ও আল্লাহওয়ালাগণের সাথে।

عمل کی اپنے اساس کیا ہے
بجز ندامت کے پاس کیا ہے

আমলের নিজস্ব ভিত্তিইবা কি! লজ্জা ছাড়া এখন আর কী-ইবা অবশিষ্ট আছে!

رہے سلامت تمہاری نسبت
میرا تو بس آسرا یہی ہے

তোমার মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকুক আমার তো এতটুকুই প্রত্যাশা।

## মৃত্যুর সময় নেসবতের বরকত

কারী তায়্যেব (রহ.)-এর মাওয়ায়েযে লিখা আছে, এক নারী তার কাছে বাই'আত হলো। তারপর হযরতের সাথে তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু হযরতের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত নারী যথাসম্ভব আমল করত। বিশ বছর পর উক্ত নারী যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন সে হঠাৎ বলে উঠল, হযরত আসছেন। হযরত আমার কাছে আগমন করেছেন। তারপর সে নিজেই জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনি আমাকে কী পড়াচ্ছেন? আবার নিজেই বলল, হযরত! আপনি কি আমাকে কালিমা পড়াচ্ছেন? আচ্ছা আমি পড়ছি। তারপর সে কালিমা পড়ে মৃত্যুবরণ করল। চিন্তা করুন, বিশ বছর আগে বাই'আত হয়েছিল। এর মাঝে কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু মহব্বত ছিল। শুধু সম্পর্ক থাকার কারণে আল্লাহ মৃত্যুর সময় শায়খকে সামনে দৃশ্যমান করে দিলেন এবং এই নেসবতের বরকতেই উক্ত নারীর ঈমান আল্লাহ হেফাযত করে দিলেন।

## খাজা ফযল আলী কুরাইশীর ফরমান

খাজা ফযল আলী কুরাইশী বলেন, যার অন্তরে আল্লাহর আঙুলের ছোঁয়া লাগে, ওই দিল কখনও যিকির ছাড়া মরতে পারে না। অর্থাৎ– নেসবতের বরকতে শেষ ভালো হবে।

## ইমাম রাযী (রহ.)-এর ঈমানের হেফাযত

ইমাম রাযী (রহ.) অনেক বড় বুযুর্গ ছিলেন। তিনি শায়খ নাজমুদ্দিন কুবরার কাছে বায়'আত হয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ সম্পর্কে একশত দলিল জমা করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় শয়তান কাছে এসে তাঁকে ফাঁসাতে লাগল। শয়তান তাকে বলল, সারা জীবন আল্লাহর ইবাদাত করে তাঁকে কি চিনতে পেরেছ? তিনি বললেন, অবশ্যই আল্লাহ এক। শয়তান বলল, দলিল পেশ করো। তিনি একটি দলিল পেশ করলে শয়তান তা রদ করে দিল। এভাবে দুই, তিন হতে হতে ইমাম রাযী একশত দলিল পেশ করলেন। কিন্তু শয়তান সবগুলো দলিল রদ করে দিল। তখন ইমাম রাযী (রহ.) অনেক পেরেশান হয়ে গেলেন। ঠিক ওই সময় ইমাম রাযীর শায়খ নাজমুদ্দিন দূরে কোথাও ওযু করছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কাশফের মাধ্যমে ইমাম রাযীর খবর জানিয়ে দিলেন। তিনি রাগান্বিত হয়ে ওযুর লোটা দেওয়ালে ছুড়ে মারলেন এবং রাযীকে ডেকে বললেন, তুমি কেন বলছ না, দলিল ছাড়াই আল্লাহ এক? ইমাম রাযীর সামনে তার শায়খের ওই

মুহূর্তের ছবি ভেসে উঠল। নেসবতের বরকতে ইমাম রাযীর ঈমান রক্ষা পেল।

## অগ্নিপূজকের হাত কেন জ্বলল না?

এক বুযুর্গ কোথাও যাচ্ছিলেন। রাস্তায় এক অগ্নিপূজকের সাথে তার দেখা হলো। তারা দুজনে একসাথে চলতে লাগলেন। অবশেষে তারা কথা বলতে লাগলেন। বুযুর্গ তাকে বোঝালেন, আগুন তো খোদা হতে পারে না। বরং খোদা হলেন ওই সত্তা, যিনি আগুনকেও সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অগ্নিপূজক তা মানল না। তখন বুযুর্গ ব্যক্তির মেজায বিগড়ে গেল। তিনি বললেন, আচ্ছা, আমরা আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে হাত দেব। যার কথা সত্য হবে, আগুন তার কোনো ক্ষতি করবে না। অগ্নিপূজক এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। তারা একটি জঙ্গলে আগুন জ্বালাল। তখন আগুন দেখে অগ্নিপূজক ঘাবড়ে গেল। বুযুর্গ ব্যক্তি তার অবস্থা দেখে তার হাত ধরে স্বীয় হাতে নিয়ে আগুনে ঢুকিয়ে দিলেন। এদিকে বুযুর্গ ব্যক্তির বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ আমার বিশ্বাস রক্ষা করবেন। এর দ্বারা ইসলামের সত্যতা প্রমাণিত হবে। কিন্তু হাত কারোটাই পুড়ল না।

এই কাণ্ড দেখে বুযুর্গ ব্যক্তি খুবই পেরেশান হয়ে পড়লেন। কী হতে গিয়ে কী হয়ে গেল। তখন তিনি আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়ে আরজ করলেন, আমি তো সত্য দীনের ওপর ছিলাম। এজন্য আমাকে আপনি রক্ষা করলেন। কিন্তু অগ্নিপূজক তো নাহক ছিল। তার হাত জ্বলে যাওয়ার কথা ছিল। তিনি যখন একথা বললেন, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব এল, আপনি যখন তার হাত ধরেছিলেন, তখন আমি কিভাবে তার হাত জ্বালিয়ে দিতে পারি? আল্লাহ তার নেসবতের সম্মান এভাবেই রক্ষা করেন। অগ্নিপূজকের হাত বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তার হাতও আগুন থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

## পুরো কবরস্তানবাসীর ক্ষমা

মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরীর ইনতিকালের পর তাঁকে যেখানে দাফন করা হয়েছিল, সেখান থেকে খুশবু আসছিল যেমন ইমাম বুখারি (রহ.)-এর কবর থেকে খুশবু ছড়িয়েছিল। লোকেরা তা দেখে অবাক হয়ে গেল। এতে আশ্চর্য হওয়ার কীইবা থাকতে পারে? ফুল মাটিতে পড়ে গেলে মাটির মধ্যেও সুবাস আসে। এই বুযুর্গ ব্যক্তিরাও একেকটি ফুলের মতো।

بگفتا من گلے ناچیز بودم
ولیکن مدت باگل نشستم

'সে বলল, আমি মূল্যহীন ফুল বটে; তবে মূল্যবান ফুলের সান্নিধ্যে বহুদিন ছিলাম।'

جمال ہمنشیں در من اثر کرد
وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

'আমার মধ্যে সঙ্গীর সৌন্দর্যের প্রভাব পড়েছে। অন্যথায় আমার এমন কী যোগ্যতা আছে এই মর্যাদা পাওয়ার!'

অনেকদিন পর আহমাদ আলী (রহ.)-এর এক খলীফা তাঁকে স্বপ্নে দেখল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ আপনার সাথে কেমন আচরণ করলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, তুমি আমাকে কেন এতো বেশি ভয় পেতে? একথা শুনে আমি আরো বেশি ভয় পেলাম। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আজও তুমি আরো বেশি ভয় পেলে? আজ ভয় পাওয়ার দিন নয়; বরং আজ পুরস্কারের দিন। এজন্য আমি তোমাকে পুরস্কারস্বরূপ মাফ করে দিলাম। যে কবরস্তানে তোমাকে দাফন করা হয়েছে, সেখানকার সমস্ত মৃতদেরও মাফ করে দিলাম।

## দু'আর কারণে নিরাপত্তা

আল্লাহওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীগণ হাজারো মাইল দূরে থাকলেও আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'আ ও তাওয়াজ্জুহর কারণে তাদের ঈমান-আমল হেফাযত করেন। কোনো-কোনো লোক ফেতনার মধ্যে পড়ে গেলেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমনভাবে রক্ষা করেন, যেভাবে খামীরা থেকে চুল বের করে আনা হয়। কোথাও ফেঁসে যাওয়ার উপক্রম হলেই আল্লাহ তা'আলাই তাকে হেফাযত করেন।

دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے
میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے

'দূরে বসে কেউ তো আশীর্বাদ করছে। আমি যাই ডুবে আর সমুদ্র উল্লাস করছে!'

## দেখার পার্থক্য

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ

'আমি আমার বান্দার ধারণা অনুযায়ী আচরণ করে থাকি।'

আল্লাহ বান্দার সাথে তার ধারণা অনুযায়ী আচরণ করে থাকেন। এমনিভাবে যে তার শায়খের ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখবে, সে তার শায়খ দ্বারা সেরকমই ফায়দা অর্জন করবে। এটি তার হেদায়াত লাভের উপায় হবে। আর যদি সে তার শায়খকে সাধারণ কোনো লোকের মতো মনে করে, তো শায়খও তাকে সাধারণ মনে করবেন। দেখুন شِير এবং شَير উভয়টি একই শব্দ। কিন্তু উচ্চারণ ভিন্ন হওয়ার কারণে অর্থ দুটি হয়েছে। একটি দ্বারা জঙ্গলের বাদশাহ বাঘকে বোঝানো হয়ে থাকে আর অপরটি দ্বারা দুধ বোঝানো হয়ে থাকে। তদ্রূপ مُلك مَلَك مِلك مَلِك এ চারটি দেখা ও লেখার মধ্যে একই রকম দেখা যায়। কিন্তু উচ্চারণ ভিন্ন হওয়ার কারণে চারটি দ্বারা চারটি অর্থ বোঝানো হয়ে থাকে। নবীজির চেহারা তো আলোকময় ছিল। আবুবকরের দৃষ্টি যখন নবীজির ওপর নিবদ্ধ হলো, তাঁকে -محمد رسول الله (আল্লাহর রাসূল) মনে করেই তাকিয়েছিলেন। এ কারণেই তিনি সিদ্দীকের মর্তবায় ভূষিত হয়েছেন। অপরদিকে আবুলাহাব ও আবুজাহ্‌ল নবীজিকে محمد ابن عبد الله (আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ) হিসেবে দেখার কারণে জাহান্নামের খাদ্যে পরিণত হয়েছে।

মোটকথা, যে যেভাবে দেখবে, বিশ্বাস করবে, সেই অনুযায়ীই তার সাথে আচরণ করা হবে।

## ধারণা অনুযায়ী আচরণ

মুজাদ্দিদে আলফেছানী বলেন, আমরা তিন পীর ভাই ছিলাম। আমাদের সবার শায়খ ছিলেন খাজা বাকি বিল্লাহ। আমাদের প্রত্যেকের তাঁর সম্পর্কে ধারণা পৃথক-পৃথক ছিল। একজন মনে করত, আমাদের শায়খ কামিল বুযুর্গ; কিন্তু তিনি সাহিবে ইরশাদ নন। দ্বিতীয়জন মনে করত, আমার শায়খ নিজে কামিল বটে; কিন্তু অন্যকে কামিল বানাতে পারেন না। কারণ, তিনি কথা খুব কম বলতেন। কেউ তাকে বলল, হযরত আপনি কথা বলুন; তাহলে লোকদের ফায়দা হবে। তিনি জবাব দিলেন, যারা আমার নীরবতা থেকে কোনো কিছু শিখতে পারে না, তারা আমার বলা থেকে কী শিখবে?

کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت
جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے

'সমুদ্রের নীরবতা নদীর গর্জনকে বলছে, যার পাত্র যতখানি, তার নীরবতাও ততখানি।'

আল্লাহ কোনো বুযুর্গের অবস্থা এমন করে দেন যে, তারা مَنْ عَرَفَ رَبَّهٗ كَلَّ لِسَانُهٗ -এর নমুনা হয়ে যান। হাদীছে আছে,

مَنْ عَرَفَ رَبَّهٗ قَلَّ لِسَانُهٗ

আল্লাহ তা'আলার প্রতি তাদের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাতের আশায় তারা পাগল হয়ে থাকেন। তারপর মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বলেন, তৃতীয়জন ছিলাম আমি। আমি ধারণা করতাম, আমার শায়খ এতো বড় কামিল বুযুর্গ যে, এর আগে উম্মতের জন্য এর চেয়ে বড় বুযুর্গ যদি কেউ হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি হচ্ছেন আবুবকরের জন্য স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই ধারণার কারণেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে মুজাদ্দিদে আলফেছানী বানিয়েছেন।

## একটি ঘটনা

একবার তিন ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। তাদের পরস্পর পরিচয় হলো। সবাই একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কে কোথায় যাচ্ছ? একজন বলল, আমি শায়খ আব্দুল কাদের জিলানির কাছে যাচ্ছি। আমি পরীক্ষা করতে যাচ্ছি, তিনি ওলী, না অন্য কিছু। দ্বিতীয়জন বলল, আমিও আব্দুল কাদের জিলানির কাছে যাচ্ছি। আমি অনেক বড় মসিবতে পড়ে গেছি। তাঁর কাছে দু'আ করাতে যাচ্ছি, যাতে আমি উদ্ধার পাই। তৃতীয়জন বলল, আমি শুনেছি, তিনি একজন কামিল ওলী। আমি তার পায়ের কাছে কয়েকদিন কাটাতে চাই।

তারা সবাই আব্দুল কাদের জিলানির কাছে পৌঁছে সালাম দিয়ে বসে পড়ল। হযরত প্রথমজনের অবস্থা জেনে তাকে ফেরত পাঠালেন। ওই লোক পরবর্তী কালে মুরতাদ হয়ে যায় এবং কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করে। কেননা, তার অন্তরে আল্লাহর ওলীদের বিদ্বেষ ছিল। তাদের নামে খারাপ কথা বলে বেড়াত। অপরদিকে তিনি দ্বিতীয়জনের জন্য দু'আ করলেন; ফলে আল্লাহ তা'আলা তার বিপদ দূর করে দিলেন। আর তৃতীয়জন হযরতের কাছে থেকে গেল এবং পরবর্তী কালে তার খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত হন।

## সুরাকার হাতে কিসরার বালা

যদি কেউ নেক নিয়তে আল্লাহর জন্য দুনিয়াতে কোনো কুরবানি দেয়, আল্লাহ তাকে দুনিয়াতেও বদলা দেন, আখেরাতেও বদলা দেন। নবীজি হিজরতের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পর এক কাফের তাঁর পিছু লাগল। তার নাম ছিল সুরাকা। সে নবীজিকে দেখার পর তার পা যমীনে ধসে গেল। নবীজি দু'আ করলে যমীন তার পা ছেড়ে দেয়। তখন সে নবীজিকে বলল, আমাকে কালিমা পড়িয়ে দিন। নবীজি তাকে কালিমা পড়ালেন। এর আগে নবীজি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন, হে সুরাকা! আমি দেখতে পাচ্ছি, আল্লাহ তা'আলা তোমার হাতে অথবা বাহুর মধ্যে কিসরার বালা পড়াবেন। নবীজির পিছু লাগার কারণে কাফিরদের ঘোষণা অনুযায়ী তার একশ অথবা দুশটি উট পুরস্কার পাওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু সে আল্লাহর কারণে এই লোভকে কুরবানি করে দিল। যথারীতি আল্লাহ তার এই কুরবানির মূল্যায়ন করলেন এবং দুশত উটের পরিবর্তে কিসরার মতো বাদশাহার বালা তার হাতে এনেছিলেন। আপনারা দেখুন, আমার আপনার জন্য স্বর্ণ পরিধান করা হারাম। কিন্তু সুরাকার জন্য তা হালাল হয়ে গেল।

## যুবকদের বালা

কিছু যুবক বালার নাম শুনলে হয়রান হয়ে যায় এবং বলে, জান্নাতে পুরুষরা বালা পরিধান করবে। অথচ তাদের অবস্থা হলো, তারা রাডো কোম্পানির ঘড়ি পরিধান করে হাত নাড়ায় এবং লোকদের দেখায়, আমরা রাডো কোম্পানির ঘড়ি পরিধান করেছি। হে আল্লাহর বান্দা! এটা তো দুনিয়ার সামান্য একটা ঘড়ি। এটা হাতে লাগিয়ে লোকদের দেখিয়ে বেড়াচ্ছ। যদি আল্লাহ জান্নাতে পুরুষদের স্বর্ণের ঘড়ি ও বালা দান করেন, তখন এগুলোর মধ্যে কোনটি বেশি আনন্দদায়ক হবে?

## দুজন নবীর সাথে আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর আচরণ

আপনাদের সামনে একটি ইল্‌মি কথা পেশ করছি, যা ওলামা ও ছাত্রদের ভালো লাগবে। আল্লাহ তা'আলার দুজন নবী, যাদের কথা কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। তারা মৃত ব্যক্তি জিন্দা হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু তাদের প্রশ্নের ধরন ভিন্ন ছিল। তাদের একজন হলেন ওযায়ের আলাইহিস সালাম। তিনি আল্লাহ তা'আলাকে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন–

أَنَّىٰ يُحْيِۦ هَٰذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا

'মৃত্যুর পর আল্লাহ কিভাবে তাকে জীবিত করবেন?'[১]

এর জবাবে আল্লাহ তাঁকেই মৃত্যু দিয়ে দিলেন এবং এই অবস্থায় ১০০ বছর রাখলেন। তারপর আল্লাহ তাঁকে পুনরায় জিন্দা করলেন। দ্বিতীয় নবী হলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। তিনি আল্লাহ তা'আলার কাছে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন–

كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ؟

'আপনিকীভাবে মৃতকে জীবিত করেন?'[২]

আগের নবী أَنَّىٰ শব্দ দিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালাম كيف শব্দ দ্বারা প্রশ্ন করেছিলেন। আর كيف দিয়ে প্রশ্ন বোঝানো হয়। যেহেতু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম كيف দিয়ে প্রশ্ন করেছেন। أَنَّىٰ শব্দ দ্বারা প্রশ্নের সাথে-সাথে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। আর كيف শব্দ দ্বারা শুধু প্রশ্ন করা হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের জবাবে অন্য এক প্রাণীকে মৃত্যু দিয়ে পুনরায় জিন্দা করে দেখিয়ে দিলেন। অপরদিকে ওযায়ের আলাইহিস সালাম প্রশ্ন করার সাথে-সাথে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। তাই আল্লাহ অন্য কোনো প্রাণীকে মৃত্যু না দিয়ে সরাসরি তাকেই মৃত্যু দিলেন এবং ১০০ বছর পর্যন্ত ঘুম পাড়িয়ে রাখলেন। তারপর পুনরায় তাঁকে জিন্দা করে তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন।

উপরোক্ত কথা দ্বারা বোঝা গেল, শব্দের পরিবর্তনের ফলে দুজনের সাথে দূরকম ঘটনা ঘটল। এর দ্বারা বোঝা গেল, যে আল্লাহ তা'আলার প্রতি যেমন ধারণা করবে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সেই অনুযায়ী আচরণ করবেন। কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেহেতু প্রশ্ন করে ফেলেছেন, তাই তার প্রশ্নের উত্তর তো দিতে হয়। কেননা, অন্যান্য সমস্ত নবীর মধ্যে থেকে আল্লাহ ওই কুরবানি নেননি, যা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়েছেন। যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বলেছেন, যেহেতু আমি আপনার প্রশ্নের সম্মান রেখেছি, এখন আপনি স্বীয় ছেলেকে হাত দ্বারা শহীদ করে দেখান।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৫৯

২. সূরা বাকারা : আয়াত ২৬০

## আরেকটি আকর্ষণীয় সূক্ষ্ম কথা

মানুষ দুনিয়াতে যখন তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হয়, তখন চোখে ঘুমের আচ্ছন্নতা থাকে। এজন্য মানুষ বলে, আমার চোখে ঘুম লেগে আছে। এজন্য আল্লাহ স্বীয় রাত জাগরণকারী বান্দাদের ছাওয়াব ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

'কেউ জানে না, তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কীসব লুকায়িত রাখা হয়েছে।'[১]

আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এখানে অন্য শব্দ উল্লেখ করতে পারতেন। যথা– তাদের শান্তির জন্য আমি অনেক কিছু তৈরি করে রেখেছি অথবা এভাবে বলতে পারতেন– তাদের আনন্দের জন্যে আমি কী বানিয়ে রেখেছি? কিন্তু তিনি সেগুলোর কথা বলেননি। হে আল্লাহ! আপনি কতই-না বদলা পুরস্কার দানকারী যে, যার চোখ ঘুমকে ত্যাগ করে, তাদের জন্য আপনি এ সমস্ত নেয়ামত বানিয়ে রেখেছেন। এগুলো দেখে ওই বান্দাদের চোখ শীতল হয়ে যাবে।

## আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় পুরস্কার

আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দার উপর রাজি হয়ে গেলে তাকে স্বীয় নৈকট্য দান করেন। এ বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বাধিক দামী নেয়ামত। এর প্রমাণ কুরআনে রয়েছে। যথা– ফেরাউন যখন সমস্ত জাদুকরকে ডেকে মুসা আলাইহিস সালামের মোকাবেলা করার নির্দেশ দিলেন, তখন তারা ফেরাউনকে জিজ্ঞাসা করল, জনাব! আমরা মোকাবেলা করবই। আর এটি হচ্ছে শাহী মোকাবেলা। ছোটখাট কোনো বিষয় নয়। সুতরাং আপনি আগে বলুন, আমরা জাদু করতে গিয়ে সফল হলে এর বিনিময় কী দিবেন? তখন ফেরাউন বলল,

إِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

'তখন তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবে।'[২]

অতএব বোঝা গেল, ঘনিষ্ঠ হওয়া অনেক বড় পুরস্কার।

---

১. সূরা সাজদা : আয়াত ১৭

২. সূরা শুআরা : আয়াত ৪২

## আরেকটি আকর্ষণীয় সূক্ষ্ম কথা

মানুষ দুনিয়াতে যখন তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হয়, তখন চোখে ঘুমের আচ্ছন্নতা থাকে। এজন্য মানুষ বলে, আমার চোখে ঘুম লেগে আছে। এজন্য আল্লাহ স্বীয় রাত জাগরণকারী বান্দাদের ছাওয়াব ও পুরস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

'কেউ জানে না, তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কীসব লুকায়িত রাখা হয়েছে।'[১]

আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এখানে অন্য শব্দ উল্লেখ করতে পারতেন। যথা– তাদের শাস্তির জন্য আমি অনেক কিছু তৈরি করে রেখেছি অথবা এভাবে বলতে পারতেন– তাদের আনন্দের জন্যে আমি কী বানিয়ে রেখেছি? কিন্তু তিনি সেগুলোর কথা বলেননি। হে আল্লাহ! আপনি কতই-না বদলা পুরস্কার দানকারী যে, যার চোখ ঘুমকে ত্যাগ করে, তাদের জন্য আপনি এ সমস্ত নেয়ামত বানিয়ে রেখেছেন। এগুলো দেখে ওই বান্দাদের চোখ শীতল হয়ে যাবে।

## আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে বড় পুরস্কার

আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দার উপর রাজি হয়ে গেলে তাকে স্বীয় নৈকট্য দান করেন। এ বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বাধিক দামী নেয়ামত। এর প্রমাণ কুরআনে রয়েছে। যথা– ফেরাউন যখন সমস্ত জাদুকরকে ডেকে মুসা আলাইহিস সালামের মোকাবেলা করার নির্দেশ দিলেন, তখন তারা ফেরাউনকে জিজ্ঞাসা করল, জনাব! আমরা মোকাবেলা করবই। আর এটি হচ্ছে শাহী মোকাবেলা। ছোটখাট কোনো বিষয় নয়। সুতরাং আপনি আগে বলুন, আমরা জাদু করতে গিয়ে সফল হলে এর বিনিময় কী দিবেন? তখন ফেরাউন বলল,

إِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

'তখন তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবে।'[২]

অতএব বোঝা গেল, ঘনিষ্ঠ হওয়া অনেক বড় পুরস্কার।

---

১. সূরা সাজদা : আয়াত ১৭

২. সূরা শুআরা : আয়াত ৪২

## বুদ্ধিমতী স্ত্রী

সুবক্তগিন নামক এক বাদশাহ তাঁর এক স্ত্রীকে খুব বেশি ভালোবাসতেন। একবার তার অন্যান্য স্ত্রীগণ তাকে বলল, আপনি আপনার অমুক স্ত্রীকে বেশি ভালোবাসেন; অথচ সৌর্ন্দেযের বেলায় আমরা তার থেকে কম নই। কোনো কিছু বোঝার ক্ষেত্রে আমরা তার তুলনায় এগিয়ে। তার মধ্যে এমন কী আছে যে, আপনি তাকে বেশি ভালোবাসেন? আমরা তো তার মধ্যে এমন কিছু পাই না। অথচ আপনার দৃষ্টি শুধু তার প্রতি নিবদ্ধ থাকে; এর কারণ কী? বাদশা বললেন, আমি সময়মতো এর উত্তর দেব। তারপর তাঁর স্ত্রীগণ একথা ভুলে যায়। একদিন বাদশা স্বীয় ঘরের বারান্দায় বসে বললেন, আজ আমার মন অনেক ভালো। তাই আমি চাচ্ছি, তোমাদের প্রত্যেককে নামী-দামী পুরস্কার দেব। বাদশার স্ত্রীগণ একথা শুনে খুশি হয়ে গেল। তারা বলতে লাগল, আজ আমরা শাহী খাজানা থেকে পুরস্কার পাব। বাদশাহর রাজপ্রসাদের আঙিনায় স্বর্ণ, রুপা ও মণি-মুক্তা স্তূপ করে রাখা হলো।

বাদশাহ সবাইকে ডেকে ঘোষণা করলেন, যার হাত এখানে রাখা বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যেখানে লাগবে, তাকে সেটা দেওয়া হবে। সুতরাং যখন আমি ইশারা করব, তখন তোমরা তোমাদের পছন্দ অনুযায়ী হাত রাখবে। স্ত্রীগণ তৈরি হয়ে গেল। তারা সবাই যার-যার পছন্দের উপর দৃষ্টি ঘোরাতে লাগল। বাদশাহ ইশারা করার সাথে-সাথে সবাই যার-যার পছন্দের বস্তুর উপর হাত রাখল। কিন্তু বাদশাহ যে-স্ত্রীকে বেশি ভালোবাসতেন, সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। সে কোনো বস্তুর উপর হাত রাখল না। অন্যান্য স্ত্রীগণ তার এ অবস্থা দেখে হাসতে লাগল। তারা বাদশাহকে বলল, আমরা তো বলেছিলাম, সে নির্বোধ। তার বুদ্ধি নেই। এই বিষয়টি আজ প্রমাণিত হলো।

বাদশাহ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন কোনো কিছু নিলে না? সে বলল, আপনি বলেছিলেন, যে যে-বস্তুর উপর হাত রাখবে, সে তার মালিক হয়ে যাবে। বাদশাহ বললেন, হাঁ; আমি তো এটাই বলেছিলাম। তখন স্ত্রী সামনে এগিয়ে এল এবং বাদশাহর কাঁধে হাত রাখল এবং বলল, হে বাদশাহ! যখন আপনি আমার হয়ে গেলেন, তখন সমস্ত খাজানা আমার হয়ে গেল।

বাদশাহ একথা শুনে খুশি হয়ে গেলেন। অন্যান্য স্ত্রীগণকে বললেন, আমি এজন্যই একে বেশি মহব্বত করি।

যদি একজন বান্দি একথা বুঝতে পারে যে, বাদশাহর কাঁধে হাত রাখলে সবকিছু তার হয়ে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও জানেন, যদি তিনি

আমাদের হয়ে যান, তাহলে সবকিছু আমাদের হয়ে যাবে। এ কারণেই তিনি বলেছেন-

مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهٗ

'যে আল্লাহর হয়ে যায় আল্লাহ তার হয়ে যান।'

সুতরাং আমাদের উচিত, আমরা নিজেদের আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করে দেব। তাহলে ইনশাআল্লাহ, তিনি আমাদের হয়ে যাবেন। যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের হয়ে যাবেন, তখন আমরা আমাদের জীবনে চালিকাশক্তি ফিরে পাব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়ার তাওফীক দান করুন। এর প্রতি যত্নবান হওয়ার তাওফীক দান করুন এবং এর বরকতে দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদের কামিয়াব করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

# মনীষীদের বিস্ময়কর কিছু ঘটনা

'জুনায়েদ বাগদাদিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ফেতনা-ফ্যাসাদের সময়ে ঈমান রক্ষা করার উপায় কী? তিনি বললেন, আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনী এবং তাদের ঘটনাবলি অধ্যয়ন করা। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার বাহিনীর সদস্য। প্রতি যুগেই যেকোনো স্থানেই তাঁদের জীবনী অধ্যয়ন করার দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।'

# মনীষীদের বিস্ময়কর কিছু ঘটনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ.

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

## আল্লাহ তা'আলার বাহিনী

জুনায়েদ বাগদাদিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ফেতনা-ফ্যাসাদের সময়ে ঈমান রক্ষা করার উপায় কী? তিনি বললেন, আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনী ও তাদের ঘটনাবলি অধ্যয়ন করা। তাঁরা আল্লাহ তা'আলার বাহিনীর সদস্য। প্রতি যুগেই যেকোনো স্থানেই তাঁদের জীবনী অধ্যয়ন করার দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যখন পৃথিবীতে আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ কেউ থাকবে না, তখন আমাদের কী করা উচিত, যাতে আমরা অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারি? তিনি বলেছিলেন, প্রতিদিন আল্লাহ তা'আলার নৈকট্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ করা এবং তাদের কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত। এখন ইল্‌ম ও আমলের অধঃপতনের যুগ। মানুষ দুনিয়ার কাজে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, উলামা-মাশায়েখদের কাছে যাওয়ার সুযোগই পাচ্ছে না। তবু এ সময় যদি আল্লাহওয়ালাদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যায়, তাহলে হয়তো তাদের গাফেল অন্তরে জাগরণ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

## দারুল উলূম দেওবন্দের অবদান

দারুল উলূম দেওবন্দের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে এর সাথে-সাথে সেই মহান বুযুর্গের কথাও এসে যায়, যাঁদের ত্যাগের ফলেই আজকের এই

দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর জন্য তাদেরকে অনেক কুরবানি দিতে হয়েছে। তাঁদের ইখলাস এতই বেশি ছিল, যার বিনিময়ে আল্লাহ এই দেওবন্দ দান করেছেন। এই দারুল উলূম থেকে শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করে এমন বহু লোক বের হয়েছেন, যাঁদের তাকওয়া ও পরহেযগারি দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। মন চায়, কোনো মাহফিলে তাঁদের ঘটনাবলি আলোচনা করি, যাতে আমরা জানতে পারি, আমাদের রূহানি সম্পর্ক কেমন পূর্বসূরীদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়।

# হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.)

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.)-এর নাম ছিল খুরশিদ হাসান। তিনি ১২৪৮ সালে সাহারানপুর জেলায় নানুতা নামক পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আসাদ আলী ইবনে গোলাম শাহ অত্যন্ত পরহেযগার ও নামায-রোযার পাবন্দ ছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি ছিলেন ভদ্র, মেধাবী এবং পরিশ্রমী। প্রাথমিক শিক্ষা দেওবন্দেই অর্জন করেন। তারপর ১২৬০ সালে মাওলানা মামলূক আলী (রহ.)-এর সাথে দিল্লি চলে যান এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.)-এর ছোট ছেলে হযরত শাহ আবদুল গনি (রহ.)-এর কাছে উলূমে হাদীছ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর হাতে বায়'আত হন। তাঁর কাছ থেকে তাসাওউফ ও সুলুকে দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। তাঁর উপর হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহ.)-এর সাহচর্যের প্রভাব পড়েছিল। তিনি ছিলেন নরম মেজাজ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী। বিনয়, তাকওয়া ইত্যাদি উত্তম গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মাঝে। তাঁর যুগে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস এবং আশেকে রাসূল।

তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ (রহ.)-এর নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদও করেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি, ইয়াকুব নানুতবি, শেখ মুহাম্মদ থানভী, হাফেয যামেন শহীদ প্রমুখ। তাদের মধ্যে থেকে কয়েকজন শহীদ হয়েছেন এবং কয়েকজন বন্দী হয়েছেন।

আযাদীর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তিনি দ্বীনি ইল্‌ম শিক্ষাদানের কাজে মনোনিবেশ করেন। এ সময়ে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেন। দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার সাথে এমন একটি অন্যন্য ইতিহাস জড়িয়ে আছে, পৃথিবীতে যা চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকবে। এই দেওবন্দ থেকেই শিক্ষা লাভ করেছেন মাওলানা মাহমুদুল হাসান, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, আল্লামা শাব্বীর আহমাদ ওসমানী, সাইয়্যেদ হুসাইন আহমাদ মাদানি, মুফতী আযীযুর রহমান ওসমানী, মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও মাওলানা ইদরীস কান্ধলভীর মতো জগদ্বিখ্যাত মকবুল ওলামায়ে কেরাম, যাদের বরকেত পৃথিবী আলোকিত হয়েছিল। ইল্‌মের এই নক্ষত্রটি ১২৯৭ হিজরির ৪ঠা জুমাদাল উলা চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে যান।

## ইত্তেবায়ে সুন্নত

১৮৫৭ সালে ইংরেজরা যখন গ্রেফতারি পরোয়ানা জারী করে, তখন তিনি তিন দিন পর্যন্ত আত্মগোপন করেছিলেন। তারপরও তাঁকে অনেক দিন লুকিয়ে থাকতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু তিনি বললেন, তিন দিনের বেশি লুকিয়ে থাকা খেলাফে সুন্নাত হয়ে যায়। নবীজিও গারে ছাওরে তিন দিন আত্মগোপন করেছিলেন।

একদিন ইংরেজ সৈন্যরা তাঁকে খুঁজতে-খুঁজতে মসজিদে এসে পড়ল এবং তাকেই জিজ্ঞেস করল, কাসেম নানুতবি কোথায়? তিনি তখন কৌশল অবলম্বন করলেন। কয়েক কদম সামনে এগিয়ে আগের জায়গায় ইশারা করে বললেন, একটু আগে তো এখানেই ছিলেন। ইংরেজ সৈন্যরা তখন চলে গেল আর আল্লাহর দয়ায় তিনি বেঁচে যান।

## এক মাসে হেফয

একবার তিনি গাঙ্গুহি (রহ.)-সাথে হজের সফরে রওনা হন। পথিমধ্যে রমযান এসে পড়ে। কাফেলায় তারাবীহ পড়ানোর মতো বেশি হাফেয ছিল না। অগত্যা হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.) প্রতিদিন এক পারা মুখস্থ করে রাতে তারাবীহ পড়াতেন। এভাবে এক মাসে তিনি পুরো কুরআন শরীফ মুখস্থ করে ফেললেন। কাফেলার কেউ বুঝতেই পারেনি, যে তিনি আগে থেকে হাফেয ছিলেন না।

## ইল্‌মের পূর্ণতার পাঁচটি কারণ

একব্যক্তি মাওলানা ইয়াকুব নানুতবি (রহ.)কে প্রশ্ন করেছিল, আমরা যেসব কিতাব পড়ি, হযরত কাসেম নানুতবিও (রহ.) তো সেগুলোই পড়েছেন। তবু তাঁর মধ্যে এমন কী গুণ ছিল, যে কারণে তিনি এত উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন? তিনি বললেন, তাঁর মাঝে বিশেষ পাঁচটি গুণ ছিল। প্রথমত তিনি নম্র স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি একজন কামেল বুযুর্গ ওস্তাদের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। তৃতীয়ত তিনি অনেক উঁচু মানের পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। চতুর্থত গুণটি হলো ওস্তাদের প্রতি আদব। ওস্তাদকে তিনি অনেক সম্মান করতেন। পঞ্চমত তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (রহ.)-এর কাছ থেকে রূহানী ফয়জ লাভ করেছিলেন।

## ওস্তাদের প্রতি সম্মান

ওস্তাদের প্রতি তার সম্মানের নির্দশন এই ছিল যে, তিনি যখন অসুস্থ ছিলেন, তখন মাওলানা যুলফিকার আলী তাঁকে দেখতে আসতেন। ওস্তাদের

আগমনে প্রচণ্ড অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি উঠে বসতেন। মাওলানা যুলফিকার আলী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এমন কেন করেন? তিনি বললেন, কারণ, আপনি আমার ওস্তাদ। মাওলানা যুলফিকার আলী অবাক হয়ে বললেন, আমি আবার কবে আপনার ওস্তাদ হলাম? জবাবে কাসেম নানুতবি (রহ.) বললেন, একবার মাওলানা মামলুক আলী (রহ.) সফরে গিয়েছিলেন। তখন আপনি কয়েকদিন আমাদের কাফিয়া পড়িয়েছিলেন। তখন থেকে আপনি আমার ওস্তাদ।

## মুরশিদের প্রতি সম্মান

থানাভবনের একলোক একবার দেওবন্দে কাসেম নানুতবির মজলিসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কাসেম নানুতবি যখন জানতে পারলেন, তিনি থানাভবন থেকে এসেছেন, তখন তাকে বললেন, থানাভবন আমার মুরশিদের বাড়ি। আমার উচিত ছিল আপনাকে যথাযথ সম্মান করা। আমাকে মাফ করবেন। আরেকবার হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (রহ.) তাঁকে নিজের লেখা কপি করার জন্য দিয়েছিলেন।

এক জায়গায় অসাবধানতাবশত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কী (রহ.) ভুল লিখেছিলেন। হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.) সেটুকু জায়গা খালি রেখে দেন। নিজে থেকে ঠিক লিখেননি আবার ভুলও রেখে দেননি। তারপর অত্যন্ত আদবের সাথে এসে বললেন, হযরত এ অংশটুকু পড়া যাচ্ছে না। তখন হাজী সাহেব (রহ.) বুঝতে পেরে ভুল ঠিক করে দেন। ওস্তাদের প্রতি তিনি এতখানিই আদব প্রদর্শন করেছিলেন।

## তাওয়াজ্জুহর প্রভাব

হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.) সম্পর্কে হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) বলেন, একবার আমি ফজরের নামাযে সূরা মুয্যাম্মিল পড়ছিলাম। হঠাৎ ইলমের এমন আজিমুশশান দরিয়া আমার মনের উপর দিয়ে প্রবহিত হয়ে গেল যে, আমি সহ্য করতে পারলাম না। আমার রূহ বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। নামাযের পর বুঝতে পারলাম, সে সময়ে হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.) মিরাঠ হতে আমার প্রতি মুতাওয়াজ্জুহ হয়েছিলেন। তারপর বলেন, এর কারণ ছিল কাসেম নানুতবির ইল্‌মের গভীরতা। তিনি এমন সুগভীর সূক্ষ্ম ইল্‌মের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁর তাওয়াজ্জুহর কারণে এমন অবস্থা সৃষ্টি হতো, যা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ত।

## হযরত নানুতবি (রহ.)-এর প্রভাব

একবার হযরত নানুতবি (রহ.) হযরত থানভী (রহ.)কে জিজ্ঞেস করলেন, কী কিতাব পড়ছেন? হযরত থানভী (রহ.)-এর উপর এমন প্রভাব পড়ল যে, তিনি কিতাবের নামই ভুলে গেছেন। অবস্থা দেখে তিনি অন্য কথা শুরু করে দিলেন, যাতে প্রভাব কমে যায় এবং হযরত থানভীর মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে আসে। কিছুক্ষণ পর বললেন, এক হলো পড়া, আরেক হলো পাণ্ডিত্য অর্জন করা। শুধু পড়া-ই উদ্দেশ্য নয়; বরং সাথে-সাথে পাণ্ডিত্যও হাসিল হওয়া চাই। তারপর উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। একজন হেদায়ার হাফেয ছিল। কিন্তু সে বুঝে পড়েনি; শুধু ইবারত মুখস্থ করে নিয়েছে। আরেকজন ছিল, সে বুঝে পড়েছে। তো কোনো একটি মাসআলা সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করা হলে হাফেয বিষয়টি অস্বীকার করল যে, এই মাসআলা হেদায়ায় নেই। কারণ, আমি হেদায়ার হাফেয। কিন্তু অপর ব্যক্তি কিতাব খুলে ইবারত পড়ে সেখান থেকে মাসআলা ইস্তেম্বাত করল। তখন হাফেযে হেদায়া হয়রান হয়ে গেল। এতটুকু বলে তিনি হযরত থানভী (রহ.)কে বললেন, এ হলো পড়া আর পাণ্ডিত্য হাসিল করার পার্থক্য।

## নম্রতার সাথে উপদেশ

এক খান সাহেব নানুতবি (রহ.)-এর বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তিনি শরীয়তের খেলাফ পোশাক পরতেন। তিনি প্রতি শুক্রবার হযরতের কাছে আসতেন এবং সেখানেই গোসল করে কাপড় পড়ে জুমার নামাযে যেতেন। হযরত বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি কঠিন মানুষ। তাকে সহজে বললে হবে না। এক জুমার দিন হযরত তাকে বললেন, আপনার মতো পোশাক আরেক জোড়া নিয়ে আসুন। আমাদের দুজনের যখন অন্তরের মিল রয়েছে, তখন আমাদের পোশাকেও মিল থাকুক। আমিও আপনার মতো পোশাক পরব। লোকটি ভীষণ অবাক হয়ে বলল, হযরত আপনি আমার মতো অধম পোশাক পড়বেন? বরং আপনিই আমাকে আপনার মতো এক জোড়া পোশাক দিন। আমি আপনার মতো পোশাক পরব। তারপর থেকে ওই ব্যক্তি চিরদিনের জন্য সুন্নতী পোশাক ধারণ করল।

## তাকলীদের প্রয়োজনীয়তা

একবার এক গায়রে মুকাল্লিদ হযরতের তাকরীর শুনে বলেছিল, আপনি নিজে একজন মুজতাহিদ হয়ে তাকলীদ করেন? তখন হযরত তাকে বললেন, আমার তো আরো আশ্চর্য লাগে যে, আপনি মুজতাহিদ না হয়ে তাকলীদ

করছেন না! তারপর থেকে সেই ব্যক্তি তাকলীদের গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেন।

## গরিবি হালত

এক তালেবে ইল্‌ম হযরত নানুতবি (রহ.) কে দাওয়াত করলেন। তিনি বললেন, এক শর্তের কারণে দাওয়াত কবুল করতে পারি যে, বাড়িতে কিছু পাকাতে পারবে না। তোমাদের জন্য যে রুটি পাকানো হয় সেটাই আমাকে খাওয়াবে। তখন ওই তালেবে ইল্‌ম হযরতের সে শর্ত মেনে নিলেন,। হযরত তার দাওয়াত কবুল করে নিলেন। এভাবেই তিনি নিজেকে মিটিয়ে দিয়েছেন এবং এটাই ছিল তার তাওয়াযযু এবং বিনয়।

## শানে ইস্‌তিগনা বা পরবিমুখতা

বেরেলিতে কেউ একজন হযরতকে ছয় হাজার রুপি দিয়েছিল এবং বলেছিল, কোনো দ্বীনি কাজে খরচ করবেন। হযরত টাকা হাতে না নিয়ে বললেন, তুমি নিজে কোনো ভালো কাজে খরচ করো। কেননা, তুমিই এর যোগ্য। সে বলল, আমি কিভাবে এর যোগ্য হলাম? তিনি বললেন, যদি আল্লাহ আমাকে এর যোগ্য মনে করতেন, তাহলে অর্থটা তিনি আমাকেই দান করতেন।

## বিনয়

হযরত কোনো এক সময় মিরাঠে মসনবীর দরস দিতেন। এক মাজযুব লোক সেখানে বসত। একসময় সে বলতে লাগল, হযরত যদি নিজেও মাজযুব হতেন, তাহলে কত ভালো হতো! মহব্বতের কারণে সে এমন বলেছিল। একদিন সে বলল, হযরত আমি আপনাকে তাওাজ্জুহ দেব। হযরত কিছু না বলে চুপচাপ বসে পড়লেন। হযরতকে তাওয়াজ্জুহ দিতে গিয়ে লোকটি নিজের ভুল বুঝতে পারল। বলল, ক্ষমা করবেন; আমি বুঝতে পারিনি। আল্লাহ তো আপনাকেও অনেক উচ্চ মর্তবা দান করেছেন।

## স্বপ্নের ব্যাখ্যায় দক্ষতা

একবার মাওলানা মুনীর নানুতবি সরকারি স্কুলে যোগ দেওয়ার আবেদন করেছিলেন। তখন তিনি স্বপ্নে দেখলেন, কিছু লোভী লোক তার দিকে আসছে। এই স্বপ্নের কথা কাসেম নানুতবিকে বললে তিনি বললেন, মিষ্টি খাওয়ালে তাবির এক রকম হবে আর না খাওয়ালে অন্য রকম হবে।

মাওলানা মুনীর মিষ্টি খাওয়ানোর ওয়াদা করার পর কাসেম নানুতবি বললেন, তুমি বেরেলিতে যাও; সেখানে তোমার বিশ রুপি বেতনের চাকরি হয়ে যাবে। সুতরাং তিনি বেরেলিতে যাওয়ার পর বিশ রুপির বিনিময়ে তার চাকরি হয়ে গেল।

## একটি প্রশ্নের দুটি উত্তর

এক নেককার লোককে তার পরিচিত কিছু মানুষ কোনো এক মহিলার সৌন্দর্যের কথা বলে তাকে ওই মেয়ের প্রেমে ফেলে দেয়। উক্ত নেককার লোক মাওলানা গাঙ্গুহি (রহ.) ও কাসেম নানুতবির কাছে পরামর্শ করল, ওই মহিলাকে বিবাহ করবে কি-না? মাওলানা গাঙ্গুহি (রহ.) বললেন, তুমি তাকে বিবাহ করো না। কারণ, তুমি অভিজাত ছেলে আর ও বাজারি মেয়ে। ফলে বিবাহ করলে বংশের মধ্যে এর প্রভাব পড়বে। তারপর লোকটি মাওলানা কাসেম নানুতবির সাথে পরামর্শ করলে তিনি তাকে বিবাহের নির্দেশ দিলেন। মাওলানা তার অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন, ওই মহিলাকে বিবাহ করলে তার অস্থিরতা দূর হবে।

উভয় বুযুর্গই পরিপূর্ণ আখলাকওয়ালা ছিলেন এবং তাঁরা দুজনই লোকটির অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের একজন গালেবুল আখলাক ছিলেন এবং অপরজন মাগলুবুল আখলাক ছিলেন। এটা অনিচ্ছাবশত হয়ে গেছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গালেবুল আখলাক দান করেন আর যাকে ইচ্ছা মাগলুবুল আখলাক করে দেন। বরং কোনো-কোনো সময় একইজনের ভিতর আখলাক কোনো একদিকে প্রবল হয় আবার অন্য কোনো দিকে কম হয়।

## খাদেমের খেদমত

একবার এক দরবেশ কাসেম নানুতবির খেদমতে তার দরবেশি দেখানোর জন্য এল। সে সাথে করে অনেক ঘোড়া ও খাদেম নিয়ে এল। হযরত নানুতবি সবাইকে দাওয়াত দিলেন। তিনি শাহ সাহেবের কর্মচারী ও খাদেমকে নিজহাতে ওই পাত্রে খাওয়ানো শুরু করলেন, যে পাত্রে তিনি নিজে খেতেন। তখন উক্ত দরবেশ হযরত নানুতবির এই বিনয় ও আখলাক দেখে তার ভক্ত হয়ে গেল।

## ছাপাখানায় চাকরি

মাওলানা কাসেম নানুতবিকে এক ব্যক্তি ছাপাখানায় চাকরি নেওয়ার আবেদন করল। তিনি বললেন, আমার তো ইল্‌মি যোগ্যতা নেই; তবে

কুরআনের লেখার প্রুফ ঠিক করে দিতে পারব। এর বিনিময়ে আমাকে দশ রুপি দিলে হবে। আল্লাহু আকবার! তাঁর বিনয় ও উপকারের মানসিকতা কেমন ছিল! ঠিক তখনই ভাওয়ালপুর থেকে মাসিক ৩০০ রুপি বেতনে হযরত নানুতবির কাছে চাকুরির প্রস্তাব এল। এর জবাবে মাওলানা লিখলেন, আপনার প্রস্তাবের প্রতি শুকরিয়া আদায় করছি। কিন্তু আমি এখানে ১০ রুপির বিনিময়ে কাজ করি। উক্ত দশ রুপি থেকে ৫ রুপি জমা থাকে। আপনার ওখানে ৩০০ রুপির মধ্যে আমার ৫ রুপি খরচ হবে আর বাকি ২৯৫ রুপি আমি কী করব? তখন আমার চিন্তা থাকবে, এগুলো আমি কোথায় খরচ করব। এ কারণে আমি অপারগ। এ চিঠি লিখে তিনি প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন।

## হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর সাথে অকৃত্রিম সম্পর্ক

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) একবার বললেন, পীরের সাথে মুরীদের যে পরিমাণ মহব্বত হয়, হাজী সাহেবের সাথে আমার এই পরিমাণ মহব্বত নেই। একথা শুনে মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.) বললেন, এখন তো আপনার বাতেনি অবস্থা হযরত হাজী সাহেব থেকেও অনেক উন্নত হয়ে গেছে। হযরত গাঙ্গুহি বললেন, لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ اَسْتَغْفِرُ। হযরত কোথায় আর আমি কোথায়! তারপর হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বললেন, আপনার এ কথায় আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কাসেম নানুতবি বললেন, মানলাম, আপনি তাঁর থেকে অগ্রগামী নন; কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছি, এই যে ব্যথাটা পেলেন; এটা কেন পেলেন? আপনি তো বলছেন, হযরতের প্রতি আপনার মহব্বত নেই। মহব্বতই যদি না থাকবে, তাহলে ব্যথা লাগবে কেন? এটি-ই তো মহব্বত! কারণ, মহব্বত না থাকলে আপনার কষ্ট হতো না। হযরত গাঙ্গুহি বললেন, ভাই! তুমি অনেক বড় ওস্তাদ। এভাবে তাদের মধ্যে অনেক কথাবার্তা হতো।

## হাজরে আসওয়াদ প্রসঙ্গ

হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.) বলেন, হজরে আসওয়াদ স্পর্শ করার দ্বারা মানুষের আসল অবস্থা প্রকাশ পায়। যদি ওই সময় কারো মন-মানসিকতা নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ থাকে, তাহলে হজের পর তার নেক আমল বৃদ্ধি পাবে। এর বিপরীত হলে তার অবস্থা সে অনুযায়ী হবে। এজন্য হাজীদের জন্য বিষয়টি ভয়ানক। তাই হাজীদের উচিত, হজের সময় আল্লাহর কাছে নিজের ইসলাহ ও নেক আমলের যোগ্যতার বৃদ্ধি হওয়ার জন্য বেশি-বেশি দু'আ করবে।

## ইসলামের ভালোবাসায় ইহত্যাগ

কাসেম নানুতবির বাড়ির পাশে এক হিন্দু লোক থাকত। তার দোকান থেকে তিনি সওদা কিনতেন। ওই হিন্দু লোকটি মারা যাওয়ার পর কাসেম নানুতবি (রহ.) স্বপ্নে দেখলেন, লোকটি জান্নাতে ঘোরাফেরা করছে। কাসেম নানুতবি (রহ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি জান্নাতে কিভাবে এলে? তুমি তো হিন্দু ছিলে? তুমি পূজা করতে। জান্নাত তো মুসলমানদের জন্য। হিন্দু লোকটি বলল, মাওলানা! আপনার সোহবতে থেকে ইসলামের সাথে আমার মহব্বত হয়ে গিয়েছিল। আমার মৃত্যুর সময় লোকেরা কী যেন বলছিল, তখনও ফেরেশতা আসেনি। আমি মনে-মনে কালিমা পড়ে নিলাম। তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায় এবং আমাকে জান্নাত দান করা হয়।

## প্রকৃত অনুসন্ধান হলে এমনই হয়

এক জমিদার কাসেম নানুতবির কাছে বায়'আত হওয়ার আবেদন করল। তিনি বললেন, গাঙ্গুহ গিয়ে গাঙ্গুহির কাছে বায়'আত হও। জমিদার লোকটি বলল, ঠিক আছে। লোকটি গাঙ্গুহ গিয়ে হযরত গাঙ্গুহির কাছে বায়'আত হয়ে দেওবন্দ ফিরে এল। তারপর কাসেম নানুতবির কাছে পুনরায় গিয়ে বায়'আত হওয়ার জন্য আবেদন করল।

হযরত নানুতবি বললেন, আমি তোমাকে হযরত গাঙ্গুহির কাছে গিয়ে বায়'আত হওয়ার জন্য বলেছিলাম। লোকটি বলল, আমি তাঁর কাছে গিয়ে বায়'আত হয়ে এসেছি। কিন্তু অন্তর থেকে আপনার কাছে বায়'আত হতে চাই। মহব্বত ও সম্পর্কের কেমন আকর্ষণ? অবশেষে কাসেম নানুতবি (রহ.) তাকে বায়'আত করে নিলেন।

## তাকবীরে উলা ছুটে যাওয়ার কারণে আফসোস

তাযকেরাতুর রশীদ কিতাবে লেখা আছে, একবার দেওবন্দে দস্তারবন্দির জলসায় কাসেম নানুতবি তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আসরের নামাযের সময় মাওলানা ইয়াকুব (রহ.) ইমামতির জন্য এগিয়ে গেলেন! মানুষের প্রচণ্ড ভিড় ও মুসাফাহা সামাল দিতে গিয়ে কাসেম নানুতবির নামাযে আসতে দেরি হয়ে গেল। তিনি যখন জামাতে শরীক হন, তখন কেরাত শুরু হয়ে যায়। সালাম ফিরানোর পর দেখা গেল, হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.) বিষণ্ন চেহারায় আফসোস করে বারবার বলছিলেন, হায় আফসোস! বাইশ বছর পর আজ আমার তাকবীরে উলা ছুটে গেল!

## বিনয় প্রকাশ

'আরওয়াহে ছালাছা'য় মাওলানা আমীরুদ্দীনের বরাত দিয়ে লেখা আছে, একবার ভুপাল থেকে কাসেম নানুতবির কাছে মাসিক ৫০০ রুপির বেতনে চাকুরির প্রস্তাব এল। এ বিষয়ে তাকে পীড়াপীড়ি করা হলে তিনি বললেন, আমাকে অনেক যোগ্য মনে করে ৫০০ রুপি বেতনের চাকুরির প্রস্তাব দিচ্ছে। অথচ আমি আমার ভিতরে কোনো যোগ্যতা দেখছি না। আমি সেখানে কিসের উপর বিশ্বাস করে যাব? অনেক পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও তিনি সেখানে গেলেন না।

## ইল্‌ম অর্জন করার বিস্ময়কর পদ্ধতি

'আরওয়ায়ে ছালাছা'য় লেখা আছে, হযরত কাসেম নানুতবির খেদমতে হায়দারাবাদ শহর থেকে এক নবাবের দুই ছেলে পড়ালেখা করার জন্য এসেছিল। হযরত তাদের দিয়ে পা টেপাতেন। একদিন তিনি বললেন, আমার তো প টেপানোর প্রয়োজন নেই; কিন্তু আমি তাদের দিয়ে পা টেপাচ্ছি একথা বোঝানোর জন্য যে, ইল্‌ম এভাবেই আসে।

## খাওয়ার মাঝে বিনয় প্রকাশ

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.) ছাত্র যমানায় একটি কামরায় একা থাকতেন। একবার রুটি বানালে তা রেখে-রেখে কয়েকদিন খেতেন।

## কিতাব অধ্যয়নে আগ্রহ

তাযকেরাতুর রশীদ কিতাবে লেখা আছে, তিনি এতো কষ্ট করতেন যে, দিবা-রাত্রি ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রায় ৭/৮ ঘন্টা খানা-পিনা ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যয় করতেন আর বাকি সময় কিতাব অধ্যয়ন ও পড়াশোনায় কাটিয়ে দিতেন। কিতাব অধ্যয়নে এতোই মগ্ন হয়ে যেতেন যে, পাশে রেখে দেওয়া খাওয়া কেউ উঠিয়ে নিয়ে গেলেও তিনি টের পেতেন না। অনেকবার এমন হয়েছে, কিতাব দেখতে-দেখতে তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। ভোরে উঠে মনে হয়েছে, রাতে তার খাওয়া হয়নি। মাদরাসায় আসা-যাওয়ার সময় তিনি এদিক-ওদিক তাকাতেন না। খুব দ্রুত হাঁটতেন।

## কালিমায়ে তাইয়্যেবার বরকত

হযরত নানুতবি (রহ.) বলেন, একবার আমি গাঙ্গুহ গিয়েছিলাম। হযরত গাঙ্গুহির একটি পেয়ালা রাখা ছিল। আমি পাত্রটি নিয়ে কুয়া থেকে পানি

উঠালাম। দেখি, পানি তিতা। যোহরের সময় হযরত গাঙ্গুহির সাথে দেখা হলে তাকে ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, পানি তো তিতা হওয়ার কথা নয়; বরং পানি তো মিঠা। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) সেই পানি মুখে নিয়ে তিতা দেখতে পেলেন। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বললেন, আচ্ছা; রেখে দাও। নামাযের পর সমস্ত মুসল্লীকে কালিমায়ে তাইয়্যেবাহ্ পড়ার আদেশ করলেন। তিনি নিজেও কালিমা পড়তে শুরু করলেন। তারপর হযরত সবাইকে নিয়ে হাত তুলে আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতিসহকারে দু'আ করলেন। দু'আর পর ওই পাত্র থেকে পানি মুখে নিয়ে দেখলেন, পানি মিষ্টি হয়ে গেছে। মুসল্লীরাও পানি মুখে নিয়ে তিতার কোনো নাম-গন্ধ পেলেন না। তারপর হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বললেন, এই পাত্রে যে মাটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা এমন এক কবরের মাটি, যেখানে আযাব হচ্ছিল। আল্লাহর শুকরিয়া, কালিমার বরকতে কবরের আযাব দূর হয়ে গেছে।

## অমুখাপেক্ষিতা

একবার হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.) ছাত্তা মসজিদসংলগ্ন কামরায় শিঙ্গা নিচ্ছিলেন। মিরাঠের প্রধান আব্দুল করীম হযরত নানুতবির সাথে দেখা করার জন্য দেওবন্দ এল। নানুতবি তাকে দূর থেকে দেখেছিলেন। সে কাছে আসার পর তিনি এক পাশ থেকে অন্য পাশে ফিরে গেলেন, যেন তিনি দেখেননি। আব্দুল করীম হাতে একটি রুমালে অনেকগুলো রুপি বেঁধে তাঁর সামনে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর হযরত নানুতবি তার দিকে ফিরে বললেন, আহা! আপনি এসেছেন। ভালো তো? লোকটি সালাম দিয়ে পায়ে চুমা খেয়ে রুপিগুলো তাঁর পায়ের সামনে রেখে দিল। হযরত তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে মিরাঠের প্রধান তা হযরতের জুতার ভিতর রেখে দিল। হযরত রুপিগুলো খুব সাবধানে জুতা থেকে বের করে যমীনে রেখে জুতা পরিধান করলেন। হেসে-হেসে বললেন, আমরা দুনিয়া কামাই আর দুনিয়াদাররাও দুনিয়া কামায়। তবে আমাদের ও তাদের মধ্যে পার্থক্য হলো, আমরা দুনিয়াকে লাথি মারি আর দুনিয়া আমাদের পায়ে এসে পড়ে। অপরদিকে দুনিয়াদাররা দুনিয়ার পায়ে গিয়ে পড়ে আর দুনিয়া তাদের লাথি মারে। তারপর তিনি ওই রুপিগুলো ওখানেই বণ্টন করে দিলেন।

## কৃত্রিমতা থেকে দূরে থাকা

মাওলানা আহমাদ হাসান বলেন, এক জেলে হযরত নানুতবিকে দাওয়াত করেছিল। ঘটনাক্রমে ওইদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। তাঁকে ডাকতে না এলেও তিনি

সময়মতো জেলের বাড়িতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সে বলল, আজ বৃষ্টি হওয়ার কারণে দাওয়াতের আয়োজন করতে পারিনি। হযরত নানুতবি (রহ.) বললেন, কী ব্যবস্থা করবে? আচ্ছা, তোমার ঘরে এখন কোনো খাবার আছে? সে বলল, হাঁ, আছে। তিনি বললেন, ব্যস,ওটাই নিয়ে আসো। সে ঘরে ওই মুহূর্তে যা কিছু প্রস্তুত ছিল, তা-ই নিয়ে এলে হযরত নানুতবি (রহ.) তা-ই খুশিমনে খেয়ে বললেন, তোমার দাওয়াত হয়ে গেছে।

## মেধার ঘটনা

এক ইংরেজ গণিতবিদ ঘোষণা দিল, যদি কেউ ত্রিভূজ রেখা প্রমাণসহকারে তিন অংশে ভাগ করে দিতে পারে, তাহলে তাকে দেড় লক্ষ রুপি পুরস্কার দেওয়া হবে। মুযাফফর নগরের এক জজ অনেক কষ্ট ও মেহনত করে তা প্রমাণ করে দেখালেন। কয়েকজন দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার জজকে তা প্রকাশ করে দেড় লক্ষ রুপি পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু জজ চাচ্ছিলেন, আগে তা হযরত নানুতবি (রহ.)কে দেখাবেন। তিনি সত্যায়ন করলে পরে প্রকাশ করবেন। ওই সময় ঘটনাক্রমে হযরত নানুতবি (রহ.) মুযাফফর নগরে অবস্থান করছিলেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে আসার জন্য যখন রেলস্টেশনে এসে গাড়িতে উঠলেন, তখনো গাড়ি ছাড়তে দশ-বারো মিনিট বাকি ছিল। ডা. আব্দুর রহমান নামক এক ভদ্রলোক কাসেম নানুতবির কাছে জজ সাহেবের পরিকল্পনা ও ইচ্ছার কথা জানলেন। তার ইচ্ছা ছিল, হযরত এই বিষয়ের পাণ্ডুলিপি সাথে করে নিয়ে যাবেন। কিন্তু হযরত গাড়ির অপেক্ষমাণ সময়ের ভিতর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পুরো পাণ্ডুলিপির ওপর নজর দিয়ে বিভিন্ন ভুলগুলো দেখিয়ে দিলেন। জজ সাহেব তখনই তার প্রকাশ মুলতবি করে দিলেন।

## শৈশবকালের একটি স্বপ্ন

ছাত্র যমানায় হযরত নানুতবি (রহ.) একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন। দেখলেন, তিনি কাবাঘরের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন আর তার শরীর থেকে হাজারো নদী প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি স্বীয় ওস্তাদ মাওলানা মামলুক আলীকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলে ওস্তাদ বললেন, আল্লাহ তোমার থেকে দীনের ইল্‌মের বিপুল খেদমত নিবেন।

## নবীজির মহব্বত

হিন্দুস্তানে অনেক বুযুর্গানে দীন পরম আগ্রহের সাথে সবুজ রঙের একপ্রকার জুতা পরিধান করতেন। কিন্তু হযরত নানুতবি (রহ.) এ জুতা

জীবনে কখনও পরিধান করেননি। কেউ হাদিয়া দিলেও তিনি তা গ্রহণ করতেন না। শুধু এ কারণে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের গম্বুজের রং সবুজ। হযরত হোসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.) হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.) সম্পর্কে বলেন, 'জীবনে কখনও সবুজ রঙের পরিধান করেননি। কারণ, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কবরের গম্বুজের রং সবুজ। কেউ হাদিয়া দিলেও তিনি তা গ্রহণ না করে অপরকে দিয়ে দিতেন।'

হযরত নানুতবি (রহ.) হজের জন্য গেলেন। তো মদীনা মুনাওয়ারা গিয়ে শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে থাকতেই খালি পায়ে চলা শুরু করতেন। নবীজির প্রতি পরম ভালোবাসা তাঁকে জুতা পরে মদীনার মাটিতে হাঁটতে দিত না। অথচ সেখানে শক্ত বালুকণা ও পাথর ছিল। হযরত সাইয়েদ মানাযির আহসান গিলানী (রহ.) জনাব মাওলানা হাকীম মানসুর আলী সাহেবের বরাতে – যিনি ওই হজের সফরে হযরত নানুতবির সফর সঙ্গী ছিলেন – বলেন, 'মাওলানা মরহুম মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে থাকতেই অন্ধকার রাতে এভাবে হেঁটে খালিপায়ে পৌঁছে গেলেন।'

## ইসলামের উপস্থাপনা

একবার শাজাহানপুরে আহলে ইসলাম এবং বিভিন্ন বাতলে ফেরকার মাঝে বিতর্কের আয়োজন করা হলো, যেখানে অনেক বড়-বড় হিন্দু নেতা এবং তখনকার নামকরা বড়-বড় উলামায়ে হক উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু বিতর্ক হয়েছিল পাদ্রী ও মুসলমানদের মাঝে। হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.) ওই বিতর্কে আলোচক ছিলেন। তিনি যুক্তি ও কুরআন-হাদীছের আলোকে এমনভাবে প্রমাণ করলেন যে, পাদ্রীরা তার উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন।

## আর্য সমাজের সংশোধন

ইংরেজদের প্রিয়ভাজন, হিন্দু ও আর্যদের নের্তস্থানীয় ব্যক্তি স্বামী দিয়ানন্দ – যিনি যুক্তি-তর্কে পণ্ডিত ব্যক্তি বলে খ্যাত ছিলেন – একটি গ্রন্থে কুরআনে কারীমের বিসমিল্লাহ থেকে নিয়ে সূরা নাস পর্যন্ত সবগুলো সূরার উপর কিছু প্রশ্ন এবং এসবের দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করেছে। সে যেখানে-সেখানে তার প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য মুসলমানদের আহবান জানাত। নিজের দাওয়াতি মিশন নিয়ে সে একবার রড়কি গেল। সেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে মন খুলে আচ্ছামতো বিষোদগীরণ করল। শায়খুল হিনদ ও মাওলানা

আবদুল আদ্‌ল সাহেব প্রকাশ্য জনসম্মুখে কয়েক দিন তার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন এবং পণ্ডিতজি ও তার অনুসারীদের চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন। এঁরা তাদের ধর্মের উপর প্রশ্ন তুললেন যে, এগুলোর উত্তর দাও। কিন্তু পণ্ডিতজি ও তার শিষ্যদের কানে পানি ঢুকল না। তাদের মাঝে কোনো নড়চড় পরিলক্ষিত হলো না। অবশেষে হযরত নানুতবি (রহ.) বললেন, আচ্ছা, পণ্ডিতজি তার শিষ্য-অনুসারীদের নিয়ে আমার ওয়াজ শুনুন। কিন্তু সে ওয়াজে আসবে কী; রড়কি থেকেই কেটে পড়ল। তারপর আর তার কোনো পাত্তা-ই পাওয়া গেল না। অগত্যা হযরত নানুতবি (রহ.) তিন দিন পর্যন্ত প্রকাশ্যে ওয়াজ করলেন। তিনি ইসলামের সত্যতার পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করলেন। তাঁর এই বয়ান শুনে সবাই হতবাক ও হতভম্ব হয়ে গেল। তাতে প্রতিজন শ্রোতা-ই প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হলো। তিনি পণ্ডিতজির আপত্তিগুলোর এমন দাঁতভাঙা উত্তর দিলেন যে, বিরুদ্ধবাদীরা পর্যন্ত মেনে নিতে বাধ্য হলো।

# হযরত মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.)

হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.) সাহারানপুর জেলার গাঙ্গুহ এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা হেদায়াত আহমাদ। তাঁর বংশপরিক্রমা সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারী (রাযি.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। তিনি ইবতেদায়ী ও ফারসি শিক্ষা গাঙ্গুহে অর্জন করেন।

১২৬১ হিজরিতে দিল্লী সফর করে মাওলানা মামলুক আলীর খেদমতে আসেন। মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.) এখানে আগেই এসে পৌঁছে ছিলেন। ইল্‌ম ও ফযলের এই দুই সূর্য এখানে একত্রিত হন এবং আজীবন একসাথে থাকেন। এই দুজনকে মাওলানা মামলুক আলী অত্যধিক মহব্বত করতেন। মেধার বিবেচনায় এরা দুজন পুরো দিল্লীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তিনি ইল্‌মে হাদীছ অর্জন করেন স্বীয় খান্দানের শেষ বাতি মাওলানা আব্দুল গনী মুহাদ্দিছে দেহলবীর নিকট। একুশ বছর বয়সে তিনি সমস্ত বিষয়ে ইল্‌ম অর্জন শেষ করেন। তারপর নিজ এলাকায় ফিরে আসেন। একবার তিনি থানাভবনে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর খেদমতে হাজির হলে তাঁর অন্তরে বায়'আত হওয়ার ইচ্ছা হলো। বাই'য়াতের দরখাস্ত করলে প্রথমে হাজী সাহেব (রহ.) অস্বীকার করলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে হাফেয যামেন শহীদ (রহ.)-এর সুপারিশে হাজী সাহেব তাকে বায়'আত করেন। তারপর তিনি বায়'আতের কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, হাজী সাহেব অষ্টম দিনে আমাকে ডেকে বললেন, রশীদ! যে নেয়ামত আল্লাহ আমাকে দান করেছেন, তা আমি তোমাকে দিয়ে দিলাম। এখন তোমার কাজ হলো তা বৃদ্ধি করা। বিয়াল্লিশতম দিনে তিনি হাজী সাহেবের কাছে জন্মভূমিতে চলে আসার এজাযত চাইলে হাজী সাহেব তাঁকে বায়'আতের এজাযত ও খেলাফত দিয়ে বিদায় দেন।

গাঙ্গুহ এসে তিনি শাহ আব্দুল কুদ্দুসের খানকা আবাদ করেন, যা তিনশত বছরের অধিক সময় বিরান অবস্থায় পড়ে ছিল। তিনি এখানে রাত-দিন যিকির ও ফিকিরে মশগুল থাকতেন। রাতে তিনি কাঁদতেন। যে কাঁথাটা তিনি গায়ে দিতেন, তা তাঁর চোখের অশ্রুতে ভিজে যেত। তিনি তৎকালীন যমানায় ফিক্‌হ ও হাদীছের ইমাম ছিলেন। তার ফয়েয থেকে যারা উপকৃত হন,

তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহ.), খলীল আহমাদ সাহারানপুরি (রহ.), মাওলানা আব্দুর রহমান রায়পুরি (রহ.) এবং মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

১৮৫৭ সনে আযাদীর যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)কেও সন্দেহজনক আসামী হিসেবে গ্রেফতার করে। কিন্তু কোনো প্রমাণ না পাওয়ায় পরে তাঁকে ছেড়ে দেয়। তিনি সারা জীবন দীনের খেদমতে কাটিয়ে দেন। ফতোয়ায়ে রশীদিয়া তাঁর অমর কীর্তি। এছাড়া তিনি আরো তাসনীফাতের কাজ করেন। অসংখ্য আলেম তাঁর থেকে উপকৃত হন। অবশেষে ১৩২৩ হিজরির ৯ জুমাদাল উখরা মোতাবেক ১৯০৫ সনে তিনি প্রিয় রবের ডাকে সাড়া দেন।

## সোহবতের বরকত

হযরত থানবী (রহ.) বলতেন, হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহির সোহবতের প্রতিক্রিয়া এমন ছিল যে, যেকোনো ধরনের বিপদগ্রস্ত কিংবা দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত লোক তাঁর সোহবতে আসত, সে শান্ত ও স্থির হয়ে যেত। এজন্য তাঁর মুরীদগণের মাঝে সহীহ আকীদা ও দীনদারীর ব্যাপারে দৃঢ়তা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। এসব তাঁর সোহবতের বরকত ছিল।

## অক্ষমতা ও এর ব্যাখ্যা

হযরত গাঙ্গুহি কসম খেলেন যে, আমার মধ্যে কোনো ভালো কিছু নেই। সবাই আমার প্রতি সুধারণা পোষণ করে আসে। কেউ বলল, হযরতের এভাবে কসম খাওয়া মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে। হযরত থানবী (রহ.) তাঁর এই কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, আল্লাহওয়ালারা ভবিষ্যতে অর্জন হওয়া গুণাবলির দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে বর্তমান গুণাবলির কথা ভুলে যান। তিনি তা এভাবেই দেখেছেন। এর উদাহরণ এমন যে, কারো কাছে এক হাজার রুপি আছে। তো সে লাখপতির সামনে ধনী বলে গণ্য হয় না। আল্লাহ যত দান করবেন, তার ওপরই স্থির হয়ে বসে থাকা উচিত নয়। আরো বেশি-বেশি আশা রাখতে হবে। কারণ, তার যমানায় কোনো ঘাটতি হবে না।

تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا
ورنہ گلشن میں علاج تنگیٔ داماں بھی تھا

তুমিই তো বোকা! কয়েকটা ফুলকলি নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে গেলে! অন্যথায় আঁচল-সংকীর্ণতার সমাধানও বাগানে ছিল (অর্থাৎ আঁচল সংকীর্ণ তো কি হয়েছে, ভিন্ন থলেও তো আছে, তাতে ভরে ফুল নিতে পারতে)।

## বাদশাহী মর্যাদা

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর অভ্যাস ছিল, ইশরাক বা চাশতের সময় হলেই ওযু করে যেখানে থাকতেন, সেখানেই নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। ওখানে ওই সময় কেউ থাকুক বা না থাকুক। এমন হতো না যে, তিনি কাছে বসা কারো কাছ থেকে ওঠার অনুমতি চাইতেন অথবা তাকে নামাযের কথা বলতেন। তিনি কথা খুব কম বলতেন। একান্ত দরকার হলে দ্রুত কথা শেষ করে যিকিরে মশগুল হয়ে যেতেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিতেন। অন্যথায় চুপ থাকতেন।

## অন্যকে নিজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন

একবার হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.) রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহিকে বললেন, আপনার ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গি খুবই উন্নত। আমার দৃষ্টিভঙ্গি এমন নয়। এজন্য আমার ঈর্ষা হয়। এর উত্তরে রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি বললেন, হ্যাঁ! আমার কিছু ফিকহী কথা স্মরণ হয়েছে। তাই আপনার ঈর্ষা লাগছে আর আপনি মুজতাহিদ হয়ে বসে রইছেন আর আমার ঈর্ষা হচ্ছে না। তাঁরা এভাবেই আলাপ করতেন। একজন অপরজনকে বড় মনে করতেন।

## তাসাওউফ অর্জন

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বলতেন, যদি আমি আগে থেকেই জানতাম, তাসাওউফের শেষ কোথায়, তাহলে আমি কিছুই করতাম না। দীর্ঘ সময় চলে যাওয়ার পর বুঝলাম, যার জন্য এতো রিয়াজত ও মুজাহাদা, তা অল্প কয়েকটি কথার মধ্যে নিহিত। হযরত তো এর ব্যাখ্যা করেননি। আমি আমার সামান্য জ্ঞান থেকে অল্প কথায় এর ব্যাখ্যা এভাবে করছি যে, তা হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা এবং তা আরো বৃদ্ধি করা।

## গোনাহ হয়ে যাওয়ার সাথে-সাথে তাওবা করা উচিত

হাফেয যামেন (রহ.)-এর এক খলীফা ছিলেন। তার ঘর থেকে কোনো কিছু চুরি হয়ে যায়। তিনি মেধাবী লোক ছিলেন। কেউ তাকে তার এই

খলীফার নাম বলল। যামেন সাহেব তাকে ডেকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে সে ভয়ে উত্তর দিতে গিয়ে কথা গড়মিল করে ফেলল। এ কারণে তার ওপর সন্দেহ বেড়ে গেল। তিনি তাকে প্রহার করলেন। ওই খলীফা হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর নিকট এসে ঘটনা খুলে বললে হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) তাকে লিখে পাঠালেন, আপনি তাকে কোন দলিলে প্রহার করেছেন? আল্লাহ আপনাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে আপনি কী উত্তর দিবেন? আপনি এর উত্তর ঠিক করুন। এই চিঠি পড়ে যামেন সাহেবের যেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। তিনি পায়ে হেঁটে গাঙ্গুহ এলেন। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) ওই সময় রুমে শোওয়া ছিলেন। বাইরে এক ছাত্র বসা ছিল। যামেন সাহেব ওই ছাত্রকে বললেন, হযরতকে খবর দাও, একটা নাপাক কুকুর এসেছে। যদি মুখ দেখানোর উপযুক্ত হয়, তাহলে তিনি মুখ দেখাবেন। অন্যথায় কুয়ায় ডুব দিয়ে মরে যাবেন, যাতে এই দুনিয়া পবিত্র হয়। ছাত্র হযরত গাঙ্গুহিকে খবর দিলে তিনি তাকে আসতে বললেন। যামেন সাহেব হযরত গাঙ্গুহিকে বললেন, হযরত! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বললেন, ঘটনা লম্বা করছ কেন? তাওবা করো; সব ঠিক হয়ে যাবে। এটিই চিকিৎসা।

## তাওয়াসসুলের মাসআলা

হযরত থানবী (রহ.) বলতেন, আমার তাওয়াসসুলের মাসআলায় প্রশ্ন ছিল। আমি এর সমাধান পাওয়ার জন্য হযরত গাঙ্গুহির কাছে গেলাম। তখন হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আমি সালাম দিয়েই তাওয়াসসুলের মাসআলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। আমি মনে করেছিলাম, আমার আওয়াজ শোনে তিনি আমাকে চিনে ফেলবেন। তাই আমি সালাম দিয়েই বললাম, তাওয়াসসুলের ব্যাপারে জানতে চাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কে? আমি বললাম, আশরাফ আলী। তিনি বললেন, আশ্চর্য! ব্যস এতোটুকুই কথা। আর কোনো কথা নেই। আমারও সাহস হলো না কথা বলতে। আমি থানাভবন ফিরে এলাম। কিন্তু এই মাসআলার বিষয়ে আমি এমন সমাধান পেলাম যে, তারপর আর কোনো প্রশ্ন বাকি থাকল না। আমি এ বিষয়ে একটা পুস্তিকা লিখি, সেখানে এই মাসআলা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

## স্থায়ী বন্ধুত্বের আলামত

আজকাল বন্ধুত্ব শুধু নামেই আছে। অন্যথায় নৈকট্য হারিয়ে গেছে। একবার হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর মজলিসে হাফেয মুহাম্মাদ আহমাদ ও

মৌলবী হাবীবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন, যাদের বন্ধুত্ব প্রসিদ্ধ ছিল। হযরত তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কখনও কি তোমাদের মাঝে লড়াই হয়েছে? তারা বললেন, হযরত কখনও-কখনও হয়ে যায়। তিনি বললেন, এই বন্ধুত্ব টেকসই। ওই গাছ মজবুত হয়, যার ওপর ঝড় এসেছে; কিন্তু তারপরও শিকড় ছাড়েনি। বন্ধুত্ব ঠিক এরকমই। কখনও পরস্পরে লড়াই হবে আবার সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাবে।

## পদের লোভের অপকারিতা

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) এক শায়খ ও এক মুরীদের কাহিনী বলেছিলেন। মুরিদ অনেক ইবাদাত ও মুজাহাদা করত। কিন্তু তার কোনো ফল সে পেত না। শায়খ তার অনেক ওযীফা পরিবর্তন করেন এবং নানা ব্যবস্থা প্রদান করেন। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। অবশেষে শায়খ একটি পন্থা অবলম্বন করলেন, যা পদমর্যাদা ও মান-সম্মানের পরিপন্থী ছিল। সে তা করতে অপারাগতা প্রকাশ করল। তখন শায়খ বুঝতে পারলেন, এই মুরীদ মর্যাদালোভী ছিল। প্রকৃত ছাত্র ছিল না। এজন্য তার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

## তাসাওউফে বেয়াদবি দস্যুর ভূমিকা রাখে

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) একটি ঘটনা বলতেন। এক আলেম হযরত মিয়া নূর মুহাম্মদ সাহেবের শানে বেয়াদবিমূলক কথাবার্তা বলল। শেষে সে তাওবা করে হযরত মিয়াজী সাহেবের নিকট বায়'আতের আবেদন জানাল। হযরত মিয়া তাকে বায়'আত করেন। কিছুদিন পর তিনি তাকে বললেন, এই পদ্ধতি ইখলাস অনুযায়ী হচ্ছে। তাই আমি তোমার কাছে কথা গোপন রাখতে চাই না। তা হলো, আমি যখন তোমার দিকে তাওয়াজ্জুহ দেই, তখন তুমি আমাকে যেসব কথা বলেছিলে, তা আমার ও তোমার মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমি তোমাকে উপকার করার চেষ্টা করি, কিন্তু এর কোনো সুযোগ হচ্ছে না। এজন্য উত্তম হলো, তুমি অন্য কারো কাছে বায়'আত হও। আমি তোমার ব্যাপারে সুপারিশ করব। মুফতী শফী সাহেবের মতে এটা হিংসার বিষয় নয়; বরং এটা অনিচ্ছাকৃত বিষয়। যেমন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হামযা (রাযি.)-এর হত্যাকারী ওয়াহশী মুসলমান হওয়ার পরও তাকে বলেছিলেন, তুমি আমার সামনে এসো না। কারণ, তোমাকে দেখলে হামযার শোক আমার অন্তরে জাগ্রত হয়। ফলে এ তোমার জন্য ক্ষতির কারণ হবে।

## কাশফের অধিকারী বুযুর্গের দু'আ করতে লজ্জাবোধ

হযরত থানবী (রহ.) বলতেন, একবার হজের সফরে হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) যে জাহাজে ছিলেন, ওই জাহাজেই এমন এক লোক ছিল, যে এর আগেও হজে গিয়েছিল; কিন্তু তার হজ করার সুযোগ হয়নি। সে জাহাজে আরোহন করে জানতে পারল, হজের সময় শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছে। যদি জাহাজ পথে থামে, তাহলে হজ করার সুযোগ হবে না। একথা শুনে হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বললেন, হজ করার সুযোগ অবশ্যই হবে। তারপরও ওই লোকটি জাহাজ থেকে নেমে পড়ল। কেউ হযরত গাঙ্গুহিকে বলল, তার জন্য দু'আ করুন, যাতে সে হজ করতে পারে। হযরত বললেন, দু'আ করতে মন চাচ্ছে না। যখন জাহাজ কামরানের কাছাকাছি পৌঁছল, তখন লোকেরা জাহাজের ক্যাপ্টেনকে বলল, জাহাজ কামরানে থামলে তোমাকে আমরা হত্যা করব। তারা ছোরা বের করে তাকে ভয় দেখাল। ক্যাপ্টেন ভয়ে জাহাজ সোজা জেদ্দা গিয়ে থামাল। এ কারণে ক্যাপ্টেনের ওপর কয়েক হাজার রুপি জরিমানা করা হলো। জেদ্দায় হাজীদের নামিয়ে দেওয়া হলো। হযরত হাজী সাহেব (রহ.) বলেন, গাঙ্গুহি (রহ.) এই জাহাজে না থাকলে ওই জাহাজের কারো হজ করার সুযোগ হতো না।

## হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহর সন্তানের মর্যাদা

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বলেন, হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহর মৃত্যুর সময় তাঁর ছোট-ছোট বাচ্চাদের ব্যাপারে চিন্তা হলো। তিনি স্বপ্নে নবীজিকে তাশরীফ আনতে দেখলেন। নবীজি তাঁকে বলছেন, তুমি কার চিন্তা করছ? তোমার সন্তান আমারই সন্তান। তারপর তাঁর ঘুম ভেঙে যায় এবং তিনি শান্ত হন। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বলেন, পরবর্তী কালে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহর ওই ছোট শিশুরা বড়-বড় আলেম হন এবং উচ্চমার্গের খ্যাতি অর্জন করেন।

## ধৈর্য থাকবে তো এমনই থাকা চাই

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর যুবক ছেলের ইনতিকাল হলো। লোকেরা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে এসে চুপ করে বসে থাকল। তারা ভেবে পেল না, কী বলবে? অনেকক্ষণ পর একজন সাহস করে বলল, হযরতের অনেক কষ্ট হয়েছে। তিনি বললেন, এটা তো আমি জানি। বলার কী প্রয়োজন ছিল? তখন পুরো মজমা আবার চুপ হয়ে গেল। লোকেরা এসে চুপ করে বসে থেকে চলে যেতে লাগল।

হযরত হাজী সাহেবের ইন্তিকালে হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) এতো ব্যথা পেয়েছেন যে, খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কেউ কিছু বলার সাহস করছিল না। হযরত থানবী (রহ.) বলেন, আমিও ওই সময় ওখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমিও ভেবে পাচ্ছিলাম না, কী বলব। শেষ পর্যন্ত চুপ করেই বসে থাকলাম। কিন্তু এতো কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর আমলে কোনো পরিবর্তন আসেনি। নফল আমল আগের মতোই যথারীতি চলতে লাগল। এটি আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্কের নির্দশন।

## মিসকিনের তাবাররুক

একবার হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সুস্থ হওয়ার পর তাঁর ছেলে শুকরিয়াস্বরূপ অনেক লোককে দাওয়াত করেন। হযরত তাঁর এক খাদেমকে বললেন, গরিব লোকেরা খাওয়ার পর তাদের বেঁচে যাওয়া খাবার আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি সেগুলোকে তাবাররুক হিসেবে খাব। একথা মনে করো না যে, তাদের শরীর অপবিত্র নয়, তাদের কাপড় পরিষ্কার নয়। আমি এ খাবারকে তাবাররুক এজন্য বলেছি যে, এরা মুমিন বান্দা। এরা আল্লাহর প্রিয় লোক। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে-

يَا عَائِشَةُ، قَرِّبِي الْمَسَاكِيْنَ

'হে আয়েশা! তুমি মিসকিনদের ঘনিষ্ঠ হও।'

তারপর ওই খাবার হযরতের কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি তা খুব আগ্রহভরে খেলেন। এর দ্বারা তাঁর বিনয় এবং সুন্নাতের অনুসরণ প্রকাশ পায়।

## বিনয়

একবার হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর কাছে এক নামী-দামী লোক মেহমান হন। খাওয়ার সময় হযরত তাকে নিজের সাথে বসালেন। এ অবস্থা দেখে অন্যান্য সাধারণ পর্যায়ের মেহমানগণ পিছনে গিয়ে বসলেন। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বিষয়টি টের পেয়ে তাদের ডেকে বললেন, আপনারা পিছনে সরে পড়লেন কেন? আমার সাথে নামী-দামী লোক বসেছে এজন্য আপনারা সরে বসেছেন? না, আমি তার মতো আপনাদেরও সম্মানিত মনে করি। তারপর তিনি সবাইকে নিয়ে একসাথে খাবার খেলেন।

একবার তিনি হাদীছ পড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। একটু পর বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। ছাত্ররা বৃষ্টি থেকে কিতাব হেফাযত করার

জন্য বারান্দায় সরে দাঁড়াল। তারপর তারা কিতাব রেখে জুতা উঠানোর জন্য চলে গেল। বারান্দায় এসে তারা দেখতে পেল, হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) তাদের জুতা উঠিয়ে নিয়ে আসছেন। ছাত্ররা হতবাক হয়ে বলল, হযরত! আপনি এ কী করলেন? তিনি জবাব দিলেন, যারা ক্বালাল্লাহ ও ক্বালার রাসূলু পড়ে, রশীদ আহমাদ তাদের জুতা উঠাবে না তো কী করবে?

## এক ডাকাতের ঘটনা

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) এক ডাকাতের কাহিনী বর্ণনা করেন। সে এক বসতিতে গিয়ে স্বীয় বেশভূষা পরিবর্তন করে আস্তানা গেড়ে আল্লাহ-আল্লাহ যিকির শুরু করল। লোকেরা তাকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করল। অনেকে তার মুরীদ হলো। যিকির-মুরাকাবা সবই যথারীতি চলতে লাগল। অনেক মুরীদ সাহিবে মাকাম হয়ে গেল। তারা তাদের শায়খের অবস্থা মুরাকারায় দেখতে চাইল। কিন্তু কোনো কিছু দৃষ্টিগোচর হলো না। তারা শায়খকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে শায়খ তাঁর অতীত জীবনের সব কিছু বিস্তারিত বলে দিলেন। তিনি বললেন, আমি ডাকাত ছিলাম। তখন সবাই মিলে শায়খ এর জন্য দু'আ করলে আল্লাহ শায়কেও সাহিবে মাকামের মর্যাদা দান করেন।

## বায়'আতের বরকত

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর খেদমতে এক গ্রাম্যলোক মুরীদ হওয়ার জন্য এল। হযরত তাকে বায়'আতের বাক্য পড়িয়ে দিলেন। তারপর তাকে তাওবা করালেন। লোকটি হযরতকে বলল, আমাকে আফিম খাওয়া থেকে তাওবা করালেন না? হযরত বললেন, আমি কি জানি, তুমি আফিম খাও? আচ্ছা, বলো, তুমি কতটুকু খাও? যে পরিমাণ খাও, তা আমার হাতে রাখো। কিন্তু সে আফিমের বোতল পকেট থেকে বের করে দূরে নিক্ষেপ করে দিয়ে বলল, মৌলবী! তাওবা যখন করেছি, তো এখন আর কেন খাব? তারপর সে ঘরে ফিরে গেলে আমাশয় শুরু হলো। সুস্থ হয়ে দ্বিতীয়বার হযরত গাঙ্গুহির খেদমতে এল। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, কে? লোকটি বলল, আমি আফিমখোর। তারপর সে দুই রুপি হাদিয়া পেশ করল। হযরত তার খুশির জন্য তা গ্রহণ করলেন। গ্রাম্যলোকটি বলল, হযরত! আপনি তো জিজ্ঞাসা করলেন না, এটা কিসের রুপি। হযরত বললেন, তুমি নিজেই বলো। সে বলল, এটা আফিমের রুপি। হযরত বললেন, কিভাবে? সে বলল, প্রতি মাসে দুই রুপির আফিম খেতাম। তাওবা করার পর এখন দুই রুপি জমা থাকে। আমি আমার নফসকে বললাম, তোমার জন্য এই রুপি আর

খরচ করব না। তাওবা করার সময় এই দুই রুপি আপনাকে হাদিয়া দেওয়ার নিয়ত করেছি। তাই আপনাকে হাদিয়া দিলাম। এ হলো বায়'আতের বরকত।

## শায়খের পরিচয়

হযরত গাঙ্গুহি বলেন, যেব্যক্তি মূর্খ হয়, সে নামের জন্য আমার সাথে সম্পর্ক গড়বে; তারপর সামান্য কোনো বিষয়ে তাকে বুযুর্গির বিপরীত মনে করে খারাপ ধারণা করে ফেলবে। এজন্য নাদান লোকের বন্ধুত্ব বেশি দিন টিকে না। মূর্খতার কারণে তার অধিকাংশ দৃষ্টি দোষের দিকে হবে। ফলে সে ভালো গুণগুলো সম্পর্কে অবগত হতে পারে না। যে শায়খকে চিনতে পারে, তার মহব্বত সত্য ও বাস্তব হয়।

## চেলা ও গুরু হওয়ার বাসনা

হযরত গাঙ্গুহি বলেন, আজ লোকেরা মুরীদ হয় না – গুরু হয়। এক লোক গুরুর নিকট গিয়ে বলল, আমাকে আপনার চেলা বানিয়ে নিন। সে বলল, এ কঠিন ব্যাপার। তখন সে বলল, তাহলে গুরু-ই বানিয়ে দিন।

## সরলতা

একবার মাওলানা ইয়াকুব সাহেব (রহ.) পায়দল সফর করে গাঙ্গুহ পৌঁছেন। তখন নামাযের জামাত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। লোকেরা দেখে খুশিতে বলতে লাগল, মাওলানা এসে পড়েছেন। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) তা শুনতে পেয়ে যখন মাওলানা ইয়াকুবকে দেখলেন, তখন তিনি মেহরাব থেকে পিছনে কাতারে দাঁড়িয়ে মাওলানা ইয়াকুবকে নামাযে ইমামতি করার জন্য বললেন। মাওলানা ইয়াকুব সোজা মেহরাবে গিয়ে দাঁড়ালেন। পায়দল সফর করার কারণে তার পা ও পাজামার নিচের অংশে ময়লা ও ধুলাবালি ছিল। হযরত গাঙ্গহী (রহ.) স্বীয় রুমাল দ্বারা তার পা মুছে পরিষ্কার করে দিলেন এবং কাতারে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, এখন নামায পড়ান। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) পরে বলেছিলেন, মাওলানা ইয়াকুব অস্বীকার না করে আমার আবেদন সরাসরি কবুল করেছেন। এতে আমি খুব আনন্দিত হয়েছি।

## দীন ও দুনিয়ার ক্ষতি

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর কাছে এক মুরীদ আরজ করল, হযরত! আমি আলো দেখতে পাই, যার মধ্যে সোনালি অক্ষরে কিছু লেখা থাকে। হযরত

বললেন, তুমি যিকির ও আমল ছেড়ে আগে চিকিৎসা করাও। তোমার মস্তিষ্কে শুষ্কতা রয়েছে। এটা মাতালতার পূর্বাভাস। কিন্তু ওই মুরীদ হযরতের কথা মানল না, চিকিৎসাও করাল না। অবশেষে সে পাগল হয়ে গেল। সে উলঙ্গ হয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) তাকে ভালোভাবে খাওয়ার কথা বলেছিলেন এবং এও বলেছিলেন যে, হাদীছে আছে–

اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِيْ كُلٍّ خَيْرٌ

'শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের চেয়ে উত্তম। আর সবটার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে।'

## নামাযে ক্রন্দন

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) যখন আল্লাহর কাছে দু'আর জন্য হাত তুলতেন অথবা নফল নামাযে কেরাত পড়তেন। তখন তাঁর অবস্থা এমন হতো যে, ক্রন্দনের দরুণ তার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যেত যেন শ্বাস আটকে যাচ্ছে। অঝোর ধারায় চোখ থেকে অশ্রু ঝরত। জায়নামাযে তার ফোটা গড়িয়ে পড়ত। মৌলবী আবদুর রহমান বলেন, আমি এক রমযানে গাঙ্গুহ যাই। তারাবীহর নামাযে হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) কুরআন তেলাওয়াত করছেন। একরাতে তার সাথে নামাযে শরিক ছিলাম। যখন ভয়-ভীতি সম্পর্কিত আয়াত এল, তখন কারো শরীরে প্রচণ্ড কাঁপুনি এসে গেল আবার কেউ কাঁদতে লাগল। অথচ তাদের অধিকাংশই আরবি বোঝে না। পরের রুকুতে যখন আল্লাহর রহমত সম্পর্কিত আয়াত পড়া শুরু করলেন, তখন পুরো জামাতের মধ্যে স্থিরতা ও প্রশান্তি প্রকাশ পেল।

## নামায কাজা করতে অস্বীকৃতি

শেষ বয়সে হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ডাক্তার তাঁকে কিছুদিনের জন্য বালিশের ওপর সিজদা করে নামায পড়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি এভাবে নামায পড়তে অসম্মতি জানালেন।

## রিয়াজত ও মুজাহাদা

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর কঠোর রিয়াজত ও মুজাহাদা দেখে অন্যদের মায়া লেগে যেত। সত্তর বছর পার হওয়ার পরও তিনি সারা দিন রোযা এবং মাগরিবের পর বিশ রাকাত নামাযে দুই পারার কম তেলাওয়াত করতেন না। রুকু ও সিজদা এতো দীর্ঘ করতেন যে, অন্যরা সন্দেহে পড়ে যেত। নামাযের

পর খাওয়া ও অন্যান্য প্রয়োজন পুরণের জন্য আসা-যাওয়ার পথে কুরআন তেলাওয়াত করতেন।

## মুরশিদের পক্ষ থেকে পরীক্ষা

থানাভবনে থাকাকালীন হযরত হাজী সাহেব হযরত গাঙ্গুহির ধৈর্যের পরীক্ষা নেন। তিনি নিজেই তা বর্ণনা করেন, থানাভবনে কয়েকটা দিন অতিবাহিত করার সময় আমার ভরণ-পোষণের বোঝা হাজী সাহেবের ওপর এসে পড়েছে। এ বিষয়টি আমি মানতে পারলাম না। অন্য জায়গায় এর ব্যবস্থা করতে পারলাম না। হাজী সাহেবের কাছে বিদায় চাইলে তিনি তা গ্রহণ করলেন না। তিনি বললেন, আরো কয়েকদিন থাকো। আমি চুপ হয়ে গেলাম। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, যেভাবেই হোক খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। একটু পর হাজী সাহেব এসে বললেন, মিয়া রশীদ! খাওয়ার চিন্তা করো না। তুমি আমার সাথে খাবে। দুপুরে খাওয়ার সময় একটা পাত্রে সাধারণ তরকারি ছিল এবং অপর পাত্রে সুস্বাদু কোপ্তা ছিল। তিনি খাওয়ার সময় আমাকে তার সাথে বসিয়ে কোপ্তার পাত্র আমার থেকে দূরে রাখলেন। তখন যামেন সাহেব এখানে এলেন। হাজী সাহেব তাকে বললেন, রশীদের হাত বাড়িয়ে খেতে কষ্ট হচ্ছে। এই পাত্রটা কেন এদিকে রাখছ না? হাজী সাহেব জবাব দিলেন, এটি-ই গনিমত যে, সাথে বসিয়ে খাওয়াচ্ছি। মন তো চাচ্ছিল, চোর-চামারদের মতো আলাদা বসিয়ে খাওয়াতাম। তখন হাজী সাহেব আমার দিকে তাকালেন। তিনি বুঝলেন, আমার একথায় কোনো পরিবর্তন হয়নি। আমি বুঝলাম, তিনি যা বলছেন, তা-ই সত্য। এই দরবারে রুটি পাওয়াও অনেক বড় গনিমত। তারপর হাজী সাহেব আর কোনো পরীক্ষা নেননি।

## কারো জন্য বদ দু'আ করতেন না

কোনো এক লোকের কারণে একবার হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) খুব কষ্ট পেলেন। মাওলানা খলীল আহমাদ (রহ.) তাঁকে আরজ করলেন, হযরত! আপনি এ কারণে বদ দু'আ দিবেন না। একথা শুনে হযরত ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, তাওবা! তাওবা! মুসলমান কি কারো জন্য বদ দু'আ করে? আসতাগফিরুল্লাহ!

## অক্ষমতা ও বিনয় প্রকাশ

একবার হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর খাদেমগণ তাঁর শরীর টিপে দিচ্ছিল। তখন এক সরল প্রকৃতির গ্রাম্যলোক বলল, হযরত! আপনার তো এতে খুব

আরাম হচ্ছে। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বললেন, জি; আরাম লাগছে। তবে এর মধ্যে আমার কোনো অহংকার নেই। আমি কাউকে ছোট মনে করছি না। গ্রাম্যলোকটি বলল, তাহলে খেদমত নিতে কোনো সমস্যা নেই।

## হালাল উপার্জনের চেষ্টা

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) ছাত্র যমানা থেকে ফারেগ হওয়ার পর নিজের বোঝা কারো ওপর ফেলতে চাইতেন না। তখন একস্থান থেকে সাত রুপি বেতনে কুরআনের তরজমা পড়ানোর প্রস্তাব এল। তিনি হাজী সাহেবের কাছে এজাযত চাইলেন। তিনি নিষেধ করলেন। বললেন, একে ফিরিয়ে দাও। আরো বেশির প্রস্তাব আসবে। কিছুদিন পর সাহারানপুরের প্রধান নবাব শায়েস্তা খান তার নিজের বাচ্চাকে পড়ানোর জন্য মাসিক দশ রুপি বেতনে প্রস্তাব নিয়ে এল। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) তা গ্রহণ করলেন। হাজী সাহেব তা জেনে বললেন, যদি সবর করতে, তাহলে আরো বেশি বেতনের প্রস্তাব পেতে। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) ছয় মাস এই দায়িত্ব পালন করলেন, যাতে হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা হয়।

## আখলাকের উচ্চতা

একবার হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর কাছে বায়'আত হওয়ার জন্য রায়পুর থেকে এক আলেম এলেন। তার নাম ছিল ওয়াহহাজুদ্দীন। তার পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। রাতে ঘুমের মধ্যে তিনি টের পেলেন, কে যেন তার পা টিপে দিচ্ছে। তিনি প্রথমে মনে করলেন, হযরত মনে হয় কোনো খাদেমকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু তিনি চুপিচুপি চোখ খুলে বুঝতে পারলেন, হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) নিজে পা টিপে দিচ্ছেন। তখন তিনি ধড়মড় করে উঠে নিচে নেমে এসে বললেন, হযরত! এ কী কাণ্ড? হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) বললেন, ভাই! সমস্যা কী? আপনি তো অনেক ক্লান্ত। আপনি শুয়ে থাকুন; আরাম হবে। আলেম বললেন, হযরত! আমাকে মাফ করবেন। আমি আপনাকে দিয়ে পা টিপিয়ে আরাম নিতে আসিনি।

## হযরতের প্রভাব

মুফতী মাহমুদ (রহ.) বলেন, এক কালেক্টর গাঙ্গুহতে এসে এই অভিব্যক্তি প্রকাশ করল যে, হযরত গাঙ্গুহি শামেলির ময়দানে জিহাদ করেছেন। আমি তার সাথে একটু সাক্ষাত করতে চাই। সে তার বাংলো থেকে বের হলো। এদিকে হযরত বারান্দা থেকে উঠে কামরায় চলে গেলেন এবং কামরার দরজা

বন্ধ করে দিলেন। কালেক্টর সাহেব এসে কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে থেকে চলে গেলেন। এর মধ্যেই হযরত কামরা থেকে বাইরে তাশরীফ আনলেন। তখন খাদেম বললেন, প্রশাসন দারুল উলূমের উপর অনেক ক্ষুদ্ধ। আপনি যদি কালেক্টরের সাথে একটু সাক্ষাত করতেন, তাহলে তা দারুল উলূমের জন্য অনেক ভালো হতো এবং অমঙ্গল থেকে বাঁচা যেত।

হযরত বললেন, ঠিক আছে; চলো। তখন হযরত পালকিতে উঠে কালেক্টরের বাংলোয় গেলেন। ওই সময়কার বড়-বড় ওলামায়ে কেরাম হযরতকে পালকি বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। পালকি বাংলোয় পৌঁছলে কালেক্টর বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে নিজেই মুসাফাহার জন্য হাত বাড়ালেন। হযরত তার সাথে মুসাফাহা করলেন। কিন্তু দৃষ্টি নিচের দিকে রাখলেন। তার দিকে তাকালেন না। কালেক্টর বললেন, আমাকে কিছু নসিহত করুন। হযরত বললেন, 'ইনসাফ কর এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া কর।' একথা বলে তিনি পালকিতে উঠে চলে এলেন। তখন ওই কালেক্টর কাউকে জিজ্ঞেস করল, এই ব্যক্তিটি কে; তাকে দেখে আমার অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে গেল? তখন তাকে বলা হলো, ইনি সেই মাওলানা রশিদ আহমাদ, যার সাথে তুমি সাক্ষাত করতে চেয়েছিলে।

## সুন্নতের অনুসরণ

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর সুন্নতের অনুসরণ অন্যদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। একবার লোকেরা বলল, মসজিদ থেকে বাম পা দিয়ে বের হয়ে আগে ডান পায়ে জুতা পরিধান করা সুন্নত। দেখুন, হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) এ দুই সুন্নত একসাথে কিভাবে আদায় করেন। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) মসজিদ থেকে বাম পা আগে বের করে দিয়ে তা জুতার ওপর রাখলেন। তারপর আগে ডান পায়ে জুতা পরে তারপর বাম পায়ে জুতা পরেন।

## সংবেদনশীল স্বভাব

তাযকেরাতুর রশীদ কিতাবে লিখা আছে, হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) প্রখর ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁর নামে প্রায় ২০টি বিস্ময়কর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরি (রহ.) লিখেন, ভাই আবদুর রহমান বলতেন, আমার চায়ের প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। নিজহাতে চা বানাতেন। হযরত চা পান করার সময় বলতেন, চায়ের মধ্যে কিছু পানির স্বাদও অনুভূত হয়। একদিন আমি মনে-মনে ভাবলাম, আজ চা এমনভাবে বানাব, যাতে পানির বাষ্প সম্পূর্ণ চলে যায়। কয়েক ঘন্টা চা জ্বাল দিয়ে

হযরতকে পান করতে দেই। হযরত ওই চা পান করে বলছেন, এর মধ্যেও পানির ক্রিয়া আছে। আমি বললাম, হযরত! এখন সন্দেহ হচ্ছে হয়তো। আমি পরে ভিতরে গিয়ে জানতে পারলাম, ঘরের লোকেরা এর মধ্যে কিছু পানি ঢেলে দিয়েছিল। যতদিন হাবীবুর রহমান হযরতকে চা পান করিয়েছেন, ততদিনে অনেকবার এমন হয়েছে যে, হযরত চা মুখে নিয়ে বলেছেন, এর মধ্যে তরল পানির গন্ধ আছে। প্রায় প্রতিদিনই হযরত হাবীবুর রহমান চা ভালোমতো জ্বাল দেওয়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এরপরও হযরত বলতেন, পানির আলামত পাচ্ছি।

শেষে তিনি খুব পেরেশান হয়ে গেলেন যে, আসল ঘটনা কী? এমন তো হওয়ার কথা নয়। পরে তিনি বুঝতে পেরেছেন, যে পেয়ালায় চা ঢালতেন, সেই পেয়ালা ধোওয়ার পর ভালো করে শুকিয়ে নেওয়া হতো না। তো পরের দিন চায়ের পেয়ালা ভালো করে শুকিয়ে নিয়ে তাতে চা ঢেলে হযরতের সামনে পেশ করলেন। তখন হযরত চা পান করে বললেন, হাঁ, আজ চায়ে পানি ছিল না।

হযরতের মেহমান বারান্দায় বসে খাবার খেত। খাওয়া শেষ হলে দস্তরখান তুলে বিছানা ঝেড়ে দেওয়া হতো। হযরত ওই বিছানায় বসে বলে দিতেন, অমুক খাবারের ঘ্রাণ পাচ্ছি। অর্থাৎ– যে খাবার একটু আগে এখানে খাওয়া হয়েছে, তা তিনি বলে দিতে পারতেন। একদিন খাওয়ার সময় তিনি বললেন, এর মধ্যে ধনেপাতার ঘ্রাণ পাচ্ছি। অথচ অন্য কেউ টের পেল না। পরে জানা গেল, পাতিলে কয়েকটা ধনেপাতা দেওয়া হয়েছিল।

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর সূক্ষ্মভাবে আঁচ করতে পারার এমন অনেক ঘটনা রয়েছে, যা দেখা ব্যতীত অনেক সময় বিশ্বাস হতে চায় না। একবার জুমার পর উপস্থিত অনেক লোক হযরতের সামনে বসা ছিল। তখন মাওলানা ইয়াহয়ার ছোট ভাই মুহাম্মদ ইলিয়াস চুপি-চুপি এসে এক কোণে বসে পড়ল। তখন তার বয়স ছিল মাত্র দশ বা বারো বছর। হঠাৎ হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) ঘাড় উঠিয়ে বললেন, বাচ্চার শ্বাস আসছে। তখন কেউ বলল, হযরত! মৌলবী ইলিয়াস এসেছে।

একবার ফজলে হকের ছেলে ইকরামুল হক মাগরিবের পর হযরতের খেদমতে এল। হযরত এ বিষয়ে জানতেন না। খাওয়ার সময় হলে খাওয়ার রুমে যেতে-যেতে যখন ইকরামুল হকের কাছাকছি হলেন, তখন হযরত দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, নম্বরদারের মতো গন্ধ আসছে। কেউ একজন বলল, হযরত! নম্বরদার ফজলে হকের ছেলে ইকরাম এসেছে।

## নামাযের আগ্রহ ও গায়েবি নিরাপত্তা

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর সাড়ে ছয় বছর বয়সে তাঁর থেকে একটি কারামত ও তাওয়াক্কুলের অবস্থা প্রকাশ পায়, যা আল্লাহর কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার স্বাক্ষ্য দেয়। তিনি শৈশবকাল থেকেই নামাযের পাবন্দ ছিলেন। নামাযের সময়ের প্রতি তিনি খুব খেয়াল রাখতেন। একদিন বিকালে হাঁটতে-হাঁটতে তিনি এলাকার বাইরে চলে গেলেন। তখন সূর্য ডোবার সময় হয়ে গেছে। তিনি বুঝতে পারলেন, মাগরিবের সময় হয়েছে। ফুলের দুটি ছড়া ছিঁড়ে দ্রুত ঘরে এসে তা মায়ের কাছে রেখে মসজিদে গেলেন। মসজিদে জামাত শুরু হয়ে গিয়েছিল। ওযু করার জন্য লোটা নিয়ে দেখেন, পানি নেই। কুয়ায় পানি আনতে গেলেন। কিন্তু ভয়ে রশি পায়ে আটকে যাওয়ার কারণে জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারলেন না। তার হাত-পা ফুলে গেল। ফলে নিজেকে সামাল দিতে না পেরে তিনি কুয়ায় পড়ে গেলেন।

মসজিদে নামাযরত লোকেরা টের পেল, কেউ কুয়ায় পড়ে গেছে। ইমাম সাহেব দ্রুত নামায শেষ করলেন। পরে সমস্ত নামাযী দৌড়ে কুয়ার পাড়ে এসে পড়ল। ভিতর থেকে আওয়াজ আসছিল, ভয় পাবেন না, আমি ঠিক আছি। তিনি পানি তোলার বালতির মধ্যে বসে পড়লেন। যখন তাকে বের করে আনা হলো, তখন সবাই দেখল, তার পায়ের ছোট আঙুলে সামান্য আঁচড় লেগেছে!

## হযরতের হাতে শিফা

একবার হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর মায়ের খালা কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। পেটে ব্যথা হয়েছিল। হাকীম মুহাম্মদ তাকী তার চিকিৎসক ছিলেন। তিনি ওষুধ দিলেন। কয়েকদিন চলে যাওয়ার পরও রোগ কমল না। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর বয়স তখন ২২ বছর। মায়ের খালা নাতিকে বললেন, তাকীর ওষুধে কোনো ফায়দা হচ্ছে না। বেটা! তুমি তো আলেম হয়েছ। তুমি কিছু একটা করো। তুমি আমাকে ওষুধ বলে দাও। হযরত গাঙ্গুহি তখন কোনো কিছু না বলে চুপ রইলেন। কিন্তু নানীজানের কষ্ট দেখে ভাবলেন, কিছু একটা করা দরকার। তিনি সেখান থেকে চলে এসে 'মিযানুত্তিব' কিতাব থেকে পাকস্থলিবিষয়ক অধ্যায়টি খুলে অধ্যয়ন শুরু করলেন। তারপর তিনি নানীজানের চিকিৎসা শুরু করলেন। আল্লাহর রহমতে তিনি সুস্থ হলেন। ফলে মহিলাদের মধ্যে এবং পুরান রোগীদের ধারণা বদ্ধমূল হলো, হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর হাতে আল্লাহ তা'আলা শিফা রেখেছেন। কোনো রোগী এলে তিনি উপরোক্ত কিতাব খুলে ভালোভাবে দেখে ব্যবস্থা বলে দিতেন।

রোগীও ভালো হয়ে যেত। তিনি সেবা মনে করে এভাবে চিকিৎসা করতে লাগলেন।

## দৃঢ়তা

মুযাফফর নগরে জেলখানায় হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) প্রায় ছয় মাস ছিলেন। ওই সময় হযরতের মেজাজে দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে কোনো দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়নি। কোনো নামায তার ওই সময় কাজা হয়নি। ওই সময় অন্যান্য বন্দীরা হযরতের ভক্ত হয়ে গেল। অনেকে তার মুরিদ হয়েছে। তিনি জেলখানার কুঠুরিতে জামাতের সাথে নামায আদায় করতেন। প্রতিদিন জেলখানায় বয়ান, নসীহত ও দাওয়াত দিতেন। কুরআনের তরজমা করে বন্দীদের শোনাতেন। তাঁকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় যা প্রশ্ন করা হতো, তিনি সরাসরি সব বলে দিতেন। কখনও তিনি জান বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করেননি। তাঁকে হাকীম ধমকিয়ে বলতেন, তুমি সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে সন্ত্রাসীদের দলে যোগ দিয়েছ; তোমাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে। তিনি এর জবাবে বলতেন, কোনো অসুবিধা নেই। অবশেষে ছয় মাস পর তিনি জেলখানা থেকে মুক্তি লাভ করেন।

## বোঝানোর অপূর্ব দক্ষতা

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) হাদীছ পড়ানোর সময় খুব সহজ ও সাবলীল ভাষায় অর্থ বলে দিতেন। ছাত্রদের প্রশ্নে তিনি কোনো রকম পেরেশান হতেন না। একবার এক ছাত্র ইল্‌মে কেরাত পড়ার সময় عطارہ শব্দ এল। বুঝে ফেলল, এটি আতর শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে এবং সে এর অর্থ বোঝার কারণে সামনে পড়তে লাগল। এক পাঠান ছাত্র বলল, হে ক্বারী! عطارہ শব্দের অর্থ আমি বুঝিনি। তিনি বললেন, আতরবিক্রেতার বিবি। কারী সাহেব আবার পড়তে শুরু করলেন। এবার ওই পাঠান শক্তভাবে দৃষ্টি দিয়ে বলল, থামো; আমি এর অর্থ বুঝিনি। তখন হযরত উঁচু আওয়াজে বললেন, 'আতর ব্যবসায়ীর স্ত্রী' তখন পাঠান ছাত্র খুশি হয়ে বলল, হ্যাঁ, এখন বুঝেছি। এখন আগে চলো। প্রশ্নকারীর প্রশ্ন থেকে হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) কখনও আড়াল হতেন না।

## অনুসন্ধান এমনই হওয়া উচিত

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) অস্বচ্ছলতার যমানায় হারামাইন শরীফাইন হাজির হওয়ার জন্য ছটফট করতেন। তার আর্থিক অবস্থা এতো দুর্বল ছিল যে,

পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ কোনোমতে চালাতে হতো। কিন্তু প্রকৃত আগ্রহ হলে আল্লাহ উপায় করে দেন।

ডেপুটি আব্দুল হক রামপুরি হজের ইচ্ছা পোষণ করলেন। তিনি পরিবার-পরিজনের বিশাল কাফেলা সাথে নিয়ে যেতে চাইলেন। হাফেয যামেন সাহেবের এক খলীফা, যিনি ডেপুটি সাহেবের বন্ধু ছিলেন; তার নাম হচ্ছে হাকীম জিয়াউদ্দিন; ডেপুটি সাহেব তাকেও সাথে নিলেন। হাকীম জিয়াউদ্দিন হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর আশেক ছিলেন। হাকীম জিয়াউদ্দিন ডেপুটি সাহেবকে হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর কথা বললে ডেপুটি সাহেব বললেন, আমাদের আরো খুশি হওয়া দরকার যে, হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর মতো বুযুর্গ আলেম ও সুন্নতের অনুসারী মহান ব্যক্তিত্ব আমাদের সাথে হজে শরিক হবেন। তিনি হযরত গাঙ্গুহিকেও নিজের সাথে নিলেন। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর মামাত ভাই এবং ছোটবেলার বন্ধু আবুন নসর এ খবর জানতে পেরে স্বীয় আসবাবপত্র বিক্রি করে স্বস্ত্রীক হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর সাথে হজে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। তখনকার দিনে হজের সফর এতো সহজ ছিল না। কখনও-কখনও এমন হতো যে, তিন চার মাস লাগাতার সমুদ্রে কাটাতে হতো। হজে রওনা হওয়ার পর সামুদ্রিক সফরের সময় প্রচণ্ড তুফান এল। সমস্ত মুসাফির ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কেউ মরবে, এটা তো হয় না। আমরা তো কারো ডাকেই যাচ্ছি। নিজেরা তো যাচ্ছি না। ঝড় থেমে যাওয়ার পর ক্যাপ্টেন নির্ণয়ঘড়ি দেখে বলল, আল্লাহর প্রশংসা ও শুকরিয়া যে, তিনি আমাদের আট দিনের সফরকে তিন দিনে পার করে দিয়েছেন।

## চায়ে বরকত

মৌলবী শরীফ হোসাইন হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর একজন প্রিয় শাগরিদ ছিলেন। হযরত দেওবন্দে তাশরীফ নিয়ে আসার পর তিনি খুব ভালোভাবে চা বানিয়ে একটা পেয়ালায় করে হযরতের সামনে পেশ করলেন। তখন দেখলেন, হযরতের সামনে অনেক লোক বসা। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, কী করা যায়! হযরত গাঙ্গুহি বললেন, শরীফ! এক পাশ থেকে পান করানো শুরু করো। শরীফ হোসাইন নির্দেশ শুনে পেরেশান হয়ে গেলেন। এতো অল্প চা, এতোজনের সামনে কিভাবে পেশ করা যায়। তিনি ডান হাতে পরিবেশন শুরু করলেন। অনুমানিক ২৫ জন লোককে পান করানোর পর পাত্রটা খুলে দেখতে পেলেন, এখনও চা বাকি আছে। অথচ ওই পাত্রে ছয়জনের চা ছিল।

## সূর্যের সাথে ঘড়ির টাইম মেলানোর ঘটনা

হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর নিয়ম ছিল, তিনি প্রতিদিন বারোটার সময় তার কামরায় ঘড়ির টাইমকে সূর্যের সাথে মেলাতেন। একবার এরকম হলো যে, লাগাতার কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়াতে সূর্য দেখা গেল না। যেদিন সূর্য দেখা গেল, সেদিন আবার কখনও বৃষ্টি, কখনও রৌদ্র। তো ওই দিন তিনি বারোটা বাজার কিছুক্ষণ আগে ঘর থেকে তারশীফ নিয়ে আসলেন এবং মৌলভী আলি রেযাকে বললেন, বারোটা বাজলে আমাকে খবর দিয়ো। একথা বলে তিনি শুয়ে পড়লেন। বারোটার সময় ঘনিয়ে এলে হঠাত একটা বড় মেঘের টুকরা এসে সূর্যকে ঢেকে নিল। তখন ওই ব্যক্তি বলল, হযরত সূর্য ডুবে গেছে। একথা শুনে তিনি উঠে বাইরে এলেন। অমনি মেঘটা মাঝখান থেকে ফাঁকা হয়ে গেল। তখন তিনি ঘড়ি মিলিয়ে নিলেন।

# শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.)

শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহ.) ১২৬৮ হিজরিতে বেরেলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা যুলফিকার আলী (রহ.) একজন বড়ো আলেম ছিলেন। তাঁর বংশধর উসমান (রাযি.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। তিনি কুরআনের কিছু অংশ এবং প্রাথমিক কিছু কিতাব মাওলানা আব্দুল লতীফের নিকট পড়েন। তিনি কুদূরী, তাহযীব এবং আরো কিছু কিতাব পড়ার সময় হযরত কাসেম নানুতবি ১২৮৩ হিজরিতে দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র ছিলেন। ১২৮৬ হিজরিতে সিহাহ সিত্তাহ শেষ করে ফারেগ হন।

হাদীছে তিনি মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.), মাওলানা ইয়াকুব নানুতবি (রহ.), মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.) এবং মাওলানা শাহ আব্দুল গনী (রহ.) থেকে সনদের এজাযত লাভ করেন। তিনি ফারেগ হওয়ার আগেই তাঁকে দেওবন্দের ওস্তাদ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। শুরুর দিকে তিনি প্রাথমিক স্তরের কিতাব পড়ান। ওই সময়ই তাঁর ইল্‌মি যোগ্যতা ও মেধার প্রকাশ পেতে থাকে। এভাবে তিনি বুখারি ও তিরমিযি পড়াতে শুরু করেন। তিনি ৪৪ বছর এর অধিক কাল তাদরীসি খেদমত করেন। এই দীর্ঘ সময় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়ে, যার সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। তাঁর স্থানীয় ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.), আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.), শিব্বির আহমাদ উসমানী (রহ.), হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.), মুফতী কেফায়াতুল্লাহ দেহলবী (রহ.), আজগর হুসাইন দেওবন্দী (রহ.), আব্দুল্লাহ সিন্দী (রহ.), এ'জায আলী (রহ.), হাবীবুর রহমান উসমানী (রহ.) এবং আব্দুশ শাযী (রহ.) প্রমুখ প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরাম বেশি উল্লেখযোগ্য।

তিনি শুরু থেকেই উত্তম স্বভাব ও ভালো আচরণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সাথে কাসেম নানুতবির মহব্বত ও সোহবত এবং রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহির সাথে তাঁর সম্পর্ক তাঁকে রূহানিয়াতের আসনে বসিয়ে দেয়। শায়খুল আরব ওয়াল আজম হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) তাঁর ইল্‌মি যোগ্যতা ও রূহানিয়াত দেখে খুশি হয়ে বায়'আত ও খেলাফত দান করেন। দরবারে রশীদিয়ার পক্ষ থেকে তিনি এই নেয়ামত লাভ করেন।

মোটকথা, তিনি নবুওতের ইল্‌ম, শরীয়ত ও তরীকতের সমুদ্র ছিলেন। যদিও তিনি অধিকাংশ সময় তালীম, তাসনীফ ও কিতাব অধ্যয়নে সময় দিতেন, কিন্তু এছাড়াও যিকির-আযকার, মুরাকাবা ও রাত্রিকালে নফল নামাযে সময় কাটাতেন। এমনকি সফর করার সময় তার আমলের রুটিনে ব্যত্যয় ঘটত না। ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের মিশনকে তিনি অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি মুসলমানদের সামরিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাতে চাইতেন। ওই সময় তিনি রেশমি রুমাল আন্দোলন শুরু করেন, যার মারকায ছিল কাবুল। এ কারণে তিনি মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টির পদক্ষেপ নেন।

১৩৩৫ হিজরিতে ইংরেজ তাঁকে গ্রেফতার করে মাল্টা পাঠিয়ে দেয়। ১৩৩৮ হিজরিতে তিনি হিন্দুস্তান আসেন। ওই সময় খেলাফতের আন্দোলন খুব তুঙ্গে ছিল। তিনি বার্ধক্য এবং অসুস্থতা সত্ত্বেও এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তখন তাঁর অসুস্থতা আরো বেড়ে যায়। তিনি ১৩৩৯ হিজরিতে দেওবন্দে ইনতিকাল করেন।

## ইল্‌মে পরিপক্বতা

একবার মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী ওয়াদাবাদের জলসায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে লোকেরা তাঁকে ওয়ায করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তিনি একথা বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, আমার ওয়ায করার অভ্যাস নেই। কিন্তু লোকেরা মানল না। অবশেষে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং একটি হাদীছ পড়লেন।

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ

'একজন আলেম শয়তানের জন্য হাজার আবেদের চেয়ে ভয়ংকর।'

সেখানে একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, এ অর্থ ভুল। তারপর উক্ত আলেম বললেন, যে সঠিক অর্থ বলতে পারে না, তার জন্য ওয়ায করা জায়েয নয়। তখন মাওলানা মাহমুদ হাসান সাথে-সাথে বসে গেলেন এবং বললেন, আমি আগে থেকেই বলছি, আমার ওয়ায করার যোগ্যতা নেই। ভালো হয়েছে, আমার কথার প্রমাণ হয়ে গেল। কিন্তু লোকেরা তা মানল না। আবার ওয়ায করতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তারপর তিনি আবার ওয়ায শুরু করলেন। ওয়ায শেষ করার পর তিনি ওই আলেমকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার ভুলটা কোন জায়গায় ছিল? আলেম

বললেন, اَشَدُّ। শব্দের অর্থ اَضَرُّ হবে না। এর অর্থ হবে اَثْقَلُ। মাওলানা মাহমুদ হাসান তখনই বললেন, ওহী সম্পর্কিত হাদীছে এসেছে–

يَأْتِيْنِى مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ اَشَدُّ عَلَىَّ

'ওহী আমার উপর ঘন্টার আওয়াজের মতো নাযিল হতো, যা আমার কাছে ভারী মনে হতো।'

এখানে কি اَضَرُّ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। একথা শুনে ওই আলেম চুপ হয়ে গেলেন।

## শেষ পরিণতি সম্পর্কে ভয়

শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহ.) মাল্টায় বন্দি থাকাবস্থায় একদিন বসে-বসে কাঁদছিলেন। সাথীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি ভয় পেয়ে গেলেন? তিনি বললেন, আমি ভয় পাওয়ার কারণে কাঁদছি না; বরং এ কারণে কাঁদছি যে, আমরা যা কিছু করছি, তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে কিনা।

## ঈসায়ী পাদ্রীর সাথে বিতর্ক

শায়খুল হিন্দ বলেন, একবার এক খৃষ্টান তার্কিক দেওবন্দে এল। দেওবন্দ ষ্টেশনের কাছাকাছি এক বাগানে তার থাকার ব্যবস্থা হলো। শায়খুল হিন্দ (রহ.) এ খবর জানতে পেরে মুনাযার জন্য আগমন করলেন। উক্ত খৃষ্টান তার্কিক বলতে লাগল, ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কালিমা ছিলেন। মাওলানা দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর কালিমার অর্থ কী এবং তা কত প্রকার? ঈসা আলাইহিস সালাম কোন প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? এ প্রশ্ন শুনে ওই খৃষ্টানের হুশ চলে গেল। যখন তার স্ত্রী তাঁবু থেকে দেখতে পেল, তার স্বামী জবাব দিতে পারছে না, তখন তার স্ত্রী কাগজে লিখে পাঠাল, বিতর্ক বন্ধ করে দিন। তারপর ওই খৃষ্টান বিতর্ক বন্ধ করে চলে গেল।

## দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা

শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহ.) মাল্টার কারাজীবন থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে আসার পর একরাতে ঈশার নামায আদায় করে দারুল উলূম দেওবন্দে তাশরীফ আনেন। ওই সময় সেখানে ওলামায়ে কেরামের বিশাল মজমা হচ্ছিল। তখন তিনি বললেন, আমি মাল্টার বন্দীজীবন থেকে ২টি বিষয় শিখতে পেরেছি। একথা শুনে মজমার সবাই তাঁর দিকে মনোযোগী হলো। সবাই ভাবতে লাগল, হাজার-হাজার আলিমের এই ওস্তাদ ৮০ বছর যাবত

দরস দেওয়ার পর জীবনের শেষ বয়সে নতুন যে জ্ঞান শিখলেন, তা কী? তখন মাহমুদ হাসান (রহ.) বললেন, জেলের বন্দীজীবন থাকাকালীন আমি চিন্তা করেছি, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে এতো অধঃপতন কেন। আমি এর দুটি কারণ খুঁজে পেয়েছি।

১. মুসলমান জাতি কুরআন ছেড়ে দিয়েছে।

২. মুসলমানদের পারস্পরিক ও গৃহবিবাদ।

এজন্য আমি মাল্টা থেকে প্রতিজ্ঞা করেছি, বাকি যিন্দেগি কুরআন শরীফের প্রচার-প্রসারে ব্যয় করব। বাচ্চাদের জন্য শাব্দিক শিক্ষা এবং বড়দের জন্য ব্যাপকভাবে কুরআন শরীফের অর্থ শিক্ষা করার ব্যবস্থা করব। কুরআনের শিক্ষার উপর আমল করার জন্য সবাইকে উৎসাহিত করব এবং মুসলমানদের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ কোনোভাবে সহ্য করা হবে না। কুরআনের উপর আমল শুরু হয়ে গেলে ঝগড়া-বিবাদের সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে।

## প্রিয় বস্তুর কুরবানি

আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, আল্লাহর নামে যতটুকু সম্ভব পশু যবেহ করো। মনের অবস্থা তো অন্তর দেখছে। অনেক সম্পদ আছে, যেগুলো খরচ করলে অন্তরে ব্যথা লাগে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

'ওই সময় পর্যন্ত তোমাদের পূর্ণ নেকী অর্জন হবে না, যতক্ষণ-না তোমাদের প্রিয় জিনিসকে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করবে।'[১]

প্রিয় বস্তু খরচ করার পন্থা এটা হতে পারে যে, একবার শায়খুল হিন্দ (রহ.) কুরবানি করেছিলেন। তিনি কুরবানি করার কয়েক মাস আগে একটি গাভী কিনেছিলেন। তাকে অনেক সেবা করে আসরের পরে নিজের সাথে করে জঙ্গলে নিয়ে যেতেন। কুরবানি করার আগ পর্যন্ত গরুটা এতো মোটা-তাজা হলো যে, ওই সময়ের হিসাবে এর মূল্য হয়েছে ৮০ রুপি। কিন্তু মাওলানা (রহ.) এ গাভী কাউকে না দিয়ে কুরবানির দিন যবেহ করেন। যবেহ করার পর মাওলানার অন্তরে ব্যথা লাগল এবং চোখ দিয়ে অশ্রু পড়ল। দীর্ঘ দিন নিজের সাথে রেখে লালন-পালন করার কারণে তার প্রতি মহব্বত হয়ে যায়। তিনি তার এ প্রিয় গাভীকে যবেহ করেন।

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৯২

## সুন্নতের অনুসরণ

শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর একটি মামুল ছিল, বিতর নামাযের পর বসে দু-রাকাত নামায পড়তেন। তাঁর এক শাগরেদ তাঁকে বলল, হযরত! বসে-বসে নফল পড়লে তো ছাওয়াব অর্ধেক হয়। হযরত বললেন, আমি এ জানি, কিন্তু বসে-বসে নফল পড়া নবীজি থেকে প্রমাণিত আছে। আমি তার উপর আমল করছি। তার আরেকটি মামুল ছিল, রমযানে তারাবীহর পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত কুরআন তেলাওয়াত শুনতেন। হাফেয পরিবর্তন হতে থাকত এবং হযরত নামাযের শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে তেলাওয়াত শুনতেন। যদ্দরুন কখনও-কখনও পা ফুলে যেত। তিনি এই সুন্নতের অনুসরণ পছন্দ করতেন।

## মামূলাতের পাবন্দি

নজরবন্দী থাকাকালীন হযরত বেশির ভাগ সময় আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়ে চুপচাপ থাকতেন অথবা যিকির ও তাসবীহাত আদায়ে মশগুল থাকতেন। ঈশার নামাযের পর কিছু সময় ওযীফা পড়তেন। তারপর আরাম করতেন। শীতকালে রাত দুটায় ঘুম থেকে উঠে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ওযু করে তাহাজ্জুদে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাহাজ্জুদের পর চারজানু হয়ে বসে মুবাকারা ও যিকিরে মশগুল থাকতেন।

## দুনিয়াদার থেকে বিমুখতা

শায়খুল হিন্দ (রহ.) সম্পর্কে হযরত আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন, মাওলানা মাহমুদ হাসানের মধ্যে বুযুর্গি ছাড়া আরেকটি আশ্চর্য বিষয় ছিল যে, বিত্তবানদের প্রতি বিন্দুপরিমাণও টান ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ধনী লোক কাছে বসে থাকত, ততক্ষণ হযরতের দিলে একটা বিমর্ষ ভাব বিরাজ করত। ইউসুফ আলী খানকে আমি অনেক বুর্যুগের কাছে নিয়ে যেতাম। কিন্তু তার মাওলানা মাহমুদ হাসানের প্রতি আগ্রহ বেশি ছিল। একদিন আমি নবাবকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি আপনাকে অনেক বুযুর্গের কাছে নিয়ে যাই; কিন্তু আপনার আগ্রহ মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.)-এর দিকে বেশি; এর কারণ কী? নবাব বললেন, আমি যার কাছেই যাই, তিনি আমার প্রতি খুশি হন। আমাকে খুব খাতির-যত্ন করেন। কিন্তু মাওলানা মাহমুদ হাসানের কাছে গেলে তিনি এমনভাবে ঘৃণা করেন যে, মনে হয় দুর্গন্ধময় কোনো কিছুর গন্ধ তাঁর নাকে আসছে। আমি এ দ্বারা বুঝলাম, তাঁর কাছে একমাত্র খালেস দীন আছে। তাঁর কাছে দুনিয়ার জায়গা নেই। এজন্য আমি তাঁকে বেশি ভক্তি করি।

## বিনয় প্রকাশ

মাওলানা মুফতী মাহমুদ (রহ.) দারুল উলূম দেওবন্দের বরাতে একটি ঘটনা উল্লেখ করেন যে, শায়খুল হিন্দ (রহ.) হেজাযের সফরে যাওয়ার সময় যখন গ্রেফতার হয়ে মাল্টা যান, তখন আমাদের ঘরে তিনি তাশরীফ নিয়ে আসেন। তিনি আমার দাদী মাওলানা কাসেম নানুতবির স্ত্রীকে বললেন, আম্মাজি! আমি আপনাদের কোনো খেদমত করতে পারলাম না। আমার লজ্জা হচ্ছে। এখন সফরে আছি, দয়া করে নানুতবির একজোড়া জুতা আমাকে দিন। আমার দাদী পর্দার ভিতর থেকে জুতা বের করে দিলেন। শায়খুল হিন্দ জুতাগুলো মাথার ওপর রেখে কেঁদে-কেঁদে বলতে লাগলেন, আল্লাহ! আমার ভুল-ত্রুটিগুলো আপনি ক্ষমা করে দিন।

## শায়খের প্রতি মহব্বত

হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহির পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল না। তবে তিনি সব সময় সাথে একটি পিকদান রাখতেন। এর মধ্যে তিনি কাশি বা থুতু ফেলতেন, যা শুকিয়ে লেগে থাকত। একবার শায়খুল হিন্দ ওই পিকদান গোপনে নিয়ে তার ভিতর পানি দিয়ে ধুয়ে ওগুলো খেয়ে ফেললেন। সবার আড়ালে তিনি এ কাজটি করলেন। স্বীয় শায়খের প্রতি শায়খুল হিন্দের এ পরিমাণ মহব্বত ছিল, যা হাজারো যিকির-আযকার ও রিয়াজত-মুজাহাদার চেয়েও বাতেনি অবস্থার উন্নতিতে অধিক ভূমিকা রাখত। এ বিষয়ে তাঁর অবস্থা এ রকম ছিল।

انبساط عید دیدن روئے تو

عیدگاہ ما غریباں کوئے تو

'তোমার দর্শনের মাঝে রয়েছে ঈদের আনন্দ। আমার মতো গরিবদের ঈদগাহ হলো তোমার আঙিনা।'

# আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.)

হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি ১২৯২ হিজরির ২৭ শে শাওয়াল সকালে কাশ্মিরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মাওলানা মুআযযাম শাহ কাশ্মিরের প্রসিদ্ধ খান্দানের বড় আলেম ছিলেন। আবেদ ও মুরশিদ ছিলেন। তাঁর বংশক্রম ইমাম আবুহানীফা (রহ.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। হযরত কাশ্মিরি (রহ.) চার কিংবা পাঁচ বছর বয়সে স্বীয় পিতার কাছে কুরআন পড়া শুরু করেন। ছয় বছরে ফারসির কিছু রেসালা পড়া শেষ করেন। তারপর মাওলানা গোলাম মুহাম্মদের কাছে ফারসি ও আরবির শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই মেধাবী ছিলেন। তারপর তিন বছর পর্যন্ত অনেক আলেমের কাছে পড়াশোনা করে আরবিবিষয়ক বিদ্যার্জন সমাপ্ত করেন।

তারপর ১৩০৭ হিজরিতে হিন্দুস্তানে দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন। চার বছর সেখানে থেকে তিনি ইল্‌ম অর্জন করেন। তাঁর ওস্তাদগণের মাঝে শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহ.), মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহ.), মাওলানা ইসহাক অমৃতসরি মুহাজিরে মাদানি (রহ.), মাওলানা গোলাম রাসূল হাযারুবী (রহ.) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। দেওবন্দ থেকে ফারেগ হয়ে তিনি রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর খেদমতে যান। সেখান থেকে বাতেনি ইল্‌ম অর্জন করার পর দিল্লীর মাদরাসায়ে আমীনিয়াতে মুদাররিস হিসেবে নিযুক্ত হন। তারপর কাশ্মির গিয়ে সেখানে তাদরিসি খেদমত আঞ্জাম দেন।

১৩২৩ হিজরিতে তিনি কাশ্মিরের বড়-বড় আলেমগণের সাথে হজে ভ্রমণ করেন। হজের সফরে তারাবলুস, বসরা, মসির, সিরিয়ার বড়-বড় মনীষীগণ তাঁর খুব ইজ্জত করেন এবং সবাই তাঁর যোগ্যতা ও মেধা দেখে হাদীছের সনদ প্রদান করেন। তিন বছর কাশ্মিরে থেকে তিনি দেওবন্দ গমন করেন এবং সেখানে দরসের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহ.)-এর হেজায চলে যাওয়ার পর তিনি দেওবন্দের সদরে মুদাররিস মনোনীত হন। ১৩৪৫ হিজরি পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থাকেন। তারপর জামেয়া ইসলামিয়া ডাবেলে ১৩৫২ হিজরি পর্যন্ত দরস দেন। ১৩৫২ হিজরির সফর মাসে তিনি আল্লাহ তা'আলার ডাকে সাড়া দেন।

## ইল্‌মি ইসতিফাদা

একবার হযরত কাশ্মিরি (রহ.) আঞ্জুমানে খুদ্দামুদ্দিনের বার্ষিক ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য লাহোর গেলে আল্লামা ইকবাল নিজে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন। আল্লামা ইকবাল হযরত থেকে ইল্‌মিভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য তাঁকে নিজের বড়িতে দাওয়াত দেন। আল্লামা ইকবালের অভ্যাস ছিল, তিনি কোনো মাসআলা নিয়ে কোনো বড় আলিমের সাথে আলোচনা করতে চাইলে পুরোপুরি একজন তালিবুল ইল্‌মের মতো হয়ে যেতেন। প্রত্যেক মাসআলার বিষয়কে সামনে নিয়ে এ সম্পর্কে সমস্ত কৌতূহল বা সন্দেহ খোলামেলা আলোচনা করতেন। তিনি খাওয়া থেকে ফারেগ হয়ে হযরত কাশ্মিরি (রহ.)-এর সাথে এমনই করলেন। হযরত শাহ কাশ্মিরি (রহ.) তাঁর সমস্ত আলোচনা অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে শুনলেন। তারপর উক্ত মাসআলার উপর এমনভাবে দলিল পেশ করে আলোচনা করলেন যে, আল্লামা ইকবাল ওই মাসআলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হয়ে গেলেন। এ বিষয়ে তাঁর অন্তরে আর কোনো সংশয় রইল না। তারপর তিনি খতমে নবুওতের ওপর লেকচার তৈরি করলেন, যা মোট ছটি লেকচারের অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া তিনি কাদিয়ানি আন্দোলনের ওপর প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন, যা ইংরেজীতে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধটি পাঞ্জাবে তোলপাড় সৃষ্টি করে।

## অতুলনীয় স্মৃতিশক্তি

হযরত কাশ্মিরি (রহ.)কে আল্লাহ তা'আলা অতুলনীয় মুখস্থশক্তি দান করেছিলেন। কোনো বিষয়ের কোনো কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার অধ্যয়ন করে দীর্ঘদিন পর ওই কিতাব সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে পৃষ্ঠা ও হাওয়ালাসহ এমনভাবে বলে দিতেন যে, শ্রোতারা শুনে হতবাক হয়ে যেত। কোনো কিতাবের পাঁচ-দশটি টীকা থাকলে তাও তাঁর মুখস্থ থাকত। সহীহ কিতাবসমূহের পৃষ্ঠা, খণ্ড হাওয়ালা সবই তাঁর মুখস্থ ছিল। কোনো বিষয়ের ওপর আলোচনা করার সময় তিনি অসংখ্য কিতাবের সূত্র বিনাদ্বিধায় বলে দিতেন।

তাঁর অতুলনীয় মুখস্থশক্তি হাদীছ অস্বীকারকারীদের জন্য জ্বলন্ত নমুনা ছিল। কারণ, তারা মুহাদ্দিসদের কাছে অনেক জাল ও বানানো হাদীছ থাকতে পারে বলে সন্দেহ পোষণ করত। মাদানি (রহ.) বলেন, আমাকে শাহ সাহেব বলতেন, যখন আমি কোনো কিতাবের ওপর শুধু সাধারণভাবে নজর বুলাতাম, কিন্তু এর বিষয়বস্তু ইয়াদ না করার ইচ্ছা করতাম, তারপরও ওই কিতাবের বিষয়বস্তু আমার পনেরো বছর পর্যন্ত মনে থাকত।

## মাসআলার তাৎক্ষণিক সমাধান

একবার কাশ্মিরে আলেমগণের মাঝে কোনো বিষয় নিয়ে মতানৈক্য হয়। তখনই হযরত শাহ সাহেব কাশ্মির গমন করেন। উভয় পক্ষই হযরত কাশ্মিরির সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য উপস্থিত হয়। সবাই নিজস্ব মতামত তাঁর সামনে পেশ করে। হযরত শাহ সাহেব মাওলানা ইউসুফ (রহ.)কে বললেন, আমি হিমারিয়ার ফতোয়ার পান্ডুলিপি দারুল উলূমের কুতুবখানায় দেখেছি। এর মধ্যে এই বাক্য নেই। এখন এই উভয়পক্ষই হয়তোবা তাসহীফ অথবা তাদলীস করছে। একথা শুনে উপস্থিত সবাই হতবাক হয়ে চুপ হয়ে গেল।

## মুখস্থশক্তির জন্য দু'আ

আমি কয়েকজন বুযুর্গ থেকে শুনেছি, হযরত শাহ সাহেব মাঝে-মধ্যে বলতেন, একলোক কাবার গিলাফ ধরে দু'আ করত, হে আল্লাহ! আমাকে ইবনে হাজারের মতো মুখস্থশক্তি দান করুন। তার দু'আ কবুল হলো। জামেয়া রশীদিয়ার শায়খুল হাদীছ মাওলানা আব্দুল্লাহ বলেন, ওই লোকটি এই শাহ সাহেবই ছিলেন। তিনি একথা নেয়ামতের শুকরিয়া স্বরূপ বলতেন। কিন্তু তিনি নিজের নাম গোপন রাখতেন। দেওবন্দের মুহতামিম মাওলানা হাবীবুর রহমান সর্বদা হযরত শাহ সাহেবকে দেওবন্দের ভ্রাম্যমাণ কুতুবখানা বলতেন। মাওলানা মিয়া আসগর হোসাইন বলতেন, আমার কোনো মাসআলায় সমস্যা হলে আমি দেওবন্দের কুতুবখানায় ছুটে যেতাম। যদি সেখানে সমাধান পেয়ে যেতাম, তাহলে তো ভালো। অন্যথায় শাহ সাহেবের শরণাপন্ন হতাম। তিনি যে উত্তর দিতেন, আমি তা-ই মেনে নিতাম। তিনি যদি বলতেন, আমি কোনো কিতাবে এই মাসআলা পাইনি, তাহলে ধরে নিতাম, এখন আর কোনো কিতাবে এই মাসআলা পাওয়া যাবে না। অনুসন্ধানের পর তা-ই প্রমাণিত হতো।

## ইল্‌মের কবর...!

মাওলানা ইদরীস কান্দলবী (রহ.) বলতেন, হযরত শাহ সাহেবের মুখস্থশক্তির ব্যাপারে একথা জানা ছিল যে, তিনি কোনো বিষয় দেখে নিলে বা শুনলে তা হারিয়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ হয়ে যেত। তিনি যেন স্বীয় যমানার যুহরী ছিলেন। ইমাম যুহরী বাজার দিয়ে যাওয়ার সময় কানে আঙুল দিয়ে রাখতেন। কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছিলেন, কোনো কিছু আমার কানে ঢুকলে আর বের হয় না। এজন্য বাজার দিয়ে যাওয়ার সময় বাজারের অনর্থক বিষয় যাতে কানে না আসে, তাই কানে হাত দিয়ে রেখেছি।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ (রহ.) একবার দেওবন্দের কবরস্তানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বলেছিলেন, আমি ইল্‌মের কবর অতিক্রম করছি। ওই কবরটি হযরত শাহ সাহেবের ছিল।

## ইল্‌মের আদব

হযরত শাহ সাহেবের কিতাবের প্রতি এমন আদব ছিল যে, তিনি নিজেই বলেন, অধ্যয়নের সময় কিতাবকে আমার অনুগামী করতাম না। বরং আমি নিজে কিতাবের অনুগামী হতাম। কোনো কিতাবে টীকা উল্টো করে লিখা থাকলে আমি নিজে অন্য পাশে গিয়ে তা পড়তাম। কিতাব ঘোরাতাম না। তাকে কখনও শুয়ে-শুয়ে অধ্যয়ন করতে দেখা যায়নি। অথবা এমনও হয়নি যে, কিতাবের ওপর কনুই দিয়ে টেক লাগিয়েছেন, যেন তিনি এই বাক্যের নমুনা ছিলেন– 'যতক্ষণ-না তুমি তোমার সব কিছু বিসর্জন দিবে, ততক্ষণ ইল্‌ম তোমার কাছে ধরা দিবে না।' তিনি আরো বলেন, আমার বুঝ হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত দ্বীনি কোনো কিতাব ওযু ছাড়া পড়িনি।

## এক পীরের তাওয়াজ্জুহের ঘটনা

নিজ ঘটনা শোনাতে গিয়ে তিনি বলেন, একবার আমি কাশ্মির থেকে আসার সময় রাস্তার অনেক দূর পর্যন্ত ঘোড়ায় করে যেতে হয়েছিল। পথিমধ্যে পাঞ্জাবের পীর সাহেবের এক মুরীদের সাথে দেখা হলো। সে তার পীরের প্রশংসা করতে লাগল। সে চাইল, আমিও তার পীরের কাছে যাই। পথে তার পীরের খানকা হওয়ায় আমি তার সাথে সেখানে যাই। সে বলল, নতুন কেউ এলে অনুমতি নেওয়া লাগে। সে ভিতরে গিয়ে বললে পীর সাহেব তাঁর ছেলেকে পাঠিয়ে দেন আমাকে নেওয়ার জন্য। পীর সাহেব একটি খাটের উপর এবং সমস্ত মুরীদ নিচে বসা ছিল। কিন্তু আমাকে জোর করে তাঁর পাশে বসালেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হওয়ার পর মুরীদের দিকে ফিরে তাওয়াজ্জুহ দেওয়া শুরু করলেন। ফলে তার মুরীদরা হুশ হারিয়ে লাফাতে শুরু করল। আমি এসব দেখছিলাম।

অতঃপর আমি বললাম, আমার মন চাচ্ছে, যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমাকেও তাওয়াজ্জুহ দিতেন। তখন তিনি আমাকেও তাওয়াজ্জুহ দেওয়া শুরু করলেন। আমি আল্লাহর পবিত্র নামের ওপর মুরাকাবা শুরু করলাম। বেচারা অনেক চেষ্টা করেও আমার ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারল না। কিছু দিন পর সে নিজেই বলল, আপনার ওপর প্রতিক্রিয়া হতে পারে না।

## চেহারায় নুরের বিচ্ছুরণ

মাওলানা আনোয়ারী বলেন, আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি (রহ.) ভাওয়ালপুর শহরের জামে মসজিদে ও অন্যান্য স্থানে কাদিয়ানিদের বিরুদ্ধে আলোচনা করার জন্য আলেমদের পাঠাতেন। আমাকে দুবার পাঠিয়েছেন। ওই সময় শাহ সাহেবের চেহারায় নূর ঝলমল করত। আমি কয়েকবার দেখেছি, একটি অন্ধকার রুমে তিনি মুরাকাবা করছেন; কিন্তু রুমে আলো ঝলমল করছে।

## একাকি অবস্থায় মুলাকাতে অস্বীকৃতি

একবার হায়দারাবাদের শহরের মৌলবী নবাব ফয়জুদ্দীন শাহ সাহেবকে কন্যার বিবাহে দাওয়াত দিলেন। যেহেতু নবাব ও তার পরিবারের সাথে দেওবন্দের ওলামাদের সম্পর্ক ছিল, তাই অনেকে চাইল শাহ সাহেবের সাথে মেজবানের সাক্ষাৎ হোক। শাহ সাহেবকে বলা হলে তিনি বললেন, এতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে এখন নয়। কারণ, এ সফরের উদ্দেশ্য হলো, নবাবের কন্যার বিবাহে অংশ গ্রহণ করা। তাই এই সময়টা আমি তার জন্য রাখতে চাই। ওই সময় আকবর হায়দারীর ফোন এল যে, আমি শাহ সাহেবের সাথে দেখা করতে চাই। শাহ সাহেব বললেন, তাকে আসতে দিন। হায়দারীকে খবর দেওয়া হলে তিনি বললেন, আমি আসছি। উপস্থিত সাবইকে উঠিয়ে দেওয়া হোক। আমি একাকি দেখা করতে চাই। শাহ সাহেব বললেন, এ আমার জন্য অসম্ভব যে, আমি তার সাথে একাকি দেখা করব!

## দৃঢ়তা ও সাহসিকতা

'আল্লাহর সিংহরা প্রতারণা জানে না'-এর নমুনা হযরত শাহ সাহেব হক কথার ঘোষণা দেওয়ার জন্য কয়েকবার কাদিয়ান গ্রামে গমন করেন এবং সত্যের বিজয়ের জন্য তিনি সেখানে জনসভার আয়োজন করেন। মির্জায়ীরা সরকারের সাথে আপস করে এই জলসা বন্ধ করার জন্য অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু শাহ সাহেব (রহ.)-এর দৃঢ়তা ও সাহসিকতার কারণে তারা ব্যর্থ হলো। তখন তারা শাহ সাহেবকে হুমকি দিয়ে চিঠি লিখল, আপনি এগুলো বন্ধ না করলে ফিরে যেতে পারবেন না। শুধু হুমকি নয়; কয়েকবার চেষ্টাও করা হয়। কিন্তু

نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن ● پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

'খোদার নূর 'কুফরের আচরণ' দেখে হাসছে;
ফুঁ দিয়ে এই আলো নিভানো যাবে না।'

## আলোকিত আকৃতি

শাহ আনোয়ারী ফসালাবাদী 'কামালাতে আনোয়ারী' নামক গ্রন্থে লিখেছেন-

'একবার শাহ সাহেব ভোর বেলায় উজিরাবাদ ষ্টেশনে গাড়ির অপেক্ষায় ছিলেন। তখন ষ্টেশনের হিন্দু মাষ্টার বড় বাতি হাতে নিয়ে এদিক দিয়েই অতিক্রম করছিল। হযরত শাহ সাহেবকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল এবং ভালোমতো দেখতে লাগল। তারপর বলল, যে ধর্মের আলেম এমন হয়, সে ধর্ম কখনও সাধারণ হতে পারে না। তারপর ষ্টেশনমাষ্টার শাহ সাহেবের হাতে হাত রেখে ঈমান আনল। এমন একটি ঘটনা পাঞ্জাবেও ঘটেছিল।

## চেহারা দ্বারা ইসলামের দাওয়াত

একবার মাওলানা আলী মঙ্গেরির দাওয়াতে শাহ সাহেব কাদিয়ানিয়াত খণ্ডনের জন্য মঙ্গ গমন করেন। সেখানে তিনি লাগাতার কয়েকদিন আলোচনা করেন। ওই এলাকার এক বড় হিন্দু সন্ত্রাসী তার আলোচনায় শরিক হয়। শেষ দিন ওই হিন্দু সন্ত্রাসী বলতে লাগল, এই ব্যক্তি তার চেহারা দিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন। দারুল উলূমের সদরে মুদাররিস মাওলানা ইবরাহিম বলেন, একবার শীতকালে জুমার সময় শাহ সাহেব (রহ.) সবুজ কাপড় পরে দারুল উলূমের মসজিদে রওনা হলেন। তাঁর দিকে আমার দৃষ্টি পড়তেই আমার মনে হলো, কোথাও যেন শাহ সাহেবের দৃষ্টি না লেগে যায়। মাওলানা মানযুর নোমানি বলেন, আমি বরং অন্যান্য ছাত্ররা হযরত শাহ সাহেব থেকে ইল্‌মিভাবে উপকৃত হওয়ার সাথে-সাথে তার সৌন্দর্য দেখে চোখ ঠাণ্ডা করতাম।

মুযাফফর নগরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার হাকীম ফতেহ আলী মুহাম্মাদ সাহেব বলেন, আমি যখন পূর্ণ যৌবনে ছিলাম, তখন আমার সৌন্দর্য ও রূপ-লাবণ্য ভরপুর ছিল। ডাক্তারি পড়তে আমি দিল্লি গেলাম। আগে থেকেই হাকীম আখতার সাহেবের কাছে কিছু কিতাব পড়ার প্রোগ্রাম ছিল। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আরবিতে আমার যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। তারপর ভূগোল বিষয়ে আরও কয়েকটি গ্রন্থ পড়ার পরামর্শ দিলেন এবং বললেন, মাওলানা নজির আহমাদ সাহেব মুহাদ্দিছে দেহলবির কাছে পড়বে।

আমি হযরত দেহলবির কাছে তিনি বার্ধক্যের কারণে অপারগতা প্রকাশ করলেন এবং বললেন, বর্তমানে দিল্লিতে একজন বিদেশি আলেম আছেন মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরি, যিনি 'সুনহারি মসজিদে' পড়ান। এ

অঞ্চলে তিনিই এ কিতাবগুলো পড়াতে পারবেন। তাকে ছাড়া আমি আর কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

আমি সুনহারি মসজিদে হযরত শাহ সাহেবের কাছে এলাম। হযরত আমার আবেদন গ্রহণ করে নিলেন এবং কিছু সময় দিয়ে আমার প্রতি সদয় হলেন। সবকের সময় হযরতের কাছে এলে তিনি দৃষ্টি অবনত রেখেই সবক পড়িয়ে যান। তিন বছর সময়ের মধ্যে কখনও আমার এই বাসনাটি পূর্ণ হয়নি যে, তিনি আমার প্রতি চোখ তুলে তাকবেন। মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হলে মুফতী আতীকুর রহমান সাহেব চিকিৎসার জন্য হযরতকে দেওবন্দ নিয়ে আসেন। আমি হযরতকে দেখতে এলাম। মনে ভাবনা ছিল, তার সাথে আমার ওঠাবসার বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। তা ছাড়া তিনি যখন আমাকে পড়াতেন, তখন কখনও আমার পানে চোখ তুলে তাকাননি। ফলে তিনি আমাকে চিনবেন এমন আশা করা যায় না।

কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, আমি উপস্থিত হতেই তিনি আমার নাম, ঠিকানা দিল্লিতে তাঁর কাছে আমার পড়ার ঘটনা বলতে শুরু করলেন। আমি অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাকে কীভাবে চিনতে পারলেন? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার কণ্ঠ শুনে। এমনই ছিল তাঁর তাকওয়া যে, সুশ্রী বালকদের থেকেও তিনি নিজের দৃষ্টিকে হেফাজত করতেন।

## দৃষ্টির পবিত্রতা

মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরি (রহ.)বলেন, হযরত শাহ সাহেব মাসের পর মাস মসজিদ থেকে বের হতেন না। কখনও প্রয়োজনে বাইরে গেলে চেহারা রুমাল দিয়ে ঢেকে নিতেন, যাতে গোনাহের কিছু নজরে না পড়ে। ঘটনাক্রমে একদিন মুহতামিম সাহেবের আম্মা আমাদের ঘরে তাশরীফ রাখছিলেন। তিনি এলেন এবং অন্দর মহলে আসার অনুমতি চাইলেন। আম্মাজানের ভুল হয়ে গেল এবং ঘরে যে একজন ভিন মহিলা আছেন সেকথা ভুলে গলেন। ফলে তাঁকে ভিতরে আসার অনুমতি দিয়ে দিলেন। হযরত চৌকাঠের মধ্যে পা রাখতেই মুহতামিম সাহেবের আম্মার প্রতি নজর পড়ে গেল। সাথে-সাথে তিনি ইসতিগফার পড়ে উল্টোপায়ে বের হয়ে গেলেন। আকস্মিক এই ঘটনায় তিনি খুব কষ্ট পেলেন। এর জন্য দীর্ঘ দিন পর্যন্ত তিনি বিষণ্ন ছিলেন। এমনকি দরসে ছাত্রদের মলিন চেহারায় বললেন, ভাই! বালেগ হওয়ার পর অনিচ্ছাকৃতভাবে কাল মাওলানা তায়্যেব সাহেবের মায়ের উপর দৃষ্টি পড়ে গেছে। যার ফলে আমার আত্মাটা যেন ছিলে যাচ্ছে।

## হারাম উপার্জন থেকে হেফাযত

শাহ সাহেবের প্রসিদ্ধ শাগরিদ বদরে আলম মিরাঠি বলেন, একবার শাহ সাহেব দেওবন্দ থেকে সফর করছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি রেলওয়ের যে বগিতে আরোহণ করলেন, ওই বগিতে দুজন সুন্দরী মেয়ে ছিল। হযরত গাড়িতে বসার পর সৌন্দর্যের কারণে সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। ওই মেয়েদুটি বারবার হযরতের দিকে তাকাচ্ছিল। হযরত কিতাব অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিলেন। ওই দুজন মেয়ের সাথে একজন বড় পানওয়ালা ছিল। তারা পান বানিয়ে একটা বড় পাত্রে হযরত শাহ সাহেবকে দেওয়ার জন্য দিল। বারবার পীড়াপীড়ির কারণে আমি হযরতের সামনে পাত্রটা পেশ করলাম। কিতাব অধ্যয়নরত অবস্থায়ই তিনি পান মুখে দিলেন। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই তাঁর ভিতর আচ্ছন্ন অবস্থা বিরাজ করল।

প্রথমে আমি মনে করেছিলাম, পানে নেশা জাতীয় কিছু দেওয়া হয়নি তো। কিন্তু হযরতের কাছে রাখা অন্য পান দেখে এ ধারণা আরো দৃঢ় হলো। মিরাঠ ষ্টেশনে আসার পর জানতে পারলাম, এই মেয়েদুটো নর্তকী ছিল। তখন আমি বুঝতে পারলাম, এই পবিত্র পেটের অধিকারী মানুষের পাকস্থলি কোনো হারাম বস্তু গ্রহণ করে না। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী লোকের সাথে আল্লাহ এ ধরনেরই আচরণ করে থাকেন।

## ইল্‌মের মহত্ত্ব

মাওলানা বদরে আলম বলেন, ডাবেলে থাকাকালীন আমি আরজ করলাম, হযরত! আপনার তো পরিবার-পরিজন রয়েছে। আপনি যদি বোখারী বা কুরআনের ব্যাখ্যা লিখেন, তাহলে এর মাধ্যমে আপনার ইল্‌ম সংরক্ষিত হওয়ার সাথে-সাথে আপনার সন্তানদের জন্য এই লেখা থেকে কিছু ব্যবস্থাও হবে। জবাবে তিনি বললেন, সারা জীবন হাদীছ বিক্রি করে কাটিয়ে দিয়েছি। মৌলবী সাহেব! আপনি কি চান আমার মৃত্যুর পরও আমার ইল্‌ম বিক্রি হোক?

## কিতাবের আদব

কারী তাইয়্যেব সাহেব (রহ.) বলেন, আমি অনেকবার হযরত শাহ সাহেব থেকে শুনেছি, আমি সাত বছর বয়সের পর থেকে দীনের কোনো কিতাব ওযু ছাড়া স্পর্শ করিনি। অধ্যয়নের সময় কখনও কিতাবকে আমার অনুগামী করিনি। কিতাবের টীকা উল্টো করে লিখা থাকলে আমি নিজে ঘুরে গিয়ে তা দেখতাম, কিতাব ঘোরাতাম না। কিতাবের প্রতি এই সম্মান ও আদবের

ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ইল্‌মের দৌলত দ্বারা ভরপুর করে দিলেন। তিনি ওস্তাদগণকে এতো শ্রদ্ধা করতেন যে, মাওলানা এজায আলী বলতেন, হযরত শায়খুল হিন্দের সামনে যখন হযরত শাহ সাহেব (রহ.) বসতেন, তখন এ পরিমাণ ঝুঁকে যেতেন যে, তাঁর পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমার আশঙ্কা হতো।

## ওস্তাদের আদব

মাওলানা মাশিয়াতুল্লাহর বড় ছেলে দেওবন্দের ফাযেল হাকীম মাহবুবুর রহমান বলেন, আমি দেওবন্দে পড়ার সময় শাহ সাহেবের সাথে লাগোয়া রুমে থাকতাম। হযরত শাহ সাহেবের পান খাওয়ার অভ্যাস ছিল। একবার আমি পান বানিয়ে তাঁর সামনে পেশ করলাম। তিনি পান মুখে দিতে যাবেন, ঠিক ওই সময় সামনে দিয়ে শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহ.) কোনো প্রয়োজনে কোথাও যাচ্ছিলেন। আমি হযরত শাহ সাহেবকে শায়খুল হিন্দের আগমনের সংবাদ দিলাম। আমি ওই মুহূর্তের কথা ভুলতে পারব না, যখন শায়খুল হিন্দের সংবাদ পেয়ে হযরত শাহ সাহেবের কী অবস্থা হয়েছিল। হযরত শাহ সাহেব দ্রুত মুখ পরিষ্কার করে রুমের দরজায় গিয়ে একজন নগণ্য খাদেমের মতো হযরত শায়খুল হিন্দকে স্বাগত জানানোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

## ধনাঢ্য লোককে এড়িয়ে চলতেন

মাওলানা মিয়া মুহাম্মদ একজন ধনাঢ্য ও সম্পদশালী পিতার সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা অনেক কারখানার মালিক ছিলেন। দেওবন্দ থেকে তিনি ফারেগ হওয়ার পর যখন হযরত শাহ সাহেবের সোহবতে দীর্ঘ দিন কাটিয়েছেন, তখন মাওলানা বদরে আলম বলেন, আমার মাধ্যমে হযরত শাহ সাহেব মাওলানা মিয়া মুহাম্মাদকে পয়গাম পাঠালেন যে, তাকে বলে দিন, তিনি যেন আমার কাছ থেকে বিদায় নেন। অন্যথায় লোকেরা মনে করতে পারে, ধন-সম্পদের জন্য তার সাথে আমার সম্পর্ক।

## ইল্‌মের মহত্ত্ব

হযরত শাহ সাহেবের ছেলে মাওলানা আনোয়ার শাহ লিখেন, মাওলানা মিয়া মুহাম্মদ দেওবন্দে পড়ার সময় আমার বোন রাশেদা খাতুনকে বাজার থেকে কিছু দামী কাপড় কিনে হাদিয়া দেন। একদিন আসরের সময় হযরত শাহ সাহেব স্বীয় কামরা থেকে বের হয়ে ওযু করছিলেন। ওই সময় রাশেদা

ওই দামী কাপড়গুলো নিয়ে হযরতের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি ইশারা দিয়ে ডেকে তার থেকে বিস্তারিত শুনলেন। বাচ্চার কাছ থেকে সব শুনে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'এই লোক স্বীয় সম্পদ দ্বারা আমার ইল্‌ম কিনতে চাচ্ছে নাকি?'

## ওস্তাদের খেদমত

মাওলানা আনোয়ারী ফয়সালাবাদী বলেন, হযরত শাহ সাহেব (রহ.) দেওবন্দের সদরে মুদাররিস থাকাবস্থায় শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর মুক্তির পর দেওবন্দ আসেন। তখনো আমার হযরত শাহ সাহেবের সাথে যেয়ারতের সুযোগ হয়নি। অবশ্য তাঁর ইল্‌মি যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অসংখ্য ছাত্রের কাছ থেকে শুনতে-শুনতে আমার কাছে তাঁর সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ছিল। দেওবন্দে পৌঁছার পর আমার পিতা আমাকে শায়খুল হিন্দের কাছে নিয়ে গেলেন। তখন গরমের মৌসুম ছিল এবং যোহরের নামায হয়ে গিয়েছিল। হযরতের বৈঠকখানায় অনেক লোক ভিড় করে চারদিকে বসে ছিল। এক লোক ছাদে ঝুলে থাকা বিশেষ ধরনের পাখা টেনে-টেনে বাতাস দিচ্ছিল, যার চেহারা থেকে এক ধরনের নূর ও ইল্‌মের প্রভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। একজন আমাকে চুপিচুপি বলল, এই ব্যক্তিটি হচ্ছেন আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি, যিনি দারুল উলূম দেওবন্দের সদরে মুদাররিস। একথা শুনে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। কারণ, যার ইল্‌মের কথা সারা পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ, যার সামনে ছাত্ররা কিভাবে বসে থাকে আর তিনি স্বয়ং কিভাবে ইহতেরাম ও আদবের সাথে স্বীয় ওস্তাদকে বাতাস করছেন!

শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর মাল্টা থেকে ফেরার পর প্রতিদিন দুপুরে হাকীম সিফাত সাহেব এখানে আসতেন। ওই সময় শায়খুল হিন্দ (রহ.) আরাম করতেন এবং হাকীম সিফাত সাহেব তাঁর শরীর টিপে দিতেন। একদিন ঠিক এ সময় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) এলেন। তিনি এসে দেখলেন, হযরত শায়খুল হিন্দ আরাম করছেন আর হাকীম সিফাত তাঁর শরীর টিপে দিচ্ছেন। তিনি কিছু না করতে পেরে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে গেলেন। তার যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। যেন তিনি মরে যাবেন। তার মনে হচ্ছিল, কোনো তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি টের পেয়ে যেন স্বীয় ওস্তাদের বিশ্রামে ব্যাঘাত না ঘটে।

# হযরত মাওলানা হোসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.)

তিনি ১২৯৬ হিজরির শাওয়াল মাসের ১৯ তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতৃপুরুষের আবাদ ছিল ফয়যাবাদ জেলায়। তাঁর পিতা হাবীবুল্লাহ হযরত ফযলুর রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদীর খলীফা ছিলেন।

তিনি কুরআন ও প্রাথমিক শিক্ষা স্বীয় পিতার কাছে অর্জন করেন। ১৩ বছর বয়সে দেওবন্দে ভর্তি হন। সেখানে স্বীয় বড় ভাই মাওলানা সিদ্দীক আহমাদ ও শায়খুল হিন্দের তত্ত্বাবধানে পড়াশোনা করতে থাকেন। তাঁর মেধা, যোগ্যতা, আগ্রহ, খেদমত ও গ্রহণযোগ্যতা দেখে শায়খুল হিন্দ (রহ.) তাঁকে বিশেষভাবে নজর দিতেন। ফলে তিনি দরসে নেযামীর ৬৭টি কিতাব মাত্র সাড়ে ছয় বছরে পড়ে শেষ করেন। ওস্তাদগণ তাঁকে বয়স কম হওয়ার কারণে আদর করে মাসতুরাতি মুন্সী বলে ডাকতেন।

ওস্তাদগণের ছোট-বড় কোনো খেদমতে তিনি পিছপা হতেন না। ১৩১৬ হিজরিতে তিনি দেওবন্দ থেকে ফারেগ হন। তারপর মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহির খেদমতে উপস্থিত হন। হযরতের হাতে তিনি বায়'আত হন। তখন তাঁর মক্কা যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। তাই হযরত গাঙ্গুহি (রহ.) তাঁকে বললেন, মক্কায় শায়খ হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কি আছেন। তুমি তাঁর কাছ থেকে যিকির শেখো। তিনি মক্কায় গিয়ে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীকে সব ঘটনা খুলে বললেন এবং হযরত গাঙ্গুহির কথা শোনালেন। তখন ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী তাঁকে যিকিরের তালকীন দিয়ে বললেন, সকালে এখানে এসে বসে-বসে যিকির করবে। তিনি মদীনা যাওয়ার সময় হাজী সাহেব তার মাথায় হাত রেখে বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহর হাতে সোর্পদ করছি।

মদীনায় পৌঁছে তিনি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত হাদীছের দরস দেন এবং যিকির ও মুরাকাবায় মশগুল থাকেন। ওই সময় তিনি কয়েকবার স্বপ্নে সুসংবাদ পান। যখন তিনি হিন্দুস্তান থেকে চলে আসছিলেন, তখন তাঁর ওস্তাদ শায়খুল হিন্দ (রহ.) তাঁকে মদীনায় বিদায় দেওয়ার সময় বলেছিলেন, পড়ানোর কাজ কখনও ছেড়ে দিয়ো না যদিও ছাত্র এক-দুজন হয়। তিনি ওস্তাদের এই কথাটি এমনভাবে মেনেছিলেন যে, জীবনের শেষ পর্যন্ত দরস দিয়েছেন।

মদীনার প্রথম দিকে অভাবের যিন্দেগি এবং হিন্দুস্তানের বন্দী জীবনে থাকাকালীন ওস্তাদের এই নসিহতের উপর আমল করেন এবং নিজেকে ইল্‌মি কাজে মশগুল রাখেন। ফলে তিনি মদীনা মুনাওয়ারাতে তো বটে, আরবের সীমানা ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশেও শায়খে হারামে নববী নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। দীর্ঘদিন মদীনায় হাদীছ পড়ানোর পর. ১৩২৬ হিজরিতে তিনি হিন্দুস্তান গমন করেন এবং শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর দরসে অংশগ্রহণ করেন।

দারুল উলূম দেওবন্দের শূরা কর্তৃপক্ষ তাঁকে দেওবন্দের ওস্তাদ হিসেবে নিযুক্ত করেন। দু-বছর পর তিনি পুনরায় মদীনায় গমন করেন এবং মালটা দ্বীপে বন্দী হওয়ার আগ পর্যন্ত দরস ও তাদরীসি খেদমত করেন। মালটা থেকে ফেরার পর শায়খুল হিন্দ (রহ.) তাঁকে নিজের খেদমতের জন্য ডেকে নেন। কিছুদিন পর মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মাদরাসা আলিয়ার সদরে মুদাররিস পদের জন্য লোক চেয়ে শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর কাছে আবেদন পাঠান। তখন হোসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.) শায়খের নির্দেশে কলকাতা যান এবং আনুমানিক ৬ বছর সেখানে অবস্থান করেন। তারপর থেকে গ্রেফতারি ও জেলের কারণে সেখান থেকে সরে আসতে বাধ্য হন। তারপর তিনি বাংলাদেশের সিলেট জেলায় জামিয়া ইসলামিয়াতে শায়খুল হাদীছ হিসেবে জীবনের শেষ পর্যন্ত পড়াতে থাকেন। ৩১ বছরের তাদরীসি জীবনে হাজার-হাজার ছাত্র তাঁর দ্বারা উপকৃত হন।

ইসলামের খাতিরে তিনি রাজনৈতিক ময়দানেও অনেক খেদমত করেন। হিন্দুস্তানের মুক্তির জন্য তিনি সারা জীবন স্বীয় জানকে হাতের মুঠায় রেখে আযাদির আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ কারণে কয়েকবার জেল-জুলুম-নির্যাতন সহ্য করেন। অবশেষে ইংরেজরা তাঁর কারণেই এ দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। যদিও তাঁর সাথে অনেক আলিমের রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল এবং তিনি অখণ্ড হিন্দুস্তানে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারায় মুখলিস ছিলেন। তিনি তাঁর সারা জীবনে দেশ ও জাতির খেদমতে ব্যয় করেছেন। অবশেষে তিনি ১৩৭৭ হিজরির জুমাদাল উলার ১৩ তারিখ বৃহস্পতিবার আসর নামাযের পর আল্লাহ তা'আলার ডাকে সাড়া দেন।

## ওস্তাদের খেদমত

শায়খুল হিন্দকে তাঁর সাথীবর্গ অর্থাৎ হযরত মাদানি, মাওলানা আযীযগুল এবং আরো কিছু বন্ধুবান্ধবসহ গ্রেফতার করে মালটা দ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া

হয়। তারা সেখানে ৪ বছর বন্দি থাকেন। এখানে হযরতদের তাকওয়া, দুনিয়াবিমুখতা ও ধৈর্য অন্যান্য বন্দিদের উপর প্রভাব ফেলে। বন্দি থাকার সময় মাদানি (রহ.) কুরআন হেফয করেন এবং শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর সাথে রাত-দিন অতিবাহিত করেন। তিনি শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর এমন খেদমত করেছেন, যার কোনো নজির পাওয়া যায় না। শায়খুল হিন্দ (রহ.) ওই সময় খুবই দুর্বল ও অসুস্থ ছিলেন। ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার করতে তাঁর কষ্ট হতো। মালটা দ্বীপে ঠাণ্ডা বেশি হওয়ার কারণে গরম পানি পাওয়া যেত না। হযরত মাদানি (রহ.) ওস্তাদের জন্য গরম পানির ব্যবস্থা করতে গিয়ে অভিনব পন্থা অবলম্বন করতেন। ঈশার নামাযের পর অন্যান্য প্রয়োজন থেকে ফারেগ হয়ে একটি পাত্রে তিনি পানি ভরতেন এবং ওই পাত্র পেটের সাথে লাগিয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকতেন। তারপর তাহাজ্জুদের সময় অত্যন্ত আদব ও ভক্তি সহকারে ওস্তাদের খেদমতে গরম পানি পেশ করতেন।

## খেদমতের বরকত

মৌলবী হেদায়াতুল্লাহ বলেন, একবার আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হযরত! আপনি দীর্ঘ চার বছর যাবত হযরত শায়খুল হিন্দ-এর খেদমতে ছিলেন। এসময় আপনি অনেক কিছু হাসিল করেছেন। তখন মাদানি (রহ.) বললেন, মৌলবি সাহেব! আমি অকর্মা ছিলাম, কিছু শিখতে পারিনি। আমি বারবার পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন, হাঁ, এতটুকু হয়েছে যে, ঘুমের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন ইচ্ছা হলে ঘুমিয়ে যাই আবার যখন ওঠার ইচ্ছা হয় জাগ্রত হই। ৫-১০ মিনিটের জন্য ঘুমাতে পারি আবার সময়মতো উঠে যেতে পারি। এ বিষয়ে তাঁর অনেক প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে।

## খতমে বুখারির মজলিস

সহীহ বুখারির খতমের সময় তিনি যখন শেষ হাদীছটি পড়তেন, তখন অন্তর বিগলিত হয়ে যেত। উপস্থিত জনতার অন্তর কেঁপে উঠত। তারা এমনভাবে তাওবা-ইসতিগফার করত, যেন আল্লাহ তাঁদের সামনে সরাসরি দাঁড়িয়ে আছেন।

## বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনাবলি

ইবাদাত, মুজাহাদা ও সাধনার বেলায় তিনি জুনায়েদ ও শিবলি (রহ.)-এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন। ইল্‌মের ক্ষেত্রে ইমাম বুখারি ও রাযি (রহ.), ইসলাহের ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়া (রহ.) ও ইবনে কাইয়্যেম (রহ.)-এর

কাতারে শামিল ছিলেন। জনসেবায় ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহ.)-এর সহকর্মী বলে প্রতীয়মান হয়। এতকিছু সত্ত্বেও তিনি বিনয়ী ছিলেন। রাত্রিবেলা সফরের সময় স্টেশনের প্লাটফর্মের কোনো এক জায়গায় জায়নামায বিছিয়ে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। একবার এক খাদেম ওয়েটিংরুমে নামায পড়ার কথা বললে তিনি বললেন, এর দ্বারা সেখানে ঘুমন্ত মানুষের অসুবিধা হবে। আমার মতো লোকের দ্বারা আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট হোক তা আমি চাই না। কোনো-কোনো সময় রাত বারোটায় বুখারি শরীফের দরস শেষ করতেন।

তারপর মেহমানখানায় গিয়ে মেহমানদের বিছানার ব্যবস্থা নিজেই করতেন। একবার এক গ্রাম্য মেহমান আসার পর কোনো এক বিষয় তার সমস্যা হলে তিনি নিজেই তার সাহায্যে এগিয়ে যান। শরীয়ত ও সুন্নাতের খেলাফ কোনো কিছু তিনি করতেন না। রাতে তিনি নিজে মেহমানদের পা টিপে দিতেন। আল্লাহর প্রতি অনুরাগী এই আলেম ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নামেন এবং স্বাধীনতার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেন। ইংরেজদের বুকে তিনি কাঁপুনি ধরিয়ে দেন।

## সৃষ্টি থেকে অমুখোপেক্ষিতা

হযরত মাদানি (রহ.) দেওবন্দ থেকে ফারেগ হয়ে স্বীয় পিতার সাথে মদীনায় হিজরত করেন। সেখানে আগে থেকেই তাঁদের কোনো স্থাবর সম্পত্তি ছিল না, কোনো কারবারও নয়। জীবিকা নির্বাহের কোনো মাধ্যমও ছিল না। অন্যান্য সাধারণ লোকেরা সেখানে হিজরত করে সরকার থেকে ভাতা নেওয়ার আশা করত। কিন্তু তিনি ও তাঁর পিতা এটা পছন্দ করতেন না। হযরত মাদানি (রহ.) একটি মাদরাসায় খেদমত শুরু করলেন এবং তাঁর পিতা একটি ছোট আকারে দোকান খুললেন। মাওলানা আবদুল হক বলেন, তাঁর পিতা ডা. রাফাকাত আলী হযরত মাদানি (রহ.)-এর পিতাকে বারবার পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন যে, মাদানি (রহ.) যেন তাঁর ছেলে আব্দুল হককে ব্যক্তিগতভাবে পড়ান।

ওই সময় তাঁদের অবস্থা এমন ছিল যে, পরিবারে ১৩জন সদস্য অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটিয়ে দিতেন। কিন্তু তারপরও তিনি এই আবেদন গ্রহণ করলেন না। বিপরীতে তিনি এর প্রত্যাশী ছিলেন যে, মদিনার মসজিদে কোনো বিনিময় ছাড়া ছাত্রদের পড়াবেন। এ অবস্থায় ছয় মাস কেটে গেল। অবশেষে ডাক্তার সাহেব তার পিছু ছাড়তে বাধ্য হলো।

## হাত কাজ করছে; অন্তর বন্ধুকে নিয়ে মেতে আছে

তিনি নামাযে দাঁড়ালে মনে হতো, এই বান্দা সারা দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বীয় মাবুদের সাথে কানে-কানে কথা বলছেন। নামাযে কুরআন তেলাওয়াত করলে মনে হতো, যেন এখন কুরআন নাযিল হচ্ছে। তখন এমন অবস্থা হতো, যা বর্ণনা করা মুশকিল। তাঁকে যারা বারবার দেখেছে, তারা জানে, সফর করা অবস্থায় হোক অথবা সফর থেকে আসার পর হোক যখন নামাযের সময় হয়ে যেত, তাঁর অবস্থা এমন হতো যে, মনে হতো না তাঁর মধ্যে কোনো ক্লান্তি আছে। অথবা এ চিন্তাও আসত না যে, সামনে কোনো সফর শুরু করতে হবে। সবর্দা যিকিরে মশগুল থাকতেন এবং 'হাত কাজ করছে; অন্তর বন্ধুকে নিয়ে মেতে আছে' এই প্রবাদের মেসদাক ছিলেন। ব্যাপারটা তখন অনুমান করা যেত, যখন তিনি নেহায়েত কাকুতি-মিনতির সাথে বারবার يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ পাঠ করতেন।

মৃত্যুর একদিন আগে তিনি বারবার অস্থিরতার সাথে এই দু'আটি পড়ছিলেন। উপস্থিতদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করল, হযরত! আপনার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? তিনি বললেন, এ কষ্টইবা কম কিসের যে, আপনারা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত রয়েছেন আর আমি বেকার পড়ে রয়েছি! সবাই বলল, হযরত আপনি তো অনেক কিছু করেছেন, যা একটি জামাত মিলেও করতে পারেনি। তিনি বললেন, আমি কিছুই করিনি।

یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی

شاید کہ نگاہے کند آگاہ نباشی

'সেই মহাসম্রাট থেকে একটি পলকের জন্যও গাফেল হয়ো না।

হয়তো তোমার গাফলতের মুহূর্তেই তিনি তোমার প্রতি সুনজর দিবেন।'

## সরলতা ও অকৃত্রিমতা

হযরত মাদানি (রহ.) অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন। ইল্‌ম ও তরীকত ছাড়াও তিনি রাজনৈতিক ময়দানের অভিভাবক ছিলেন। মুসলিম লীগ কিংবা মুসলিম লীগের বাইরে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্ণধারগণ তাঁর আস্তানায় হাজিরা দেওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করতেন। তিনি সুন্নতে নববীর সর্বোত্তম আদর্শ ছিলেন। তিনি সুন্নতের অনুসরণে চামড়ার বালিশ ও চামড়ার গোল দস্তরখান ব্যবহার করতেন, যার চারপাশে কমপক্ষে দশ থেকে বারোজন বসে একই পাত্রে খেতে পারত। তাদের সাথে তিনিও খেতেন।

একবার হযরত মাদানি (রহ.) উপস্থিত আহারকারীদের লক্ষ্য করে বললেন, আপনারা তো মোরগ ও হালুয়া খান, কিন্তু আমার এখানে আপনাদের বাসী রুটি আর মরিচ খেতে হয়। তখন মাওলানা ইহতেশামুল হক কান্দলবী বললেন, হযরত! এই বাসী রুটি আর আচারই মোরগের চেয়ে সুস্বাদু।

## প্রভাব ও প্রতিপত্তি

অত্যন্ত বিনয়ী হওয়া সত্ত্বেও মাদানি (রহ.) ছিলেন গাম্ভীর্য ও প্রশান্তির পাহাড়। চেহারায় তাঁর এক বিশেষ প্রভাব লেগে থাকত। এতদসত্ত্বেও তিনি হেসে-হেসে কথা বলতেন। কিন্তু শ্রোতার মনে তা প্রভাব ফেলত। মাওলানা ইহতেশামুল হাসান কান্দোলবী বলেন, আমার অবস্থাও এমনই ছিল। কিন্তু আমি তারপরও সমস্ত বুযুর্গ ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত ছিলাম। হযরত থানবী (রহ.) এক্ষেত্রে মনে যখন যা আসত, দ্বিধাহীনভাবে বলে দিতেন। তবে তাঁর থেকে কখনও অপছন্দের ভাব প্রকাশ পেত না। হযরত মাদানির অধিকাংশ সমকালীন বুযুর্গ ব্যক্তি বলতেন, তাঁকে দেখলে ভয় লাগে। অনেকবার এমন হয়েছে যে, মাওলানা ইলিয়াস কোনো উদ্দেশ্যে দেওবন্দ গেলেন। সেখানে তাঁর হযরত মাদানির সাথে স্বাভাবিকভাবে দেখা হয়েছে, হাসিমুখে আলাপ হয়েছে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যের কথা তিনি তখনো বলতে পারেননি। দেওবন্দ থেকে ফেরার সময় বললেন, হযরত মাদানির সাথে মূল কথা বলার সুযোগই হলো না।

## উচ্চমানের আখলাকের নমুনা

ভারতের কমিউনিস্টদের প্রসিদ্ধ নেতা ডা. মুহাম্মাদ আশরাফ মাদানি (রহ.) সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া এভাবে প্রকাশ করেছেন যে, ১৯৪৬ সনে কমিউনিস্ট পার্টিকে মুসলমানদের সার্বিক অবস্থার ওপর গবেষণা করে এ বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করার জন্য আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আমি তদন্ত করতে দেওবন্দ গেলে সেখানে নিরিবিলি কিছুক্ষণ কিতাব অধ্যয়ন করার সুযোগ হয়। মাওলানা মাদানির এখানে অধিকাংশ লোক রাতে নফল নামাযে দাঁড়িয়ে থাকত। একরাতে আমি মাত্র এক ঘন্টা শুয়েছি, তো ফজরের নামাযের তাকবীর শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। আমি উঠে পড়ি। দ্বিতীয় দিনও আমার এই অবস্থা হয়। তখন আমি হযরত মাদানিকে আরজ করলাম, হুযুরের কাছে থাকলে তো আমার শেষ ভালো হবে; কিন্তু সুস্থতার ব্যাপারে আশঙ্কা হচ্ছে। একথা শুনে হযরত মুচকি হাসি দিয়ে আমার জন্য আলাদা থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

দেওবন্দে থাকাকালীন চতুর্থ রাতে আমি আমার বিছানায় শোওয়া ছিলাম। সম্ভবত রাত তখন দশটা। সারাদিন ঘোরাঘুরির কারণে ক্লান্তও ছিলাম। তাই বাতি বন্ধ করে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। দরজা খোলা থাকত। ঘুমের মধ্যে আমি বুঝতে পারলাম, আমার পায়ের টাখনুর ওপর কারো হাত। তারপর দুটা হাত দ্বারা কেউ আমার পা টিপতে শুরু করল। আমি সর্তক হয়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারলাম, হযরত মাওলানা মাদানির মতো বড় ব্যক্তিত্ব আমার মতো গুনাহগারের পা টিপে দেওয়ার কাজে ব্যস্ত। আমি দ্রুত পা সরিয়ে অত্যন্ত আদবের সাথে হযরতকে নিষেধ করলাম। মাওলানা আফসোসের সাথে বললেন, আমাকে আপনি এই নেকীর কাজ থেকে কেন বঞ্চিত করছেন? আমি কি এর উপযুক্ত নই যে, আপন মেহমানের সেবা করব? একথা শুনে আমার ওপর কী ঝড়টা বয়ে গেল, তা বর্ণনা করতে আমি অপারগ। এটি হযরতের আখলাকের একটি সামান্য নমুনামাত্র।

## অল্পে তুষ্টি

হযরত মাদানিকে বৃটিশ সরকার ঢাকা ইউনিভার্সিটির দ্বীনি বিভাগের দায়িত্বের জন্য মাসিক পাঁচশত রুপির বেতনে চাকুরির প্রস্তাব পাঠায়। তিনি তা ফিরিয়ে দেন। এছাড়া মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও তাঁকে শায়খুল হাদীছ পদের জন্য মাসিক এক হাজার রুপি বেতন এবং থাকা খাওয়ার উন্নত ব্যবস্থা ও বছরে একবার হিন্দুস্তানে আসা-যাওয়ার জন্য যাতায়াত খরচ ইত্যাদি সুবিধাসহ প্রস্তাব পাঠায়। তিনি তা সরাসরি প্রত্যাখান করে দেওবন্দী যিন্দেগির ওপর নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

## অমুখাপেক্ষিতা

হযরত মাদানি (রহ.)-এর দুনিয়াবিমুখতার এর চেয়ে বড় দলিল আর কী হতে পারে যে, দীর্ঘ পাঁচ বছর একনাগাড়ে দেওবন্দের ওস্তাদ ছিলেন। কিন্তু কোনো কারণবশত যেদিন পড়াতে পারেননি, সেদিনের বেতন তিনি গ্রহণ করতেন না। মৃত্যুশয্যাকালীন প্রায় এক মাস অসুস্থতার কারণে ছুটি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, যা স্বাভাবিকভাবে তাঁর প্রাপ্য ছিল। ওই দিনগুলোর বেতন যা প্রায় এক হাজার অথবা তার চেয়েও কিছু বেশি হতো, তিনি তা দেওবন্দে পাঠিয়ে দিতেন একথা বলে যে, যেদিন আমি পড়াইনি, সেদিনের বেতন আমি নেব কেন?

## পিতামাতার আনুগত্য

'নকশে হায়াত' নামক মাদানির জীবনী গ্রন্থের চেয়ে আরো সংক্ষিপ্ত সংকলনে মাদানির জীবনের আরো বিভিন্ন দিক লেখা হয়েছে। যথা– মসজিদে নববীতে বসে-বসে ছাত্রদের পড়াচ্ছেন। কেউ এসে তাঁকে বলল, আপনার পিতা আপনাকে ডেকেছেন। পিতার কাছে গেলে তিনি বলতেন, আজ ইট-মাটি উঠানোর শ্রমিক আসেনি। তুমি কাজ করে দাও। অপরাগ হয়ে তিনি সারা দিন এ কাজ করতেন। কোনো সময় এ কারণে সারাটা দিন আবার কোনো সময় এক-দুই সপ্তাহ সবক স্থগিত থাকত।

## মাখলুকের খেদমত

মাওলানা আহমাদ আলী লাহোরী বলেন, হযরত মাদানি (রহ.) তাঁর শেষ জীবনের হজের পর যখন ফিরে এলেন, তখন আমরা তাঁকে ইসতিকবাল করার জন্য স্টেশনে গেলাম। হযরতের এক ঘনিষ্ঠ লোক, যার নাম ছিল আরিফ, তার সাথে দেওবন্দ পর্যন্ত সাথে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, ট্রেনে এক হিন্দু ভদ্রলোকের বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হয়। লোকটি বাথরুমে গিয়ে সাথে-সাথে হাত দিয়ে মুখ চেপে চলে আসে। মাদানি (রহ.) ব্যাপারটি বুঝতে পারেন। তিনি তখন ট্রেনের ভিতর আশপাশ থেকে সিগারেটের প্যাকেট একত্রিত করে লোটা নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করেন। তারপর পুরো বাথরুম ভালোভাবে পরিষ্কার করে হিন্দু লোকটিকে বললেন, এবার বাথরুমে যেতে পারেন। বাথরুম সর্ম্পূণ পরিষ্কার। এ অবস্থা দেখে লোকটি খুবই বিস্মিত হয়ে যায়। সে হযরতকে কৃতজ্ঞতা জানাতে থাকে।

এ ঘটনা দেখে ট্রেনের উক্ত বগিতেই খাজা নিজামুদ্দিন নামে এক লোক অপরজনকে হযরত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, তিনি হচ্ছেন হোসাইন আহমাদ মাদানি। নাম শোনার সাথে-সাথে খাজা নিজামুদ্দিন হযরত মাদানির পা জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে শুরু করল। হযরত পা সরিয়ে নিয়ে বললেন, কী হয়েছে? খাজা নিজামুদ্দিন বলল, হযরত! রাজনৈতিক কিছু বিষয়ে আপনার সাথে আমার মতপার্থ্যকের কারণে আমি অনেকবার আপনার বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছি। আপনার নামে মন্দ কথা বলেছি। আজ যদি আমি আপনার এই মহৎ কাজ দেখে তাওবা না করি, তাহলে আমাকে সোজা জাহান্নামে যেতে হবে। হযরত বললেন, ভাই! আমি তো একটি সুন্নাতের ওপর আমল করেছিমাত্র।

## ব্যবহারের বদলা

মাওলানা আব্দুল্লাহ ফারুকি মাওলানা আব্দুল কাদের রায়পুরির হাতে বায়'আত হয়েছিলেন। তিনি লাহোরের দিল্লি মুসলিম হোটেলে দীর্ঘদিন যাবৎ খতীব ছিলেন। তিনি বলেন, একবার আমি মদীনায় গিয়ে হযরত মাদানির কাছে অবস্থান করি। একবার মসজিদে নববীতে তাঁর সাথে নামায পড়তে যাওয়ার সময় আমি তাঁর জুতা উঠিয়ে নেই। হযরত মাদানি দেখে কিছুই বললেন না। কিন্তু পরে আরেকবার মসজিদে আমরা নামায পড়তে গেলে তিনি আমার জুতা উঠিয়ে মাথায় রাখলেন। আমি তাঁর পিছনে দৌড়াতে লাগলাম। তখন তিনি দ্রুত চলতে লাগলেন। আমি বারবার চেষ্টা করে তাঁর কাছ থেকে আমার জুতা নিতে পারলাম না। বললাম, অন্তত আল্লাহর দিকে তাকিয়ে আপনি জুতা মাথার ওপর রাখবেন না। তিনি বললেন, প্রতিজ্ঞা করো, ভবিষ্যতে হোসাইন আহমাদ মাদানির জুতা উঠাবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করলে তিনি মাথা থেকে জুতা নামিয়ে আনেন।

## গ্রেফতারি পরোয়ানা

১৯৩৬ সনে জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দের পক্ষ থেকে হযরত মাদানিকে বলে দেওয়া হলো, দিল্লী গেলে আপনাকে গ্রেফতার করা হবে। তখন হযরতের মানসিক অবস্থা ভালো যাচ্ছিল না। এছাড়া তাঁর পায়ে জখম ছিল। ঠিকমতো চলাফেরা করতে পারতেন না। হযরত কাশ্মিরি (রহ.) এমতাবস্থায় সফর করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু তিনি কারো কথা না শুনে রওনা হলেন। এর আগেই তাঁর নামে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষ থেকে গ্রেফতারি পরোয়না জারি করা ছিল। দেওবন্দ স্টেশনে জনতার প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে পুলিশ কিছু করতে সাহস পেল না। দেওবন্দের পরবর্তী স্টেশনে ডেপুটি সুপারিন্ডেন্ট তাঁর নামে নোটিশ দেয়। তিনি বললেন, আমি ইংরেজি জানি না। অফিসার বলল, কলম দিন, আমি আপনাকে উর্দূতে তরজমা করে দিচ্ছি। তখন হযরত মাদানি বললেন, ভালোই তো, নিজের অস্ত্র নিজেকে যবেহ করার জন্য তোমাকে দেব? একথা শুনে অফিসার চুপ হয়ে গেল। ওই অফিসার উর্দুতে নোটিশ অনুবাদ করে মুযাফফরনগর স্টেশনে পাঠালেন।

উক্ত নোটিশে লেখা ছিল, সাহারানপুরের হাকিমের পক্ষ থেকে আপনাকে নোটিশ দেওয়া হলো। আপনি আর আগে যাবেন না, অন্যথায় গ্রেফতার হবেন। হযরত মাদানি (রহ.) বললেন, আমি এখন সাহারানপুরে জেলার সীমানার বাইরে এসে পড়েছি। তাই এই নোটিশ কার্যকর হতে পারে না।

অফিসার এই জবাব শুনে হয়রান হয়ে গেল। তখন ওই অফিসারের সাথে থাকা ম্যাজিস্ট্রেট বলল, আমরা তাঁকে তাঁর সুবিধামতো স্থানে গিয়ে নোটিশ দেব। এখন যাক। তারপর ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ওই স্টেশনেই দ্বিতীয় নোটিশ পাঠাল এবং হযরত মাদানিকে গ্রেফতার করল। হযরত মাদানির অবস্থা এমন ছিল যে, গাড়ি থেকে নেমে দুই পায়ে ভর দিয়ে ঠিকমতো চলতে পারতেন না। তখন তাঁর জন্য হুইল চেয়ার আনা হলে তিনি চেয়ারে বসলেন। এতো কষ্ট সত্ত্বেও তিনি স্বাধীনতার আন্দোলনের দায়িত্ব ছাড়েননি। এমনকি তা মুলতবিও করেননি।

## খাবারের মধ্যে বরকত

দারুল উলূম দেওবন্দের মুদাররিস মাওলানা আব্দুস সামী মেশকাতের দরসে কিতাবুল মু'জিযাত-এর আলোচনায় হযরত মাদানি (রহ.)-এর একটি ঘটনা কসম খেয়ে শোনান। ওই দরসে শতাধিক ছাত্র উপস্থিত ছিল। তিনি বললেন, আমি একদিন হযরত মাদানি (রহ.)কে দাওয়াত করলাম। ঘটনাক্রমে ওই দিন মেহমানের সংখ্যা কম ছিল। হযরত মাদানি আমার দাওয়াত কবুল করলেন। খাওয়ার সময় মেহমানের সংখ্যা বেড়ে গেল। হযরত মাদানি (রহ.) সবাইকে নিয়ে তাশরীফ আনলেন। এতো মেহমান দেখে আমি পেরেশান হয়ে গেলাম। হযরত আমার অবস্থা দেখে বুঝে আমাকে আলাদা স্থানে নিয়ে গেলেন। আমি আরজ করলাম, একটু অপেক্ষা করুন; আমি আরো কিছু ব্যবস্থা করছি। হযরত বললেন, এই খাবারই যথেষ্ট হয়ে যাবে। হযরতের কথা অনুযায়ী রুটি ও তরকারি তাঁর সামনে দেওয়া হলো এবং রুটিগুলোকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হলো। তখন হযরত স্বীয় হাত দ্বারা সবার সামনে খাবার পরিবেশন শুরু করলেন। ওই খাওয়াই সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল।

## অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া ও আত্মত্যাগ

হযরত মাদানির নিয়ম ছিল, তিনি ঈশার পর থেকে রাত ১২ টা পর্যন্ত বুখারির দরস দিতেন। মাওলানা ফয়জুল্লাহ বলেন, একবার শীতকালে মধ্যরাতে হযরত মেহমানখানায় গেলেন। তিনি দেখলেন, একজন মেহমান একটা জীর্ণ কাপড় পরে খাটের উপর বসে আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন বসে আছেন? মেহমান বলল, কোনো একজন আমাকে দস্তরখানা থেকে উঠিয়ে দেয় এবং আমার কাছে কম্বল নেই। একথা শুনে হযরত ব্যথিত হলেন। তিনি বারবার ওই লোকের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, যিনি

তাকে দস্তরখানা থেকে উঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তিনি কারো খোঁজ পেলেন না। তখন তিনি নিজে ভিতরে গিয়ে খাবার নিয়ে এলেন। মেহমানের খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি বাইরে বসে রইলেন। তখন অন্য মেহমানরা সবাই ঘুমাচ্ছিল। তারপর তিনি ভিতরে গিয়ে নিজের বিছানা নিয়ে এলেন এবং মেহমানকে শুতে দিলেন আর নিজে সারারাত বিছানা ছাড়া কাটিয়ে দিলেন। মাওলানা ফয়জুল্লাহ বলেন, আমি বারবার পীড়াপীড়ি করলাম, যাতে তিনি আমার বিছানায় আরাম করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না।

## অবিচলতা

একবার হযরত মাদানি (রহ.) বলেন, রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে আলেমগণের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া উচিত নয়। অন্য এক মজলিসে তিনি বলেন, যখন আমি ১৯২৩ সনে করাচির জেলখানায় ছিলাম, তখন বাংলা কাউন্সিলের এক সদস্য আমাকে বলল, ৪০ হাজার রুপি নগদ আর মাসিক ৫০০ রুপি বেতনে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর পদে আপনাকে প্রস্তাব করছি! আপনি তা গ্রহণ করুন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমার দায়িত্ব কী? বললেন, কিছু করতে হবে না। আপনি শুধু আযাদির আন্দোলনে চুপ থাকবেন। তিনি বললেন, হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) যে মিশনে আমাকে লাগিয়েছেন, তা থেকে সরে আসা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

# হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.)

হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) সাহারানপুরে মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার শায়খুল হাদীছ মাওলানা ইয়াহয়ার পুত্র এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতের উদ্ভাবক মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর ভাতিজা ছিলেন। তিনি ১৩১৫ হিজরির ১১ই রমযানুল মুবারকে কান্দলা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় শিক্ষা অর্জন করেন। ১৩৪৪ হিজরিতে দাওরা ফারেগ হন। তাঁর ওস্তাদগণের মাঝে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরি, তার পিতা মাওলানা ইয়াহয়া, মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী (রহ.) ও মাওলানা আব্দুল লতীফ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা অর্জন শেষ হওয়ার পর মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায়ই মুদাররিস নিযুক্ত হন। তারপর অল্প সময়ের মধ্যেই স্বীয় যোগ্যতাবলে সদরে মুদাররিস হয়ে যান। শায়খ খলীল আহমাদ সাহারানপুরি (রহ.) তাঁকে শায়খুল হাদীছ উপাধিতে ভুষিত করেন। তিনি রূহানি ইল্‌ম শায়খ খলীল আহমাদ সাহারানপুরি (রহ.)-এর কাছ থেকে অর্জন করেন। তাঁর পক্ষ থেকে তিনি খেলাফতপ্রাপ্ত হন। হযরত সাহারানপুরির ইন্তিকালের পর হযরত আবদুল কাদের রায়পুরির সাথে সম্পর্ক গড়েন। তাঁর পক্ষ থেকেও তিনি খেলাফত অর্জন করেন।

সারাটা জীবন তিনি দরস, তাদরীস ও তাবলীগের কাজে ব্যয় করেন। তিনি একজন বড় আলেম, সুন্নতের পূর্ণ অনুসারী এবং হকের প্রতি আহ্বানকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বিনয় ও নম্রতায় তিনি পূর্বসূরীদের নমুনা ছিলেন। বড়-বড় আলেম তাঁর ছাত্র ও মুরিদ ছিলেন। তিনি অনেক তাসনীফাতের কাজ করেন, যা উলামা ও সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। জীবনের শেষ দিকে তিনি মদীনায় অতিবাহিত করেন। ১৯৬২ সালেন ২৪মে মদীনায় তাঁর ইন্তিকাল হয় এবং জান্নাতুল বাকী'তে সমাহিত হন।

## হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর সাথে আন্তরিকতা

হযরত যাকারিয়া (রহ.) নিজের শৈশব সম্পর্কে বলেন, ওই সময় আমার পিতা হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহির খেদমতে থাকতেন। আমার বয়স তখন

দশ বছর ছিল। হযরত ডুমুর গাছের নিচে চার জানু হয়ে বসতেন আর আমি হযরতে পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে হযরতকে জড়িয়ে ধরতাম। আমি আরেকটু বড় হওয়ার পর হযরত রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় আমি জোরে-জোরে সালাম দিতাম। তখন হযরত আদরের সুরে আমার সালামের জবাব দিতেন। তিনি আরো বলেন, হযরত গাঙ্গুহির কোলে বসে খেলা, হযরতের পায়ের গোঁড়ালির ওপর পা রাখা, গলায় হাত দিয়ে দাঁড়ানো, হযরতের সাথে ঈদের দিন ঈদগাহে পালকিতে চড়ে যাওয়া এ সবই আমার হয়েছিল। পালকিটি বড়-বড় আলেম কাঁধে করে নিয়ে যেতেন। কোনো-কোনো সময় হযরতের সাথে খাওয়া এগুলো এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে।

## বাচ্চাদের তরবিয়ত

ওই যমানার বুযুর্গরা বাচ্চাদের আখলাকি তরবিয়ত ও মেধা বিকাশের জন্য ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। মাওলানা ইয়াহয়া (রহ.) এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিতেন। হযরত যাকারিয়া (রহ.) বলেন, আমার ১৩ বছর বয়সে আমার পিতা আমাকে কান্দলায় পাঠানোর ওয়াদা করেন। আমি শুনে খুশিতে লাফাতে লাগলাম। বসে-বসে ঈদের চাদেঁর মতো আমার যাওয়ার দিনের অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুদিন পর আমার পিতা তা মুলতবি করে দিলেন। আমি আশ্চর্য ও মনক্ষুণ্নও হলাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, কান্দলা যাওয়ার খবর শুনে তুমি খুব আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছ। এতো বেশি খুশি হওয়া ঠিক নয়। তাই আমি তোমার কান্দলা যাওয়া মুলতবি করেছি।

## সারা জীবনের দায়িত্ব

হযরত যাকারিয়া (রহ.)-এর পিতা সাত বছর বয়সেই কুরআন হেফয করে ফেলেছিলেন। কিন্তু হযরত যাকারিয়ার সাত বছর বয়সে পড়াও শুরু হয়নি। এই বয়সেও শিক্ষা শুরু না হওয়ায় খান্দানের বুযুর্গদের আশ্চর্য লাগছিল। তাঁর দাদীও কুরআনের হাফেযা ছিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র ইয়াহয়াকে ডেকে বললেন, ইয়াহইয়া! সন্তানের মহব্বতে অন্ধ হয়ো না। তুমি নিজে সাত বছর বয়সে কুরআন হেফয করেছ। এই ছেলে এতো বড় হয়ে গেল; তাকে দিয়ে জুতা পরিষ্কার করাবে নাকি? মাওলানা ইয়াহয়া মায়ের এই কথার উত্তরে বললেন, যতক্ষণ সে খেলতে চায়, তাকে খেলতে দিন। যেদিন সে ঘানিতে মাথা দিবে, তখন কবরে গিয়েই তবে দম নিবে।

## কুরআন তেলাওয়াত

হযরত যাকারিয়া (রহ.)-এর খান্দানে কুরআন হেফযের মাধ্যমে শিক্ষা জীবন শুরু করা আবশ্যক ছিল। সে অনুযায়ী হযরত যাকারিয়া (রহ.)-এর কুরআন হেফয শুরু হলো। তিনি পিতার কাছ থেকে এক পৃষ্ঠা করে সবক নিতেন। তার পিতা বলতেন, এই পৃষ্ঠা একশতবার পড়; তারপর সারাদিন তোমার ছুটি। হযরত যাকারিয়া বলেন, আমার মনে ছিল না, এক পৃষ্ঠা একশতবার পড়তে কতক্ষণ লাগে। আমি খুব তাড়াতাড়ি এসে বলে দিলাম, একশতবার পড়েছি। আমার পিতা এ বিষয়ে বেশি কিছু বলতেন না। পরের দিনের সবক ইয়াদ করার পর বলতেন, গতকাল তো এভাবে পড়েছিলে; আজ ঠিকমতো পড়ো। সাহারানপুরে এসে আরবি শিক্ষা শুরু করার পরও এই হুকুম বলবৎ ছিল। প্রতিদিন এক পারা কুরআন পড়ার হুকুম ছিল। মাগরিবের পর একজন কুরআন পড়া শুনত, কিন্তু অনেক ভুল হতো। একদিন সাহারানপুরের প্রসিদ্ধ উকীল মৌলবী আব্দুল্লাহ জান মাওলানা ইয়াহয়া (রহ.)কে বললেন, যাকারিয়ার কুরআন ইয়াদ নেই। তিনি স্বাভাবিকভাবেই বললেন, হাঁ; তার কুরআন ইয়াদ নেই। মৌলবী সাহেব হয়রান হয়ে বললেন, এর কী অর্থ? পিতা বললেন, সে সারা জীবন কী করবে? কুরআনই তো পড়াবে। এক সময় ঠিকই ইয়াদ হয়ে যাবে।

## আকাবিরগণের সাথে মহব্বত

মাওলানা ইয়াহয়া সাহেবের কাউকে তরবিয়ত করা, তাঁর মেধা এবং কোনো কিছু বুঝতে পারা সম্পর্কে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে। যথা- হযরত যাকারিয়ার ফিকহের শিক্ষা শুরু হওয়ার সময় তাঁর পিতা তাঁকে বিশ রুপি উপহার দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এ দিয়ে তুমি কী করবে? হযরত যাকারিয়া বললেন, আমার মন চাচ্ছে. চারজন আকাবির হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরি, হযরত হোসাইন আহমাদ মাদানি, মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরি এবং হযরত থানবী (রহ.)কে পাঁচ পাঁচ রুপি করে মিষ্টি কিনে হাদিয়া দেব। পিতা শুনে খুব খুশি হয়ে বললেন, ঠিক আছে। কোন মিষ্টি কিনবে? হযরত যাকারিয়া কয়েক রকমের মিষ্টির নাম বললে পিতা বললেন, তাঁদের মধ্যে কারা এসব মিষ্টি খায়? তুমি এগুলো কিনে দিলে তারা এক দুটি মুখে দিয়েই আর খাবেন না। আর অবশিষ্ট মিষ্টিগুলো অন্যের কাছে চলে যাবে। তুমি এটা করো যে, পাঁচ-পাঁচ রুপি করে মিশ্রি কিনে নাও। তোমার এই মিশ্রি দিয়ে তাঁরা এক মাস পর্যন্ত চা পান করতে পারবেন। যথারীতি

তিনি তা-ই করলেন। ওই হযরতগণ তাঁর এই হাদিয়া আনন্দের সাথে গ্রহণ করলেন এবং তাকে দু'আ দিলেন।

## শিক্ষার প্রতি মনোযোগ

হযরত যাকারিয়া (রহ.) বলেন, আমার ছাত্রজীবনে কেউ একবার আমার জুতা নিয়ে যায়। তারপর মোটামুটি ছয় মাস পর্যন্ত আমার জুতার প্রয়োজন হয়নি। কারণ, এই সময়ের মধ্যে আমার মাদরাসার বাইরে যাওয়ার সুযোগই হয়নি। মাদরাসার মসজিদেই জুমার নামায হতো। মাদরাসার বাথরুমে পুরনো জুতা থাকত। ওগুলো পায়ে দিয়ে বাথরুমে যেতাম, যা এখনও আছে। এছাড়া আমি বাইরে যাইনি।

## দুনিয়াবিমুখতা

হযরত যাকারিয়াকে চট্টগ্রাম অথবা ঢাকার মাদরাসা আলিয়াতে শায়খুল হাদীছ পদে যোগদান করার জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। শুধু তিরমিযি ও বুখারি পড়ানোর কথা ছিল। মাসিক বেতন ছিল ১২০০ রুপি। প্রথমে চিঠি পাঠানো হয়। তারপর জরুরি তারবার্তা পাঠানো হয়। তিনি বলেন, তার বার্তার জবাবে আমি শুধু লিখেছি, যেসব বন্ধুগণ আপনার কাছে আমার নাম প্রস্তাব করেছে, তারা শুধু ভালো ধারণার ওপর ভিত্তি করে এ কাজ করেছে। অধম এর উপযুক্ত নয়।

## পরোপকারের এক আশ্চর্য ঘটনা

তাঁর পরোপকারের একটি ঘটনা আছে, যা বর্তমানে কারো বিশ্বাসে আসার কথা নয়। একজন বড় আলেম ও বযুর্গ ব্যক্তি, যাঁর সাথে হযরত দীর্ঘদিন যাবত কাজ করেছেন এবং তাঁর সাথে শিষ্যত্বের সম্পর্কও ছিল। তিনি ইন্তেকাল করার পর তার সম্পত্তি বন্টন এবং করজ ইত্যাদির ব্যাপারে আপনজনরা একত্রিত হলেন। তো তাঁর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব কেউ নিতে রাজি হচ্ছিল না, যার পরিমাণ প্রায় পাঁচ হাজার। হযরত নির্দ্বিধায় তা নিজ জিম্মায় নিয়ে আদায় করে দিয়েছেন।

## কবিতা-সাহিত্যের মজলিস

হযরত যাকারিয়া (রহ.)-এর কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ ছিল। তিনি একটি ঘটনা বললেন যে, আমার যৌবনের শুরুতে অন্য এক এলাকায় মাঝে-মাঝে রাতে যাওয়া পড়ত। সেখানে আমার কিছু বন্ধু-বান্ধব ছিল।

ঈশার পর সেখানে কাব্যপ্রতিযোগিতা শুরু হলো, যা ওই যমানার খুবই জনপ্রিয় ছিল। সেখানে এমন মগ্ন হলাম যে, রাত কখন শেষ হয়ে গেল, তা টেরই পেলাম না। হঠাৎ আযানের আওয়াজ কানে এলে মনে হলো, কেউ অসময়ে মসজিদে গিয়ে আযান দিচ্ছে। পরে উঠে বসে বুঝতে পারলাম, সুবহে সাদেক হয়ে গেছে।

এটি ফজরের আযান ছিল।

## লেখালেখির প্রতি ঝোঁক

দরস ও তাদরীসের ব্যস্ততা, যিকির ও নফল ইবাদাতের মগ্নতা, মেহমানের আসা-যাওয়া ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও হযরত যাকারিয়ার লেখালেখির মনমানসিকতা প্রবল ছিল। তিনি সর্বপ্রথম মিশকাত পড়ানোর সময় ২২শে রবিউল আউয়াল রাত বারোটায় বিদায় হজের উপর লেখা শুরু করেন এবং একদিন ও দেড় রাতের পর সকালে তা শেষ করেন।

## সম্পদের প্রতি অনীহা

তিনি বলেন, আমার তিন বা চার বছর বয়সের সবকিছু মনে আছে। তখনো আমি ঠিকমতো হাঁটতে পারি না। আমার প্রতি আমার মায়ের প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল। তিনি আমার জন্য একটি বালিশ বানিয়েছিলেন। তা এক বিঘাত চওড়া এবং দেড় বিঘত লম্বা ছিল। তার আকৃতিও মনে আছে। দেখতে খুব সুন্দর লাগত। এই বালিশটি আমার এতো প্রিয় ছিল যে, মাথার নিচে না রেখে তা আমার বুকের ওপর রাখতাম।

একদিন পিতা আওয়াজ দিয়ে বললেন, যাকারিয়া! বালিশটি নিয়ে আসো। আমার ভিতর পিতার মহব্বত যেন ঢেউ তুলল। বললাম, আমার বালিশ নিয়ে আসবো? তিনি বললেন, এদিকে আসো। আমি দৌড়ে গেলে তিনি রাম হাত দিয়ে আমার উভয় হাত ধরে ডান হাত দিয়ে আমার মুখের ওপর এতো জোরে থাপ্পর মারলেন যে, এর মজা আমি আজো ভুলিনি। তিনি বললেন, এখনই বাপের মাল নিয়ে বলো, আমারটা? আগে নিজে কিছু কামাই করে তারপর বলো, আমারটা। আল্লাহর মেহেরবানিতে তারপর যখনই এই ঘটনা স্মরণ হতো, তখনই মনে হতো, এই দুনিয়ায় নিজের বলে কিছু নেই।

## তাবলীগি সাথীদের সাথে মহব্বত

হযরত যাকারিয়া (রহ.) তাবলীগের জামাত এবং অন্যান্য মেহমানদের মধ্যে কখনও পার্থক্য করতে দিতেন না। প্রত্যেকের চা-নাশতার প্রতি খেয়াল

রাখা এবং সবার সাথে মেশা তার বিশেষ গুণ ছিল। এক তাবলীগি লোক তাঁর সাথে মুসাফাহা করে দু'আ চাইলে তিনি বললেন, ভাই! আপনারা অনেক বড় কাজ করছেন। আমার কী অবস্থা! আপনারা আমার জন্য দু'আ করুন। আরেকবার এক তাবলীগি সাথী মহব্বত করে তাঁকে দুই রুপি পেশ করলে তিনি সাথে-সাথে হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, কখনওই না। আপনারা আল্লাহর রাস্তায় সফর করেন। আপনাদেরকে আমাদের সাহায্য করা উচিত। আপনারা কেন আমাকে সাহায্য করবেন? আমি তো আপনাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না।

## তাকওয়ার দৃষ্টান্ত

হযরত যাকারিয়া (রহ.) নিজে স্বীয় পিতা সম্পর্কে লিখেন, আমার পিতার যমানায় মাদরাসয় বোর্ডিং চালু হয়নি। মাদরাসার নিকটে এক বাবুর্চির দোকান ছিল। ঘরে লোক না হওয়া পর্যন্ত জামে মসজিদের নিকট এক বাবুর্চির দোকান থেকে কিনে খেতাম। শীতকালে রাতে সেখান থেকে খাবার আনতে-আনতে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। তাই মাদরাসার গোসলখানার সামনে খাবার এনে রেখে দিতাম। কিছুক্ষণ পর তাপের কারণে খাবার একটু গরম হলে খেতাম। এভাবে হওয়ার পর প্রতি মাসে দুই তিন রুপি জমা করতাম, যাতে মাদরাসার আগুন দ্বারা উপকৃত হতে পারি।

## তাসাওউফ ও সুলুকের হাকীকত

একবার হযরত যাকারিয়া (রহ.) মাদরাসায় উপর তলায় ছিলেন। কোনো কাজে তিনি মগ্ন ছিলেন। মৌলবী নাসির উপরে গিয়ে তাঁকে বললেন, রইস আহরার আসছেন। এখন তিনি রায়পুর যাবেন। শুধ মুসাফাহা করবেন। তিনি-আসতে অনুমতি দিয়ে বললেন, উপরে আসতে বলো। উপরে এসে সালাম দিয়ে মুসাফাহা করতে-করতে বললেন, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করে রায়পুর যাচ্ছি। আগামী পরশু সকালে এসে আপনার কাছ থেকে উত্তর জেনে নেব। প্রশ্ন হলো, তাসাউফ কী? এর হাকীকত কী? হযরত যাকারিয়া (রহ.) মুসাফাহা করতে করতেই জবাব দিলেন, তাসাওউফ হলো শুধু নিয়তকে সহীহ করা। এছাড়া আর কিছু না। যা শুরু হয় হাদীছ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ থেকে আর শেষ হয় হাদীছ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ দ্বারা। একেই নেসবত বলে। একেই হুযুরি বলে।

حضوری گر ہمی خواہی از وغافل مشو حافظ

متی ما تلق من تھوی دع الدنیا واہلھا

'যদি তার সান্নিধ্য চাও, তবে তার ব্যাপারে গাফেল হয়ো না হাফিজ। তোমার কাঙ্ক্ষিত সত্তাকে তখনই পাবে, যখন দুনিয়া ও দুনিয়াদারদের পরিত্যাগ করবে।

হযরত যাকারিয়া (রহ.) বললেন, মৌলবী সাহেব! সমস্ত মুজাহাদা, মুরাকাবা, জোরে-জোরে যিকির করা এসব এজন্যই করা হয়। আল্লাহ যাকে এই দৌলত দান করেছেন, তার অন্য কোনো স্থানে যাওয়ার দরকার নেই।

## মুরশিদের সতর্কতা

তিনি বলেন, মদীনা মুনাওয়ারায় থাকাকালীন যখন আমি 'বাযলুল মাজহুদ' লিখাতম, তখন ফজরের পর থেকে লাগাতার ছয় ঘন্টা হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরি (রহ.)-এর খেদমতে থাকতাম। একদিন লিখতে গিয়ে আমি কিছু উদ্ভট ও আজে-বাজে চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে পড়লাম। হযরত এবারাত লেখাতে গিয়ে বললেন, 'আমি ব্যস্ত তোমাকে নিয়ে আর তুমি ব্যস্ত উমর-যায়েদ নিয়ে!' একথা শুনে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে উঠলাম। এমনকি আমার কোর্তা-জামা পর্যন্ত ঘামে ভিজে যায়।

মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) সম্পর্কে হযরত যাকারিয়া (রহ.) বলেন, আমার এ ব্যাপারে আফসোস হতো যে, থানাভবনে হযরত থানবীর খেদমতে সময় দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি না। একবার আমি অনেক কষ্টে সময় বের করে হযরত থানবীর নিকট আরজ করলাম, অনেক দূর থেকে লোকেরা আপনার নিকট হাজির হয়, কিন্তু এই অধম এখানে থেকেও আপনার খেদমতে হাজির হতে পারে না।

তিনি এমন একটি জবাব দিলেন যে, আমার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই জবাব আমার আনন্দের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল। তিনি বললেন, মৌলভী সাহেব! আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি যদিও আমার মজলিসে আসেন না, কিন্তু আমি যোহর থেকে আসর পর্যন্ত আপনার মজলিসে থাকি। আমি আপনাকে বারবার দেখতে থাকি আর ঈর্ষা করতে থাকি যে, কাজ শুধু এই লোকই করছে। আমি আপনাকে যোহর থেকে আসর পর্যন্ত কিতাবের পাতা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর দিকে মাথা উঠাতে দেখিনি।

## মিশকাত শরীফের সবকের সূচনা

হযরত যাকারিয়া (রহ.) তাঁর মিশকাতের সবক শুরু হওয়ার ঘটনা এভাবে বলেন, ১৩৩২ হিজরির মুহাররম মাসের ৭ তারিখে যোহরের নামাযের পর আমার মিশকাতের সবক শুরু হয়। আমার পিতা যোহরের পর গোসল করে দু-রাকাত নামায পড়লেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বসে মিশকাতের বিসমিল্লাহ ও খুতবা আমাকে দিয়ে পড়ালেন। তারপর কিবলার দিকে ফিরে ১৫/২০ মিনিট পর্যন্ত দু'আ করলেন। আমি জানি না, তিনি কি দু'আ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথে-সাথে আমি এই দু'আ করেছি, হে আল্লাহ! আমার হাদীছের পড়া অনেক দেরিতে শুরু হয়েছে। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাকে হাদীছের সাথে লাগিয়ে রাখুন। আল্লাহ আমার এই দু'আ এমনভাবে কবুল করলেন যে, ১৩৩২ হিজরি থেকে ১৩৯০ হিজরি পর্যন্ত আমার এমন কোনো দিন যায়নি, যেদিন আমার হাদীছের সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না।

## আকাবিরগণের আরামের প্রতি বিশেষ খেয়াল

একবার সাহারানপুরে তাবলীগ জামাতের ইজতিমা হচ্ছিল। হযরত যাকারিয়া (রহ.) শায়খ আব্দুল কাদের রায়পুরিকে বললেন, হযরত! এখন জুন মাস। গরমও বেশি। আমাদের এখানে আরামের ব্যবস্থা নেই। আগামী পরশু তাবলীগের জলসা শেষ হয়ে যাবে। আমি আর ইউসুফ যোহরের সময় রায়পুর হাজির হব। সেখানে দুদিন অবস্থান করব। দুদিন ধরে আগত লোকদের মুখে শুনেছিলাম, হযরত রায়পুরি অনেক দু'আ দিয়েছেন এবং সবার কাছে বললেন, আমারও সাহারানপুরে দুদিন থাকার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শায়েখ যাকারিয়া আমার আরামের কথা চিন্তা করে তা মানেননি। আল্লাহ তাঁর মর্তবা বুলন্দ করে দিন। তাঁকেও শান্তিতে রাখুন।

## আকাবিরগণের তাকওয়া

মাযাহিরুল উলূম মাদরাসার বার্ষিক জলসায় আগত বড়-বড় আকাবির কেউ জলসার খাওয়া খেতেন না। সবাই যার-যার নির্ধারিত সময়ে খাওয়া নিজে খেয়ে নিতেন। তবে মাওলানা খলীল আহমাদ সাহরানপুরি (রহ.) মেহমানদের সাথে খেতেন। কিন্তু তাঁর সামনে দশ থেকে বারোজন লোকের খাওয়া আসত, যা বিভিন্ন মেহমানদের সামনে রেখে দেওয়া হতো। তিনি সেখান থেকে খেয়ে নিতেন। মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা এনায়েত আলী সারাদিন মাদরাসায় থাকতেন। তিনি যোহরের সময় এবং রাত বারোটার সময় দফতরের কোনায় বসে নিজের সাধারণ খানাও নিজে খেয়ে নিতেন।

মাদরাসার বোর্ডিং-এর দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু তিনি তরকারিতে লবণ হয়েছে কিনা তা কোনো ছাত্রকে দিয়ে চাখিয়ে নিতেন, নিজে চাখতেন না। খাওয়ার সময় হলে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে খেয়ে নিতেন। এমন অসংখ্য সর্তকতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও হযরত সাহরানপুরি (রহ.) যখন স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য আরব চলে যান, তখন স্বীয় কুতুবখানা এই কথা বলে মাদরাসার জন্য ওয়াকফ করে দিয়ে যান যে, না জানি আমার দ্বারা মাদরাসার কত হক নষ্ট হয়েছে।

## বিনয় প্রকাশ

১৩৩৩ হিজরির শাওয়াল সাসে হযরত সাহরানপুরি (রহ.) তখন আরব দেশে চলে যাচ্ছিলেন। তখন অনেক লোক বায়'আত হচ্ছিল। তখন হযরত যাকারিয়া (রহ.) তাঁর কাছে বায়'আত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হযরত সাহারানপুরি (রহ.) তাঁকে বললেন, মাগরিবের পর আসুন; তখন বায়'আত করব। মাগরিবের পর হযরত সাহরানপুরি (রহ.) চার সিলসিলায় তাঁকে বায়'আত করেন এবং এজাযত প্রদান করলেন। তারপর তাঁর মাথা থেকে পাগড়ি সরিয়ে হযরত মাদানি (রহ.)-এর বড় ভাই মাওলানা আহমাদ ফয়েজাবাদির হাতে দিয়ে বললেন, এটি যাকারিয়ার মাথায় পরিয়ে দাও। ওই পাগড়ি পরানোর পর শায়খ এমনভাবে কাঁদতে শুরু করলেন যে, তা চিৎকারের মতো হয়ে গেল। পীর ও মুরশিদ হযরত সাহরানপুরিও আপ্লুত হয়ে উঠলেন। ওই সময় হযরত আব্দুল কাদের রায়পুরি (রহ.) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাকে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। হযরত যাকারিয়া (রহ.) হযরত রায়পুরির পা ধরে বললেন, আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, হিন্দুস্তান গিয়ে আমার এজাযত ও খেলাফতের খবর কাউকে বলবেন না। কিন্তু হযরত রায়পুরি (রহ.) একথা রাখতে পারলেন না। তাঁর মাধ্যমে পুরো হিন্দুস্তানে এই ঘটনা প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

## অভাব ও দরিদ্রতা

হযরত যাকারিয়া (রহ.) বলেন, আমাদের আকাবির ও পূর্বসূরীর কি রকম অভাব-অনটন এবং ধৈর্য ও শুকরের সাথে দিন কাটাতেন এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। তিনি স্বীয় চাচা মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি আমাকে লিখলেন, কয়েকদিন যাবৎ তোমার কাছে একটি চিঠি লেখার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমার কাছে কোনো পয়সা ছিল না। কারো কাছ থেকে ধার নিতেও মন চাচ্ছিল না। আজ আল্লাহ পয়সার ব্যবস্থা করলেন। তাই তোমাকে চিঠি লিখছি।

## দরসে হাদীছের পাবন্দি

হযরত যাকারিয়া (রহ.) অত্যন্ত গাম্ভীর্য ও আগ্রহসহকারে হাদীছের দরস দিতেন। তাঁর এক ছাত্র বলেন, একবার কয়েকদিন যাবত লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছিল। সমস্ত রাস্তায় হাঁটুপরিমাণ পানি জমে গেল। আমি চিন্তা করলাম, বৃষ্টি কমে গেলে সবকে হাজির হব। ওই সময় মাওলানা আসাদুল্লাহ দফতর দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আজও কি হযরত শায়খুল হাদীছ দরসে তাশরীফ এনেছিলেন? তিনি বললেন, বাইরে গিয়ে দেখে আসো! আমি মাদরাসার দরজায় এসে ফলবিক্রেতাদের জিজ্ঞেস করলাম। জানতে পারলাম, বেশ কিছুক্ষণ আগেই হযরত চলে গেছেন। এর দ্বারা বুঝলাম, হযরত শায়খুল হাদীছ কিছুক্ষণ আগে এসেছিলেন। অথচ তাঁর জায়গা থেকে দারুল হাদীছের দূরত্ব অনেক ছিল। রাস্তায় পানি ভরা ছিল। আমি দারুল হাদীছে এসে উপস্থিত হলাম। তখন কারেন্ট ছিল না এবং চারদিকে অন্ধকার ছিল। কিন্তু সবক শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমি হযরত শায়খুল হাদীছের দৃষ্টিতে পড়ে যাই কিনা এ ভয়ে চুপিচুপি দরসে বসে গেলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দেখে ফেললেন এবং বললেন, জান, আমি কিভাবে এসেছি? আমার জায়গা থেকে রওনা হওয়ার সময় আমার এক হাতে বুখারি শরীফ এবং অন্য হাতে ছাতা ছিল। জুতা হাতে নিতে পারছিলাম না। অর্ধেক রাস্তা আসার পর এক রিকশাওয়ালা জোর করে আমাকে এখানে পৌঁছিয়ে দিল। তারপর আমার পা ও পায়জামার নিচের অংশ ধুয়ে দিল। আমি একথা শুনে হিম হয়ে গেলাম।

# হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর জন্ম ১২৮০ হিজরির রবিউস সানীর ৫ তারিখে। তাঁর বংশ সাহাবী হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। হযরত থানবীর লালন-পালন অনেক আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়ে হয়। আল্লাহ তাঁকে বিস্ময়কর মেজাজ দান করেছিলেন। তিনি আরবির প্রাথমিক কিতাব মাওলানা ফাতাহ মুহাম্মাদের কাছে থানাভবনে পড়েন। তারপর ১২৯৫ হিজরিতে ইল্‌ম অর্জন করার উদ্দেশ্যে দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন। ১৩০১ হিজরিতে ফারেগ হন। তাঁর ওস্তাদগণের মাঝে মাওলানা ইয়াকুব নানুতবি (রহ.), মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.), শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান, মাওলানা সাইয়্যেদ আহমাদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

দারুল উলূম থেকে ফারেগ হওয়ার পর ১৩০১ হিজরিতে তিনি কানপুর গমন করেন। সেখানে ফয়যে আম মাদরাসায় পড়ান। সেখানে দীর্ঘ চৌদ্দ বছর দরস-তাদরীস ইফতা ও ওয়ায মাহফিলে ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকেন। ১৩১৫ হিজরিতে কানপুর মাদরাসা থেকে থানাভবনে তাশরীফ নিয়ে আসেন এবং হাজী ইমাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর খানকা আবাদ করেন। তখন তিনি সেখানেই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেখানে দীনের খেদমত করেন।

বাহ্যিক ইল্‌ম অর্জন শেষে তিনি বাতেনি ইল্‌ম অর্জনের উদ্দেশ্যে হযরত গাঙ্গুহির কাছে বায়'আত হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর পিতার হজে সফরকালীন সময়ে তার সাথে থাকায় মক্কায় হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর খাদেম হন। তিনি তাঁর কাছে থেকে যিকিরের তালকীন নিতে থাকেন। হযরত থানবীর আগ্রহ ও প্রতিভা দেখে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী বলতেন, আশরাফ আলী পুরোপুরি আমার তরীকার ওপর আছে। যখন আশরাফ আলী থানবীর কোনো লেখা অথবা আলোচনা তিনি দেখতেন ও শুনতেন, তখন তিনি বলতেন, তুমি আমার মনের কথার ব্যাখ্যা করে দিয়েছ।

বড়-বড় আলেম, ফাযেল, আবেদ, দুনিয়াবিমুখ মানুষ ও মুত্তাকী লোক অনেক দেখা যায়, কিন্তু শরীয়ত ও তরীকতের ব্যাপারে এমন সুন্দর

মেজাজসম্পন্ন লোক হযরত থানবীর মতো অন্য কাউকে দেখা যায় না। আলেম হলেও তরীকত সম্পর্কে কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু হযরত থানবী একই সাথে সুফী, আলেম, যমানার রুমি ও রাযী ছিলেন। তিনি যেভাবে শরীয়তকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের করে এনেছেন, ঠিক তেমনি বাতেনি ইল্‌মকে ইফরাত-তাফরীত থেকেও মুক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে হযরত থানবীর তরীকতের সারসংক্ষেপ ছিল, মানুষ হও, মনুষ্যত্ব শেখো। তিনি বলতেন, আমি আমার মাহফিলকে বুযুর্গ লোকদের মাহফিল বানাতে চাই না। আমি আমার মাহফিলকে মানুষের মাহফিল বানাতে চাই।

আল্লাহ তা'আলা হযরত থানবীকে যমানার মুজাদ্দিদ হিসেবে কবুল করেছিলেন। তিনি মুসলমানের জীবনের প্রতিটি শাখায় ঘাটতি অনুধাবন করে শত শত মাইল সফর করে স্বীয় ওয়াজ ও সাধারণ মজলিসের মাধ্যমে লোকদেরকে ইসলাহের দিকে আহ্বান করতেন। এছাড়াও লেখালেখির মাধ্যমে মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান জানাতেন। প্রচার ও প্রকাশনার এ যমানায় হযরত থানবীর প্রায় দেড়-হাজারের অধিক লেখা বই আকারে বের হয়েছে। প্রতিটি বিষয়েই তিনি এত পরিমাণ লিখেছেন যে, আগের ও পরবর্তী যমানায় তাঁর মতো এত লেখা অন্য কেউ লেখেননি।

তিনি অত্যন্ত নাজুক তবিয়ত ও মৌলিক নীতিমালা মেনে চলার পাবন্দ ছিলেন। তিনি এ যমানায় হাকীমুল উম্মত ও মুজাহিদে মিল্লাত ছিলেন। তাঁর সারাটা জীবন ইসলামের খেদমতে কেটেছে। ১৩৬২ হিজরির ১৬ রজব মোতাবেক ১৯৪৩ সনের ২০ শে জুলাই এই নশ্বর পৃথিবী থেকে তিনি বিদায় নেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর।

## শিক্ষা ও দীক্ষা

হযরত থানুবী (রহ.) নফসিয়্যাতের ব্যাপরে বড় দক্ষ ছিলেন। তিনি কখনও নিজের জন্য মনক্ষুণ্ন হতেন না। বরং শিক্ষা ও সংস্কারের জন্য তিনি প্রয়োজনে এমন হতেন। তিনি দাবি করতেন, ইসলামি সংস্কৃতির বিপরীতে কেউ কোনো নতুন সংস্কারের কথা বলতে চাইলে সে যেন কিছু দিন আমার কাছে থেকে যায়। কিছুদিন পর আল্লাহর ওপর ভরসা করে বলতে পারি, উক্ত দাবিদার নিজেই বলবে, আমাদের উদ্ভাবিত সংস্কৃতি মন্দ এবং শরীয়তকর্তৃক নির্ধারিত সংস্কৃতিই উত্তম ও গ্রহণযোগ্য।

## এক নবাবের অসৌজন্যমূলক আচরণ

একবার মুযাফফরনগর সফরের সময় হযরত থানবীর সাথে নেতৃত্বস্থানীয় এক লোকের সাক্ষাত হয়। সে কখনও কাউকে এমনকি বিচারালয়ে হাকিমকেও পরোয়া করত না। তার অভ্যাস এমনই ছিল। যথারীতি সে হযরত থানবীর সামনেও একই কায়দায় কথা বলতে শুরু করল। তার এ রকম অযাচিত আচরণ ও অসংলগ্ন কথাবার্তা দেখে হযরত থানবী (রহ.) সীমাহীন কষ্ট পেলেন। হযরত তাকে স্বাভাবিকভাবে ভদ্র ভাষায় সংযত হতে বললেও সে নেতৃত্বের অহংকারে আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

শেষে হযরত থানবী (রহ.) তাকে মজলিস থেকে উঠে যেতে বললেও সে বসে থাকে। তখন হযরত থানবী (রহ.) বললেন, আপনি না উঠলে আমিই উঠে যাচ্ছি। এমন লোকের সামনে আমি বসে থাকতে চাই না। ব্যস, তিনি এতটুকু বলতেই লোকটির ভিতরে কম্পন সৃষ্টি হলো। সে হাত জোড় করে বলল, হযরত! আপনি বসুন; আমিই উঠে যাই। পরে লোকটি হাফেয সগীরকে বলল, আজ আমার সারা জীবনের জন্য শিক্ষা হয়েছে। আমি আলেমগণকে অনেক ছোট লোক মনে করতাম। এখন প্রত্যেক আলেমকে শ্রদ্ধা করে থাকি। আমি বড়-বড় হাকিমকেও ভয় পেতাম না। কিন্তু ওই দিন মাওলানা এতো প্রভাবিত করেছেন যে, তাঁর হক কথা শুনে আমার মুখ থেকে কোনো কথা বের হয়নি।

## এক নেতৃত্বস্থানীয় লোকের চিকিৎসা

এক খান্দানী নবাব শ্রেণীর লোক থানাভবনের মাদরাসা দারুল উলূমের জন্য দুশত রুপি পাঠিয়েছিলেন। পাশাপাশি সে মাদরাসায় আগমন করার আবেদন জানিয়েছিলেন। হযরত থানবী (রহ.) একথা লিখে দুশত রুপি ফেরত দিলেন যে, যদি এই রুপির সাথে আসার কথা না থাকত, তাহলে তা গ্রহণ করা হতো। এখন তো মনে হচ্ছে, আমাকে প্রভাবিত করার জন্য এই চিঠি লেখা হয়েছে। আপনার কথা ঠিক আছে। কিন্তু আমি আপনার আসা না আসা সম্পর্কে স্বাধীনভাবে ফয়সালা করতে পারব না। কেননা, অস্বীকার করলে লজ্জাবোধ হবে।

নবাব বড় বুদ্ধিমান ও বুঝমান লোক ছিলেন। তিনি সাথে-সাথে ব্যাপারটি বুঝতে পেরে হযরত থানবীর কাছে ওযর পেশ করলেন। তিনি লিখলেন, আমি আমার দরখাস্ত প্রত্যাহার করে নিচ্ছি এবং রুপি পাঠিয়ে দিচ্ছি। অনুগ্রহপূর্বক তা মাদরাসার জন্য কবুল করুন। এর জবাবে হযরত থানবী (রহ.) খুশিমনে তা গ্রহণ করে বললেন, এতক্ষণ আপনি আমার সাক্ষাতে

আগ্রহী ছিলেন। এখন আমি আপনার ভদ্রতা দেখে আমিই আপনার সাথে দেখা করতে আগ্রহী হয়েছি। কিছুদিন পর হযরত থানবী (রহ.) এই শর্তে তার সাথে দেখা করতে যান, যাতে ভবিষ্যতে কোনো কিছু হাদিয়া পেশ না করেন।

## ইংরেজের দাওয়াত

হযরত থানবীর সফরের সময় যেহেতু বিভিন্ন মেজাজের লোকদের সাথে চলাফেরা করতে হতো, তাই রূহানি চিকিৎসা বিভিন্নভাবে করার প্রয়োজন হতো। এক দীনদার নেতৃত্বস্থানীয় লোক সাহারানপুরে মাযাহিরুল উলূম মাদরাসায় ছাত্রাবাস নির্মাণ করে দেন। তারপর তিনি মাদরাসার মুহতামিমকে এই ছাত্রাবাসের উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারণ করে মাদারাসার সাথে সম্পৃক্তদের দাওয়াত করার জন্য চিঠি লিখে পাঠান। মাদরাসার মুহতামিম সাহেব তখন হযরত থানবীকেও এই উদ্বোধনী জলসায় অংশগ্রহণ করার জন্য দাওয়াত দেন। কিন্তু হযরত থানবী এই বলে দাওয়াত ফিরিয়ে দেন যে, ওই লোকের হাকিমের মতো আদেশ করে বলার অধিকার নেই। এভাবে হুকুমনামা পাঠানো ভদ্রতার বিপরীত। আমি আসতে পারব না। সে কি কোনো নেতাকে এভাবে দাওয়াত দিতে পারে?

মুহতামিম সাহেব মাদরাসার দিকে তাকিয়ে হযরত থানবীকে বললেন, এভাবে সে বলেনি; বরং এটা তার মীর মুন্সীর কাজ। তখন হযরত থানবী অভিযোগের সুরে বললেন, সে কেন বিষয়টি মীর মুন্সীর ওপর ছেড়ে দিয়েছিল? নিজে প্রুফ দেখে ঠিক করে অনুমোদনের কাজ করল না কেন? আমি তার কথায় আসব না; তবে আপনি হুকুম করলে আসব। তার সাথে দেখা করব না, কথাও বলব না। মুহতামিম সাহেব একেই গনিমত মনে করে হযরত থানবীকে দাওয়াত দিলেন।

যথারীতি নির্ধারিত দিনে হযরত থানবী (রহ.) সেখানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন। হযরত থানবী (রহ.) মাদরাসায় জলসায় ওয়ায করে দ্রুত সেখান থেকে চলে এলেন; কারো সাথে দেখা করলেন না, যাতে কারো পীড়াপীড়িতে পড়তে না হয়। ওই দীনদার নেতাও বিষয়টি টের পেয়ে খুব আফসোস করল আর বলল, আলেমগণের মধ্যেও এমন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হতে পারে? তিনি মাদরাসার জন্য বণ্টন করা মিষ্টি থেকে কিছু মিষ্টি হযরত থানবীর নিকটে স্টেশনে একথা বলে পাঠালেন যে, এটি সাধারণভাবে বণ্টন করা কোনো মিষ্টি নয়; বরং এটি আমার নিজের অংশ; আপনার জন্য পাঠিয়েছি।

আপনি তা কবুল করুন। এভাবে বলার পর হযরত থানবী (রহ.) তার মিষ্টি গ্রহণ করলেন।

এভাবে হযরত আলেমদের প্রতি অবজ্ঞার নজরে দেখার চিকিৎসা করতেন যে, পরে তারা অনেক সম্মান করতে আরম্ভ করল।

## ইংরেজের দাওয়াত

'আল ইফাযাতুল ইয়াওমিয়া'তে হযরতের বাণী রয়েছে যে, আমার অনেক সময় ইংরেজদের সাথে সফর করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু কোনো দুষ্টচক্রের দেখা পাইনি। একবার এক বন্ধুর কথায় কলকাতা থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর আসনে বসি। ওই বগিতে রেলওয়ের এক ইংরেজ অফিসার আরোহণ করেছিল, যার স্থান হয়েছিল উপরের তাকে। সে বলল, নিচে জানালার দিকে আমাকে একটু জায়গা দিন। আমার রেলওয়ে ব্যবস্থাপনার জন্য বারবার বাইরে যেতে হয়। আমি বললাম, আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার কোনো সমস্যা নেই। আপনি এখানে বসুন। সে বসে পড়ল। খাওয়ার সময় আমি বন্ধুর মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু খাবেন? সে বলল, আমার কোনো আপত্তি নেই। আমরা বাজার থেকে ওই সময় যা পেলাম, কিনে একটি পাতায় করে রেখে দিয়েছিলাম। সে তা বড় আনন্দের সাথে খেল। একজন জিজ্ঞাসা করল, পাত্রে করে খাওয়া দিলেন না কেন? আমি বললাম, যেহেতু সে আমার প্রতিবেশী ছিল, তাই তার হক আদায় করেছি মাত্র; সম্মান করিনি। কারণ, সে ইসলাম থেকে মাহরুম ছিল। লোকটি স্টেশনে নামতে-নামতে অনেক শুকরিয়া আদায় করল আর বলল, আমার কারণে আপনাদের অনেক কষ্ট হয়েছে। উল্টো আপনি আমার আরামের ব্যবস্থা করেছেন। সফরের অপর এক সহযোগী বলতে লাগল, আপনি পাত্রে খাবার দিলে সে আরো বেশি শুকরিয়া আদায় করত। আমি বললাম, শুকরিয়া না করারও তো আশঙ্কা ছিল। তাকে পাত্রে খাবার দিলে সে নিজেকে বড় মনে করতে পারত। তখন শুকরিয়ার অনুভূতিও থাকত না।

## আল্লাহর ওপর ভরসা

এক সফরে বৃষ্টি হওয়ার কারণে স্টেশনমাষ্টার হযরত থানবীকে একটি গুদামে অবস্থান করতে দিল। রাত্রে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ সেখানে বাতি জ্বালানোর নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তিনি চিন্তা করলেন, নিষেধ করলে এদের খারাপ ধারণা হতে পারে যে, ইসলামে এতো সংকীর্ণতা কেন? কারণ, তারা হিন্দু ছিল। তখন তিনি দু'আ শুরু করে দিলেন। এর পরপরই এক বাবু এসে

কর্তৃপক্ষকে ডেকে বলল, এটা আমাদের দায়িত্ব নয়, সুতরাং জ্বালানোর দরকার নেই। হযরত আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন।

## আখেরাতের ফিকির

একবার হযরত থানবী (রহ.) সাহারানপুর থেকে কানপুর যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে তখন কিছু মাল ছিল। তিনি এর ভাড়া আদায় করার জন্য স্টেশনে তুলতে চেয়েছিলেন; কিন্তু কেউ তুলল না। এমনকি রেলওয়ের হিন্দু কর্মচারীরাও ভক্তিবশত বলে দিল, আপনি নিয়ে যান; আমরা গার্ডকে বলে দেব। হযরত থানবী (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, গার্ড কত দূর যাবে? বলল, গাযিআবাদ পর্যন্ত। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, গাযিআবাদের আগের স্টেশনে কী হবে? তারা বলল, এই গার্ড কানপুরে নিয়ে যাবে। সেখানে তো আপনার গন্তব্য। হযরত থানবী (রহ.) বললেন, না সেখানেই গন্তব্য শেষ নয়। তারপর তো আখেরাতের গন্তব্য আছে। সেখানে কী হবে? একথা শুনে সবাই চুপ হয়ে তাকিয়ে রইল।

## মামূলাতের পাবন্দী

হযরত থানবী বলতেন, প্রত্যেক কাজ সময় মতো করো। একবার হযরত থানবীর ওস্তাদ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.) তাঁর মেহমান হন। হযরত থানবী (রহ.) ওস্তাদের সমস্ত আরামের ব্যবস্থা করার পর তার লেখার জন্য নির্দিষ্ট সময় হলে অত্যন্ত আদবের সাথে ওস্তাদকে বললেন, হযরত! এখন আমার লেখার সময়। এজাযত হলে কিছু লিখতাম। ওস্তাদ লিখার অনুমিত দিলেন। কিন্তু ওই দিন হযরত থানবীর লেখার মধ্যে মন বসছিল না। তারপরও রুটিন যাতে মিস না হয়, তাই একটু লিখে ওস্তাদের খেদমতে উপস্থিত হন।

## ভরসা ও অল্পে তুষ্টি

হযরত থানবী (রহ.) যখন সর্বপ্রথম কানপুর মাদারাসায় যান, তখন তাঁর বেতন ছিল পঁচিশ রুপি। কিন্তু তিনি তাকেই অনেক মনে করতেন। একবার তিনি নিজের বিষয়ে বলেন, আমি ছাত্রজীবনে আমার বেতন দশ রুপি হবে পর্যন্ত মনে করতাম। পাঁচ রুপি নিজের জন্য আর পাঁচ রুপি ঘরের জন্য খরচ করতাম। এর বেশি চিন্তাই করতে পারতাম না।

অনেক সময় সফর থেকে তিনি নিজেও শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তারপর উদাহরণস্বরূপ অন্যকে তা শিক্ষার জন্য বলতেন। তিনি বলেন, সফরের সময়

প্রায়ই আমার একথা মনে হতো যে, হে নফস! এখন সফরে সাথে করে যা নিয়েছ, এ পরিমাণই তো প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট। দু-চার জোড়া কাপড়, বিছানা ও লোটা হাতে আছে। দুমাস ধরে আমার সফর হয়েছে। ঘরের মধ্যে যা কিছু সামান্য রয়েছে, এসব না হলেও চলবে। বরং সফরের সময় সাথে করে নেওয়া কোনো কিছু অতিরিক্ত মনে হলে তা আমার ঘরে পাঠিয়ে দেই। কিন্তু আমি কী করব? আমি তো অতিরিক্ত থেকে বাঁচতে চাই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাকে এগুলো দান করেছেন। আমার বন্ধুগণ! তোমরাও এমন করো। যা না হলেই নয় এমন বস্তু কাছে রাখো। আর অতিরিক্তগুলো ছেড়ে দাও। দেখবে, তোমার বোঝা কমে যাবে।

## যিকির ও শোগলের তরবিয়ত

একব্যক্তি বলেন, আমি হযরত হাজী সাহেবের খেদমতে থাকাকালীন তাঁর সামনে যখন থাকতাম না, তখন সারাক্ষণ যিয়াউল কুলুবের সমস্ত যিকির ও আমলকে সময় অনুযায়ী নির্ধারণ করে সেগুলো নিয়ে মগ্ন থাকতাম। আর মনে করতাম, এগুলো সমস্ত লোকদের জন্য পুরা করা আবশ্যক। একবার হযরতের সামনে একথা বললে তিনি হেসে বললেন, এটি সবক নয়। বরং এর উদাহরণ হলো, কোনো ফার্মেসিতে অনেক প্রকারের ওষুধ রয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, সমস্ত রোগী ওই ফার্মেসির সমস্ত ওষুধ খেয়ে ফেলবে। বরং উদ্দেশ্যে হলো, যে রোগীর জন্য যে ওষুধ উপযোগী, সে সেই ওষুধ খাবে।

ঠিক তদ্রূপ এখানে অনেক পদ্ধতি বলে দেওয়া হয়েছে। যার জন্য যে পদ্ধতি উপকারী বলে বিবেচিত হবে, তা-ই সে অনুকরণ করবে। তারপর আমাদের হযরত বললেন, দস্তরখানায় বিভিন্ন রকমের খাবার রাখার অর্থ এই নয় যে, সবার সব খেতে হবে। বরং যার যে খাবার পছন্দ হয়, তাই সে নিয়ে খাবে। প্রকৃত উদ্দেশ্য এটাই।

# আমীরে শরীয়ত
# মাওলানা আতাউল্লাহ্ শাহ্ বুখারি (রহ.)

হযরত আতাউল্লাহ্ শাহ বুখারি ১৩১০ হিজরির ১৪ই রবিউল আউয়াল রোজ শুক্রবার ভারতের পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাফেয জিয়াউদ্দীন। তাঁর বংশধারার চৌদ্দতম ঊর্দ্ধস্তন পুরুষ সাহাবী হুসাইন রাযি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

তিনি ইবতেদায়ী শিক্ষা ও কুরআন স্বীয় নানার কাছে অর্জন করেন। কেরাত শিখেছেন কারী সাইয়্যেদ উমর আসেম আরবের কাছে। তারপর তিনি পাঞ্জাব গিয়ে কাজী আতা মোহম্মদ-এর মাদরাসায় পড়েন। তারপর ১৯১৪ সনে অমৃতসরে যান এবং মাওলানা নূর আহমদের কাছে কুরআনের তাফসীর পড়েন। মাওলানা গোলাম মোস্তফা কাসেমির নিকট ফিক্হ ও উসুলে ফিক্হ পড়েন। তারপর জামিয়া আশরাফিয়া লাহোরে মুফতী হাসান-এর নিকট হাদীছের শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি পীর মেহের আলী শাহ-এর নিকট থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হন। তাঁর ইন্তেকালের পর মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরির নিকট দ্বিতীয়বার বায়'আত হন এবং খেলাফত অর্জন করেন।

শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরি তাঁর ব্যাপারে বলতেন, তিনি ভারতের একজন বিদগ্ধ আলেম, বড় মুজাহিদ এবং আযাদি আন্দোলনের সক্রিয়কর্মী ছিলেন। ভারত ও পাকিস্তানের কোনো শহর এমন ছিল না, যেখানে তিনি স্বীয় জাদুময়ী বক্তৃতা দ্বারা ঝিমিয়ে পড়া জযবাকে উজ্জীবিত করেননি।

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জালিয়ানাওয়ালাবাগের ঘটনা তাকে রাজনীতির ময়দানে নিয়ে আসে। তিনি দেশ ও জাতির একজন বড় বক্তা ও নেতায় পরিণত হন। তাঁর কারণে ইংরেজরা নাকানি-চুবানি খাওয়া শুরু করে। ফিরিঙ্গিদের বিরুদ্ধে তাঁর যবান থেকে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হতো, তাঁর চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বের হতো। তাঁর কথায় শ্রোতাদের চোখ থেকে অশ্রু বের হতো। তিনি ৪০ বছর পর্যন্ত শিরক-বিদ'আত, কুসংস্কার ও প্রচলিত মন্দ কর্মের বিরুদ্ধে ক্রমাগত জিহাদ করেছেন। তিনি মির্জায়ী মতবাদের শিকড় উপড়ে ফেলেন এবং খতমে নবুওয়াতের আকীদার আন্দোলনকে

নিজের ক্ষেত্র বানান। এভাবে তিনি মির্জায়ী মতবাদের স্বরূপ উন্মোচন করেন। দেশের স্বাধীনতা অর্জন এবং খতমে নবুওয়াতের হেফাযতের জন্য যে পরিকল্পনা করেন, জিহাদের শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করেন। অবশেষে ১৩৮১ হিজরির ৯ রবিউল আওয়াল মোতাবেক ১৯৬২ সনে স্বীয় রবের ডাকে সাড়া দেন।

## শ্রোতাদের নসীহত

হযরত শাহজি (রহ.) বলেছেন, আমি ৪৪ বছর পর্যন্ত লোকদের কুরআন শুনিয়েছি। যদি পাহাড়কে শোনাতাম, তাহলে পাহাড় গলে গেলেও তা আশ্চর্যের কোন বিষয় হতো না। যদি গুহাকে শোনাতাম, তাহলে গুহা নড়েচড়ে বসত। যদি পাথরকে শোনাতাম, তাহলে পাথর হাঁটতে শুরু করত। যদি সমুদ্রকে শোনাতাম, তাহলে সমুদ্র আজীবনের জন্য তরঙ্গায়িত হতো। যদি আমি গাছগাছালিকে আহ্বান জানাতাম, তাহলে তারা কাঁদতে শুরু করত। যদি কংকরকে শোনাতাম, তাহলে কংকর লাব্বাইক বলে দাঁড়িয়ে যেত। যদি জগতকে শোনাতাম, তাহলে জগতের বুকে ফাটল ধরে যেত। যদি বন-বাদাড়কে শোনাতাম, তাহলে বন কাঁপতে শুরু করত। কিন্তু আমার কথাগুলো আমি সেই মানুষগুলোকে শুনিয়েছি, যাদের ভূমি অনূর্বর হয়ে গেছে, যাদের কাছে দেল ও দেমাগের বড়ই আকাল, যাদের বিবেক ক্ষমতা হারিয়ে বরফের মতো শীতল হয়ে গেছে, যাদের পতন চূড়ান্ত পর্যায়ে ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছে., যাদের পাশে দাঁড়ানো বেদনাদায়ক আর পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করা যন্ত্রণাদায়ক, যাদের সবচেয়ে বড় উপাস্যের নাম শক্তি।

## পানাহারের রুটিন

হযরত শাহ সাহেব ভবিষ্যতের ব্যাপারে কিছু চিন্তা করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, সবকিছু আল্লাহর থেকে হয়। বর্তমান অবস্থার সাথে তিনি ওই পরিমাণ সম্পর্ক রাখতেন যে, ব্যস, কখনও হাসতেন, কখনও কাঁদতেন, কখনওবা ব্যথিত হতেন। তার বিছানা, খানা-পিনা, ঘুম, জাগরণ, চিন্তা-ভাবনা, কথা-বার্তা সবকিছুর মধ্যে অতীতের নির্দশন ছিল। তিনি এজন্য তহবন্দ বাঁধতেন যে, নবীজি তহবন্দ বেঁধেছিলেন। তিনি নির্দিষ্ট কোনো খানা-পিনায় অভ্যস্ত ছিলেন না। যা কিছু ব্যবস্থা হতো, তার উপর শুকরিয়া আদায় করতেন এবং খেয়ে ফেলতেন। সর্বদা মোটা কাপড় পরিধান করতেন। অধিকাংশ সময় তিনি বিছানা পেতে ঘুমাতেন এবং বেশি পরিমাণে ঠাণ্ডা পানি পান করতেন।

## হাদিয়া কবুল করার শান

সাধারণত তাঁর নির্দিষ্ট কোনো রুজি-রোযগারের ব্যবস্থা ছিল না। তাঁর কিছু খাছ ভক্ত তাঁকে সাহায্য করতেন। তিনি কখনও না গোপনে হাদিয়া গ্রহণ করতেন এবং না এ বিষয়ে কিছু বলতেন। যখন কেউ হাতের মুঠো বন্ধ করে কিছু দিতে চাইত, তখন তিনি মুষ্টি খুলে দিতেন এবং বলতেন, কেন গোপন করছ? এটা কি চুরি করা কোনো মাল-সম্পদ? তিনি কোনো দল থেকে বিন্দু পরিমাণও গ্রহণ করতেন না। এ বিষয়টি প্রসিদ্ধ ছিল যে, তিনি কোনো দল থেকে এক পয়সাও গ্রহণ করতেন না। বেতন-ভাতা নিতেন না। করজও নিতেন না। তাঁর হিতাকাক্ষীরাই তাঁর সমস্ত প্রয়োজন পুরা করে দিতেন।

## ওয়াদা পূরণ

হযরত শাহ (রহ.) কারো সাথে ওয়াদা করলে তা পূরণ করতেন। বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৩০ দিনই তিনি বয়ান করতেন। কিন্তু সময়ের পাবন্দি করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। মাহফিলে তিনি দেরি করে পৌঁছতেন এবং যাদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হওয়ার কথা, সেখানে পৌঁছতে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে দুই-তিন ঘন্টা বেশি লেগে যাওয়া সাধারণ ব্যাপারে ছিল। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত হলো। তিনি সেকেন্ডেরও হিসাব রাখতেন। কিন্তু হযরত শাহজির সেখানেও পৌঁছতে দুঘন্টা দেরি হয়ে গেছে; রওনার সময় হয়ে গেছে। বন্ধুরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কিন্তু তিনি বিছানায় গা এলিয়ে দিলেন। মিষ্টার গান্ধির সঙ্গেও তিনি একই আচরণ করেছেন। মাওলানা হাবিবুর রহমান বলতেন, হযরত শাহজি (রহ.) ইংরেজদের বিরুদ্ধে এতো জিহাদ করেছেন যে, কয়েকজন মানুষ মিলেও তা করতে পারবে না। অথচ সময়ের অপচয়ের অবস্থা এমন যে, যদি কোনো ইংরেজ বলে, অমুক দিন অমুক দিন ঠিক এতো মিনিটে হযরত শাহজিকে অমুক স্থানে পাঠিয়ে দাও, তাহলে আমরা আযাদীর পরোয়ানা দিয়ে দেব; তাহলে এভাবে কখনও আযাদী মিলবে না। কেননা, হযরত শাহজি আর সময়ের পাবন্দি দুটি বিপরীতমুখী বস্তু।

## বাস্তবতার প্রকাশ

পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পরপর রাওয়ালপিন্ডি শহরে একটি দ্বীনি মাহফিল হয়েছিল। সেখানে হযরত শাহজি (রহ.) আমন্ত্রিত ছিলেন। রাজা গজনফর আলী খান মন্ত্রী ছিলেন। জলসার সভাপতি হযরত শাহজিকে বক্তৃতা করার

আহ্বান জানিয়ে বললেন, হযরত শাহজি যে লীগের বিরোধী ছিলেন, সেই লীগই তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে।

হযরত শাহজি (রহ.) বসা থেকে উঠে জবাব দিলেন, হাঁঃ ভাই! ওই আশ্রয় আজই মিলেনি; এর মধ্যে অনেক লম্বা ইতিহাস আছে। আমার বাবাও পিটুনি দেওয়ার পর তোমার বাবার ঘরে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। একথা শুনে পুরো জলসায় নীরবতা নেমে এসেছিল।

## জেলে যাওয়ার কারণ

খতমে নবুওয়ত আন্দোলনের সময় হযরত শাহ সাহেব (রহ.) কোনো এক জেলখানায় আটক ছিলেন। ওই সময় একজন বড় সরকারি অফিসার এসে কথা প্রসঙ্গে বলল, শাহজি! এখন ইসলামি হুকুমত আছে। আগে জেলে যাওয়ার সময়ে লোকেরা সম্মান করত। এখন আর ওই দিন নেই। মানুষ এগুলো ভুলে যাবে। আপনি আন্দোলন ছেড়ে দিন। আপনি অন্য কিছু করুন। শাহ সাহেব (রহ.) বললেন, ঠিক আছে ভাই! কিন্তু আমি কখনও কোনো মানুষের জন্য জেলখানায় যাইনি। আমি তো ইসলাম ও স্বাধীনতার জন্য জেলে গিয়েছি। আর ইসলামি হুকুমতের বিষয়ে তোমাদের সাথে আমি একমত। কিন্তু মনে রেখো, ইসলামি হুকুমতের জন্যও কিছু লোক জেলে যায়।

## বক্তৃতার প্রভাব

খান গোলাম মুহাম্মদ খান বলেন, আমি হযরত শাহজিকে দেখেছি। রাজনৈতিক চিন্তাধারায় তাঁর সাথে আমার মতপার্থক্য ছিল। আমি একবার ঈশার সময় দিল্লীর ফটকের বাইরে দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন দেখি, শাহজি আলোচনা পেশ করছেন। আমি তখন এক জরুরি কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আমি মনে-মনে ভাবলাম, যাঁর আলোচনার এতো খ্যাতি, তাঁর কিছু কথা পাঁচ মিনিট হলেও শুনে যাই। কোনো মজলিসে দীর্ঘ সময় বসা আমার অভ্যাসে ছিল না। পনেরো মিনিট শুনার পর চিন্তা করলাম, আরো কিছু শুনি। তার কথার এতো জাদু ছিল যে, আমি দাঁড়িয়ে শুনতে-শুনতে বসে পড়লাম। এভাবে শুনতে-শুনতে আমার সারা রাত পার হয়ে গেল। আমি আমার কাজের কথাই ভুলে গেলাম। যখন সুবহে সাদিকের মুহূর্তে শাহ সাহেব তাঁর আলোচনা সমাপ্তির ঘোষণা করলেন, তখন আমি বুঝতে পারলাম, রাত শেষ হয়ে গেছে। এই ব্যক্তি তো আলোচনা করেননি; বরং জাদু করেছিলেন।

## ছাত্রদের প্রতি মমতা

১৯৫০ সনের হজের সময় শাহ সাহেবের সাথে তাঁর একজন প্রিয় শাগরেদও ছিল। তিনি বলেন, মক্কায় আমি বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষাতের জন্য চলে যেতাম অথবা কোনো ইজতেমায় শরীক হতাম। যোহরের পর যখন হারাম শরীফ থেকে বিশ্রামের সময় হযরতের খেদমতে হাজির হতাম, তখন দেখতাম, হযরতের সামনে খানা উপস্থিত এবং তিনি অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাকে দেখে অত্যন্ত স্নেহভরে বলেছেন, তোমার তো খাওয়ার কথাই মনে নেই। তোমার জন্য রুটি রেখেছি। এটা তোমার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত; খেয়ে নাও।

## ঘনিষ্ঠজনদের সাথে সম্পর্ক

হযরত শাহজি ঘনিষ্ঠ কেউ দেখা করতে এলে খুব খুশি হতেন। কখনও বলতেন, তুমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়েছ। বিদায়ের সময় কখনও বলতেন, দেখি আবার কবে দেখা হয়। তার এক খাদেম বলেন, আমি একবার মুরাদাবাদ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসছিলাম। হযরত শাহজি সাহেব মওলবি আবদুল মান্নানকে বলে দিলেন, তাঁকে স্টেশনে গিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেটে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে আসো। ওই সময় চলার পথে আমি দেখলাম, তার চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে। ধৈর্য বলে, নিয়ন্ত্রণহারা হয়ো না আর মহব্বত বলে, কোনো সমস্যা নেই।

# হযরত শাহ্ আব্দুল কাদের রায়পুরি (রহ.)

হযরত শাহ্ আব্দুল কাদের রায়পুরির জন্ম ১২৯৫ হিজরিতে সারগুধা জেলায়। তাঁর পিতা হাফেয আহমাদ একজন উঁচু মাপের বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর খান্দান ছিল একটি দ্বীনি ও ইল্‌মি খান্দান। তিনি স্বীয় অগ্রজ মাওলানা কালীমুল্লাহর কাছে কুরআন শিখেছেন। ফারসির কিছু কিতাবও তাঁর কাছে পড়েন।

সরফ ও নাহুর কিতাব রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহির ছাত্র মাওলানা রফীকের কাছে পড়েন। তারপর তিনি হিন্দুস্তানের বিভিন্ন মাদরাসায় দরসে নেযামীর বিভিন্ন কিতাব পড়েন। তারপর পড়াশোনা শেষ করেন। তিনি মানতেক ও দর্শনে খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি হাদীছের কিতাবসমূহ দিল্লীর আব্দুর রব মাদরাসায় মাওলানা আবদুল আলীর কাছে পড়েন। দিল্লীতে থাকাকালীন তিরমিযির কিছু হাদীছ পড়েন।

পড়াশোনা শেষ হওয়ার পর তিনি ইউনানী চিকিৎসাবিদ্যা অর্জন করেন। তারপর বিজনুর জেলায় চেম্বার নিয়ে বসেন। তারপর কিছুদিন বেরেলিতে কুরআন ও হাদীছের দরস দেন। কিন্তু তার অস্থির মন কোনো কাজে তাঁকে লেগে থাকতে দিত না। শেষ পর্যন্ত তিনি হকের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পাগলের মতো হয়ে যান। এমতাবস্থায় তিনি শায়খ মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরির খেদমতে আসেন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি এতো প্রভাবিত হয়ে পড়েন যে, তাঁর কাছেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

আবদুর রহীম রায়পুরি (রহ.) তাঁকে কিছুদিন গাঙ্গুহ যাওয়ার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি তাঁর কাছেই থাকার ব্যাপারে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তখন শায়খ আবদুর রহীম তাকে বায়'আত করেন। তারপর থেকে যিকিরের তালকীন করেন। তারপর থেকে আবদুর কাদের রায়পুরি সারাজীবন হকের স্মরণ ও হযরত আবদুর রহীম রায়পুরির খেদমতে কাটিয়ে দেন। সব সময় রিয়াজত, মুজাহাদা ও যিকিরে থাকতেন। তাঁর শায়খ তাঁর প্রতি আজীবন সন্তুষ্ট ছিলেন। মৃত্যুর সময় তাকেই স্বীয় খলীফা করে স্থলাভিষিক্ত করেন এবং তাকে রায়পুরেই থেকে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এ কারণেই তাঁর নামের সাথে রায়পুরি শব্দ যোগ হয়।

শায়খের ইন্তিকালের পর তিনি তাঁর স্থালভিষিক্ত হন। তারপর দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি তালকীন ও ইরশাদের কাজ করেন। স্বীয় আমল ও ইখলাস দ্বারা নবীর উম্মতের খেদমত করেন। লক্ষ-লক্ষ মুসলমানকে গোনাহ ও নাফরমানি থেকে তাওবা করান। শত-শত আলেমকে রূহানি ফয়েজ দ্বারা উপকৃত করেন। অনেককে তিনি খেলাফত দান করেন। সারাজীবন হকের অনুসন্ধানীদের ইসলাহ ও তরবিয়ত করার পর যিন্দেগির মনযিল অতিক্রম করার পর ১৩৮২ হিজরির ১৪ই রবিউল আওয়ালে চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়ে যান।

## অধ্যয়নের আগ্রহ

হযরতের কিতাব শোনার খুব আগ্রহ ছিল। কোনো সময় তিনি কিতাব শোনার মধ্যে এতে মগ্ন হয়ে যেতেন যে, মনে হতো, কিতাব না শুনলে তাঁর হুশ ফিরে আসত না। সাহারানপুরে থাকাকালীন অনেক সময় দেখা গেছে, ফজরের পর বিশ্রাম শেষ হলে সাথে-সাথে আযাদ সাহেবের ডাক পড়ত। তারপর ফুতুহুশ শাম অথবা সাহাবীদের যিন্দেগির কোনো কিতাব পড়ে শোনানোর হুকুম করতেন। আযাদ সাহেব কোনো প্রয়োজনে উঠে গেলে আবার তাঁর ডাক পড়ত। চুপ হয়ে গেলে বলতেন, চুপ হয়েছ কেন? তাঁর কিতাব শুনার আগ্রহ কেমন ছিল, তা এভাবেও অনুমান করা যায় যে, একবার আমি ৬০ হিজরির অক্টোবরে রায়বেরেলীতে সংবাদ দিলাম, তারিখে দাওয়াত ও আযীমতের তৃতীয় খণ্ডে খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়ার জীবনী সংকলন শেষ হয়েছে। এতথ্য জানানোর কিছুদিন পর আমি রায়পুরে উপস্থিত হই। মুসাফাহা করার সাথে-সাথে তিনি কিতাবের পাণ্ডুলিপি চাইলেন। ওই সময়ই আমাকে তা থেকে পড়ে শোনানোর নির্দেশ দিলেন। নামাযের পরও তা অব্যাহত ছিল। কিতাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো কাজ করার সুযোগ ছিল না।

## আত্মার অবস্থায় শক্তিবৃদ্ধি

রায়পুরে যে-ই প্রথম প্রথম গমন করত, তাকে সর্বপ্রথম বেশি-বেশি যিকিরের কথা বলা হতো। মনে হতো, এখানে সবসময় আল্লাহ-আল্লাহ শব্দের গুনগুনানি জারি থাকে। দিবারাত্রির খুব কম সময় পাওয়া যেত, যখন যিকির হতো না। সামান্য যোগ্যতার অধিকারী কোনো লোকও এই বিষয় অনুভব করতে পারত যে, পুরো রায়পুরে যেন শান্তি ও নিরাপত্তার চাদর বিছানো আছে। ওখানে এসে প্রত্যেক বিপদগ্রস্ত কিংবা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোক শান্ত ও চুপ হয়ে যেত।

কোনো দূরদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম জ্ঞানসম্পন্ন লোক বুঝতে পারতেন, হযরতের নেসবতের প্রভাব পুরো পরিবেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। সেখানে হযরতের যত কাছাকাছি হওয়া যেত, ততই তা পরিষ্কার অনুভব হতো, যেন প্রশান্তির মারকায এটি, যা আল্লাহ প্রশান্ত আত্মা, বিশ্বাস ও সন্তুষ্টির বিনিময়ে দান করেন।

## এক মজলিসের ঘটনা

রায়পুর খানকার একব্যক্তি হযরত শাহ সাহেবের মজলিসের একটি ঘটনা শোনাতে গিয়ে বলেন, একবার মনে হলো, বুযুর্গের মজলিসে অভ্যন্তরীণ অবস্থায় জোয়ার আসে; কিন্তু আমি তো কিছুই দেখি না। ওই দিন আমার সেখানে অবস্থানের শেষ দিন ছিল। মাগরিবের পর যিকিরে বসার পর আমার ভিতর বিস্ময়কর পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। মনে হতে লাগল, আল্লাহ যেন আমার সামনে আর হযরত আমার পাশে। তাঁরা আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন। সমস্ত যাকিরীনের অবস্থা এমন ছিল। দীর্ঘ সময় যিকির করে শেষে অপারগ হয়ে ছেড়ে দিয়ে হযরতের খেদমতে উপস্থিত হয়ে সব খুলে বললাম। আযাদ সাহেব তো পঙ্‌ক্তি বলা আরম্ভ করলেন। হযরত বললেন, লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। তারপর সব অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেল।

## শায়খের মহব্বত

হযরত অত্যন্ত মহব্বত ও দরদ-মায়ার অধিকারী ছিলেন। এটি তাঁর স্বভাবজাত বিষয় ছিল। এজন্য বড়-বড় আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের যাঁরা এখানে বেশি-বেশি গমন করতেন, তাঁদের প্রতি হযরতের বিশেষ দৃষ্টি ও আন্তরিক ভালোবাসা ছিল। খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়ার সাথে তাঁর আন্তরিক মহব্বত ছিল। ১৯৫৯ সনে লাহোরে অবস্থানের সময় হাজী মতীন আহমাদের বাড়িতে 'তাযকেরায়ে মাওলানা ফযলুর রহমান' পড়ছিলাম। ওই জীবনী তখনো বই হয়নি। আমার কাছে এর একটি অসম্পূর্ণ পান্ডুলিপি ছিল। জীবনী পড়ার সময় পুরো মজলিসে এক ভিন্ন রকম অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছিল, যা বাস্তবে হযরতের অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিপরীত ছিল। যেন কেউ বলছিল-

پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق • سامان صد ہزار نمکداں کئے ہوئے

কোনো কোনো আহলে মজলিস বলেন, আগে কখনও মজলিসের অবস্থা এমন দেখিনি। হযরত (রহ.) বলেন, বড় মহব্বতের কথা ছিল। মহব্বতের কথার প্রতিও মহব্বত অনুভূত হয়ে থাকে।

## সুন্দর ও চাকচিক্যের মাপকাঠি

একবার হযরত মসজিদে নববীতে ছিলেন। আমি আরজ করলাম, হযরত! পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা এই মসজিদে দারুণভাবে সজ্জিত ও আলোকময় করেছে। দামী-দামী গালিচা ও কার্পেট বিছিয়েছে। হায়! যদি এই মসজিদ আগের মতো সাদাসিধে হতো। জানা ছিল না; ওই সময় হযরত কোন অবস্থার ভিতর ছিলেন। একথা শুনে হযরতের ভিতর জোশ এসে গেল এবং বললেন, জগতে সৌন্দর্য বলতে কিছু আছে এবং তার সদকাও আছে।

## নবীপ্রেম

মৃত্যুর আগে অসুস্থতার সময় মদীনা মুনাওয়ারার কথা শুনে হযরত অন্য রকম হয়ে যেতেন। কখনও তিনি উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠতেন। তখন মাওলানা মুহাম্মদ আনোওয়ারী ওমরার জন্য রওনা হচ্ছিলেন। হযরতের কাছে তিনি বিদায় নেওয়ার জন্য আসছিলেন। মদীনার কথা শোনার সাথে-সাথে হযরত অঝোরে কাঁদতে শুরু করলেন। মাওলানা মুহাম্মদ বললেন, আমি কখনও হযরতকে এর আগে এভাবে আওয়াজ করে কাঁদতে দেখিনি। তখন বাবু আব্দুল আযীয সাহেব এলেন। তাকে দেখে হযরত বললেন, দেখো, এই ব্যক্তি মদীনা মুনাওয়ারা যাচ্ছে। একথা বলেই হযরত বেহুঁশ হয়ে গেলেন।

## বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশ

একবার ফয়সালাবাদে থাকাকালীন হযরতের বন্ধু-বান্ধব ও খাদেমগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, এবার হযরত রমযান মাসে কোথায় থাকবেন? ফয়সালাবাদের অধিবাসীরা ফয়সালাবাদের কথা বলল, লাহোরের লোকেরা লাহোরের কথা বলল। কুরাইশী সাহেব রাওয়ালপিন্ডির কথা বললেন। হযরত এ অবস্থা দেখে একদিন সাহরীর সময় উপরোক্ত তিন দলের সবাইকে ডেকে বললেন, দেখো, আমি একজন গরিব কৃষকের ছেলে। ছাত্রজীবনে আমার ঘরের অবস্থা এমন ছিল যে, আমার আম্মা চিন্তা করতেন, রুটির ব্যবস্থা কিভাবে হবে? আমি মেধাহীন ছেলে ছিলাম। যা পড়েছি, তা ভুলে গেছি। আর এখন তোমরা যারা আমাকে নিয়ে টানাটানি করছো, কেউ এদিকে আর কেউ ও দিকে আমাকে নিতে চাচ্ছ, এ তো শুধু আল্লাহর নাম নেওয়ার বরকতেই হয়েছে। তোমরা নিজে-নিজে কেন ইখলাসের সাথে আল্লাহর নাম নিচ্ছ না? আমাকে কেন এ ব্যাপারে লজ্জা দিচ্ছ? তখন হযরতের কথায় এতো প্রভাব ছিল যে, অনেকেই সেদিন একথা শুনে কেঁদেছিলেন।

## দানশীলতার ঘটনা

গায়েবীভাবে হযরতের প্রয়োজন পূরণ হতো। আবার সাথে-সাথে তা খরচ হয়ে যেত। টাকা সাথে রাখা এবং রাতে তা নিয়ে ঘুমানো তাঁর জন্য বোঝাস্বরূপ ছিল। খাদেম কিছু এনে দিলে তখনই অন্য খানকার খাদেম বা অভাবী লোকদের তা দিয়ে দিতেন। হাজী ফজলুর রহমান বলেন, শুধু আমার হাত দিয়েই হযরত কয়েক লক্ষ রুপি অন্যদের দান করেছেন। কোনো কোনো আলেমকে ওযীফা দেওয়ার নাম করে শত শত টাকা দেওয়ার নিয়ম ছিল।

এক খাদেম হজের সফরে গিয়ে হেজায থেকে মিসর ও সিরিয়া চলে গিয়েছিল। তার এক সঙ্গীকে হযরত ডেকে এক হাজার মুদ্রা দিয়ে বললেন, তাকে বলো, তোমার স্বাস্থ্য সামুদ্রিক ভ্রমণের জন্য উপযোগী নয়। এজন্য তুমি বিমানে সফর করো। মোটকথা, টাকার ব্যবস্থা হলেই তিনি সাথে-সাথে কোনো খাতে খরচ করে ফেলতেন।

## দানের পরিমাণে ঢেউ

একবার এক মজলিসের আয়োজন ছিল। অনেক হযরত বসা ছিলেন। কোনো এক লোক হযরতের সাথে মুসাফাহা করতে গিয়ে বলল, হযরত! দশ রুপি লাগবে। হযরত বললেন, আল্লাহর কাছে দু'আ করো। তারপর তিনি চুপ হয়ে গেলেন। একটু পর এক লোক এসে একশত রুপি এনে হযরতের হাতে দিলেন। হযরত জোরে বললেন, আরে ভাই! যে দশ রুপি চেয়েছিল, সে কোথায়? সে বলল, আমি আছি হযরত! হযরত বললেন, দশ রুপি নিয়ে নাও। লোকটি বলল, হযরত! এ তো একশত রুপি। হযরত বললেন, নাও। তোমার জন্য ঢেউ এসেছে।

## মমতার ঘটনা

হযরতের দরদ-মায়ার কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন বললেন, হযরত এতো দয়াবান ছিলেন যে, মায়েদের দয়া এর ওপর কুরবান হয়ে যাবে। আমি আমার ৫২ বছরে এবং হযরতের সাথে ২৭ বছরের সম্পর্কের যিন্দেগিতে কোনো মা, ওস্তাদ, বন্ধু বা কোনো বুযুর্গকে এরকম দয়ালু দেখিনি। হযরতের কোনো মেহমানের অসুস্থতা হলে তার রাতের ঘুম চলে যেত।

হযরতের সাথে যারা-ই মিশত, তারা প্রত্যেকেই মনে করত, হযরত আমাকেই মহব্বত করেন – অন্য কাউকে নয়। হযরতের ভিতর বিজলির মতো এরকম মহব্বত ছিল যে, যত বড় বিপদগ্রস্ত হোক না কেন, হযরতকে

দেখেই সব কষ্ট ভুলে যেত। অন্য একজন বলেন, আমি আমার সারা জীবনে এরকম ভালোবাসার মানুষ দেখিনি। কেউ স্বীয় বিবিকেও এতো মহব্বত করতে পারে না, যে রকম মহব্বত হযরত আমাদের মতো লোকদের করে থাকেন। একবার খাওয়ার পর আমি আরজ করলাম, হযরত তো কিছুই খেলেন না। তখন হযরত অত্যন্ত মহব্বতের ভাষায় আমাকে বললেন, তোমার খাওয়া মানেই আমার খাওয়া।

# হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)

হযরত মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) ১৩০৩ হিজরিতে ভারতের মুযাফফরনগর জেলার কান্ধলা নামক এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মৌলবী ইসমাঈল তখন দিল্লীর উপকণ্ঠে নিযামুদ্দিনে থাকতেন। তিনি হাফেযে কুরআন ও আলেম ছিলেন। তিনি একজন দুনিয়াবিমুখ ও রাতভর জেগে-জেগে ইবাদাতগুজার বুযুর্গ ছিলেন। যিকির, ইবাদাত এবং আল্লাহর কালামের শিক্ষাদান তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহির সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) পিতার কাছে কুরআন হেফয করেন। ফারসি-আরবি কিতাবগুলোও পিতার কাছে পড়েন। তারপর তাঁর বড় ভাই মাওলানা ইয়াহইয়া তাঁকে সাথে করে গাঙ্গুহ নিয়ে যান। তখন গাঙ্গুহ রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহির উচ্চমানের সিফাতের বদৌলতে আলেম ও নেককারগণের মারকাযে পরিণত হয়েছিল। মাওলানা ইলিয়াস (রহ.) গাঙ্গুহতে আট-নয় বছর অবস্থান করেন। এখানে তাঁর ইল্‌ম ও দীনের লাইনে উত্তম শিক্ষা অর্জিত হয়েছে। রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহির কাছে তিনি বাই'আত হন।

১৩২৬ হিজরিতে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসানের দরসে অংশগ্রহণের জন্য দেওবন্দ গমন করেন। ওখানে তিনি তিরমিযি ও বুখারির হাদীছ শোনেন। তার পরের বছরগুলোতে তিনি স্বীয় ভাইয়ের কাছে হাদীছ পড়েন। হযরত গাঙ্গুহি (রহ.)-এর ওফাতের পর তিনি মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরির নিকট থেকে সুলুক পূর্ণ করেন।

তারপর তিনি সাহারানপুরের মাদরাসা মাযাহিরুল উলূমে শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৩৩৪ হিজরিতে তিনি হজ করেন। তার এক বছর পর বড় ভাই মাওলানা ইয়াহয়ার ইনতিকাল হলে তিনি নিযামুদ্দিনে স্থায়ীভাবে অবস্থানের লক্ষ্যে দিল্লী আসেন।

নিযামুদ্দিনে একটি ছোট পাকা মসজিদ একটি ছোট কাচা ঘর এবং একটি কক্ষ ছিল। নিযামুদ্দীন আওলিয়ার দরগাহের দক্ষিণ পাশে একটি ছোট আবাদী জমি ছিল। কিছু মেওয়াতী ছেলে এবং মেওয়াত ছাড়া অন্যান্য স্থানেরও কিছু ছাত্র হযরতের কাছে পড়ালেখা করত। হাদীছের দরসও হতো।

তাঁর সবচেয়ে মহান কীর্তি হলো দাওয়াত ও তাবলীগের আন্দোলন চালু করা। এই আন্দোলন মেওয়াত থেকে শুরু হয়েছিল। এখানকার লোকেরা শুধু নামে মুসলমান ছিল। অধিকাংশ জীবনযাত্রা হিন্দুদের সাথে মিলে যেত। হযরত দিন-রাত পরিশ্রম করে এই এলাকায় অনেক মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন। সাথে-সাথে ক্রমান্বয়ে ইসলাহ্ ও তাবলীগের কাজ প্রসার হতে লাগল।

তারপর হযরত দাওয়াত ও তাবলীগের সাধারণ নীতি নির্ধারণ করেন এবং তাবলীগের গাশত শুরু করেন। তিনি অন্যদেরও দাওয়াত দিতে লাগলেন যে, সাধারণ মানুষের মাঝে গিয়ে তাদেরকে দীনের প্রাথমিক ধাপ অর্থাৎ কালিমায়ে তাওহীদ ও নামাযের দাওয়াত দিলেন। তারপর জামাত বানিয়ে তাদের বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগের জন্য পাঠালেন। কিছুদিন পর এভাবে চেষ্টা করার পর আল্লাহ এই কাজে এতো বরকত দিলেন যে, অনেক দূর পর্যন্ত এই তাবলীগ জামাত যাওয়া শুরু হয়ে গেল। হযরত অত্যন্ত বিনয়ী, সীমাহীন নিরীহ মেজাজের অধিকারী এবং দুর্লভ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি ইল্‌ম, দুনিয়াবিমুখতা, তাকওয়া ও বুযুর্গির খনি ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ এর প্রচার ও প্রসারে কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি হাজার-হাজার এমন সাথী বানিয়ে গেছেন, যাঁরা তাঁর পরে এই মেহনত চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি ১৯৪৪ সনের ১৩ জুলাই স্বীয় রবের ডাকে সাড়া দেন।

## দাওয়াত ও তাবলীগ

হযরত মাওলানার নিকট অক্ষম, দুর্বল ও ব্যস্ত মানুষের এই সংক্ষিপ্ত জীবনে স্বীয় দুর্বলতা ও অক্ষমতার সাথে-সাথে অধিক কার্যকরী ও উপযোগী উপকারিতা এবং ছাওয়াবের কারণ সম্বলিত এই ভালো কাজের প্রতি আহ্বান এবং তাবলীগের কাজ ছাড়া অন্য আর কিছুই ছিল না। যদি কেউ সারাদিন রোযা রাখে এবং রাতভর নফল নামায পড়ে এবং প্রতিদিন এক খতম কুরআন পড়ে অথবা প্রতিদিন লক্ষ-লক্ষ রুপি সদকা করে তবুও সে ছাওয়াবের ক্ষেত্রে ওইসব লোকদের সমতুল্য হতে পারবে না, যারা তাদের তাবলীগের কারণে অসংখ্য মানুষের নামায, আমল ও ঈমানের ছাওয়াব প্রতি মুহূর্তে অর্জন করছে। কোন এক ব্যক্তির আমল, ইখলাস কখনও হাজার হাজার লোকের আমল ইখলাসের সমান হতে পারে না।

এজন্যই মাওলানা ইলিয়াস ব্যক্তিগত আমলের চেয়ে ভালো কাজের তাবলীগের ওপর গুরুত্বারোপ করতেন। এই মেহনতকে অধিক আবশ্যক বলে মনে করতেন। এক বুযুর্গ যিনি স্বীয় জীবনে অনেক বড়-বড় দীনের খেদমত করেছেন এবং বর্তমানে শারীরিক দুর্বলতার কারণে স্বীয় এক বন্ধুর

মাধ্যমে পরামর্শ দিলেন, এখন আমি আর নিজে কিছু করতে পারি না। এখন সময় কম; কিন্তু কাজ বেশি। এজন্য এখন বাস্তবতা ও সময়ের দাবি হলো, নিজে অন্যের আমলের মাধ্যম হয়ে যাই। আলোচনা, লেখালেখি, চিঠিপত্র এবং উৎসাহের মাধ্যমে স্বীয় পরিচিত ও বন্ধু-বান্ধবদের এই দাওয়াত ও তাবলীগের প্রতি মনোযোগী করেন এবং এর ছাওয়াবের অধিকারী হয়ে যান।

## সমস্ত আমলের মাপকাঠি

হযরতের প্রতিটি কর্ম দ্বীনি ফায়দা অর্জনের আশায় ভরপুর ছিলেন। এর জন্যই তিনি কথা বলতেন, বয়ান করতেন। এর জন্য তিনি রাগ করতেন। এর জন্য আনন্দিত হতেন। যে বিষয় এই উদ্দেশ্য থেকে খালি হতো, তার থেকে তিনি দূরে থাকতেন। মাওলানা মানযুর নোমানীর বক্তব্য অনুযায়ী তিনি নিয়ত ছাড়া এক কাপ চাও পান করতেন না, অন্যকেও খাওয়াতেন না।

## বিনয় ও অক্ষমতা প্রকাশ

তিনি এতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং উপস্থিত বুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে, একই কাজ সম্পর্কে একেক ধরনের মানুষের সাথে যার-যার অবস্থা অনুযায়ী আলোচনা পেশ করতেন, এ ব্যাপারে নির্দেশনা দিতেন। মাওলানা মানযুর নোমানী (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন, এর দ্বারাই বিষয়টি অনুমান করা যায়। জীবনের শেষ দিকে হযরত যখন ঠিকমতো ওঠা-বসা করতে পারতেন না, তখন এক দুপুরে নিযামুদ্দীন বসতিতে পৌঁছেন। যোহর নামাযের জন্য কিছু মেওয়াতী খাদেম হযরতকে ওযু করাচ্ছিল। ঠিক তখনই আমার প্রতি হযরতের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। ইশারা দিয়ে ডেকে বললেন, মাওলানা সাহেব! সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) দীর্ঘ দিন নবীজিকে ওযু করতে দেখা সত্ত্বেও তার পরে আবুবকর (রাযি.)কে ওযু করতে দেখেছেন। তারপর ওমর (রাযি.)-এর ওযুও দেখেছেন। এভাবে আমলীভাবে হতে হতে আলী (রাযি.)কেও ওযু করতে দেখেছেন।

হযরতের এই ইশারা শোনার পর যখন আমি সে রকম খেয়াল নিয়ে হযরতের ওযু দেখতে লাগলাম। তখন আমার মনে হলো, এমন অসুস্থ অবস্থায় হযরতের ওযু থেকেও আমাদের জন্য শেখার অনেক কিছু আছে। হযরতকে যে তিন-চারজন লোক ওযু করাতেন, তারা সবাই মেওয়াতের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি এসব খাদেমকে ইশারা করে বললেন, এরা আমাকে ওযু করায়। আমি তাদের বলছি, তোমরা আল্লাহর জন্য আমার সাথে মহব্বত করো এবং আমার খেদমত করো।

অপরদিকে তোমাদের ধারণা হলো, আমি ভালোভাবে নামায পড়ি, যেমন তোমরা পড়তে পার না। এজন্য তোমরা এ নিয়তে আমাকে ওযু করিয়ে দিচ্ছ যে, হে আল্লাহ! আমরা মনে করি, তোমার এই বান্দার নামায সুন্দর হয় যে রকম আমাদের হয় না। এই আশায় আমরা তাকে ওযু করতে সাহায্য করি, যাতে আমরাও তাঁর নামাযের ছাওয়াবের অংশীদার হই। আর আমি এই দু'আ করি যে, হে আল্লাহ! তোমার এই সাদাসিধে বান্দাগণ আমার বিষয়ে এমন ধারণা পোষণ করছে। তুমি তাদের ধারণার প্রতি সম্মান জানিয়ে আমার নামাযকে কবুল করে নাও। সাথে-সাথে তাদের নামাযও কবুল করো। তারপর হযরত বলেন, আমি যদি মনে করি, আমার নামায তাদের চেয়ে ভালো, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যাখাত হয়ে যাব। আমি তো এটাই মনে করি যে, এই বান্দাগণের ওসিলায় আল্লাহ যেন আমার নামাযকে ফিরিয়ে না দেন।

## আখেরাতের চিন্তা

হযরতের অন্তরে কিয়ামত ও আখেরাতের চিন্তা আসত যে, হাসান বসরির এই উক্তিটি মনে হতো-

كَأَنَّهُمْ رَأَىٰ عَيْنٍ

সাহাবীদের সামনে আখেরাত এমন ছিল, যেন তাঁদের চোখের সামনে আখেরাত দেখা যাচ্ছে। একবার তিনি এক মেওয়াতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, দিল্লী কেন এসেছ? নিরীহ মেওয়াতী লোকটি জবাব দিল, দিল্লী দেখার জন্য এসেছি। তারপর মাওলানার হাবভাব বুঝে লোকটি নিজের ভুল বুঝতে পেরে সাথে-সাথে বলল, জামে মসজিদ দেখার জন্য এসেছি। তারপর আবার কথা পরিবর্তন করে বলল, আপনার সাথে দেখা করার জন্য এসেছি। তখন মাওলানা বললেন, জান্নাতের সামনে দিল্লী আর জামে মসজিদের কোনো মূল্য আছে কি? আর আমি কে, যার যেয়ারতের উদ্দেশ্যে তুমি দিল্লী এসেছ? তারপর তিনি জান্নাতের আলোচনা শুরু করলেন। তখন মনে হলো, জান্নাত যেন সামনে বিদ্যমান।

## দাওয়াত দিতে থাকো

কোনো মজলিসে যতক্ষণ পর্যন্ত মাওলানার স্বীয় দাওয়াতের মেহনতের কথা পেশ করা সুযোগ হতো না, ততক্ষণ তিনি সেখানে অংশগ্রহণ করতে চাইতেন না। তিনি বলতেন, কোথাও গেলে নিজের কথা নিয়ে যাও এবং তা

পেশ করো। নিজের দাওয়াতকে সবার আগে রাখো। একবার আমি মাওলানা সাইয়্যেদ সুলাইমান সাহেবের একটি উক্তি শুনিয়েছিলাম, যা তিনি কোনো সময় বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, নিজের একটি কথা নিয়ে যেতে হলে অন্যদের দশটি কথা শুনতে হয়। মাওলানা অনেকক্ষণ আনন্দ করলেন এবং বললেন, তিনি তা অনেক বড় ব্যথা নিয়েই বলেছিলেন।

## স্থান ও অবস্থা বুঝে কথা বলা

একবার দিল্লীতে কোনো এক পরিচিত লোকের বিবাহ মজলিসে মাওলানার অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। তিনি বিবাহের মজলিসে আগত সবার সামনে বিবাহের দুই পক্ষকে লক্ষ করে বললেন, আজ আপনাদের খুশির দিন, যেদিন সাধারণ লোকদেরও খুশি করা হয়। বলুন, আপনাদের মাঝে কারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুশি করতে চান?

তারপর তিনি তাবলীগ ও নবীজিকর্তৃক আনীত দীন ইসলামকে যিন্দা করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা ও পরিশ্রম করাকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আরাইহি ওয়াসাল্লামকে খুশি করার সবচেয়ে বড় মাধ্যম বলে আখ্যায়িত করেন। তারপর এর জন্য উপস্থিত সবাইকে দাওয়াত দিলেন।

## অনর্থক বিষয় থেকে বেঁচে থাকা

অনর্থক বিষয় থেকে তিনি সর্বদা দূরে থাকতেন। তিনি একে ঘৃণা করতেন। অন্যকেও এ বিষয়ে ওসিয়ত করতেন। তাবলীগে গমনকারীদের এ বিষয়ে খুব তাকিদ করতেন। তিনি বলতেন, অনর্থক বিষয়ে ব্যস্ততা কাজের মূল্যকে কমিয়ে দেয়। যে কাজে তিনি ঢনের কোনো ফায়দা দেখতেন না, সে কাজকে তিনি সময়ের অপচয়ের কারণ বলে মনে করতেন। একবার আমি চবুতরায় দাঁড়িয়ে খুব আগ্রহের সাথে মৌলবী সাইয়্যেদ যোবায়ের হাসানের কাছ থেকে কোনো পুরনো ঘটনা এবং তাবলীগী সফরের বিবরণ শুনছিলাম। মাওলানা তা শুনে বললেন, এ তো অতীত হয়ে গেছে। এখন কোনো কাজের কথা হোক।

## আত্মার খাদ্য

একবার মাওলানা ইশকের সংজ্ঞা এভাবে করেন যে, যখন সব কিছু বের হয়ে কোনো একটির মধ্যে সব ভালোবাসা একত্রিত হয়ে যায়, তখন তাকে ইশক বলে। দীনের ব্যাপারে মাওলানার ইশক এ রকমই ছিল। এ বিষয়ে তাঁর রূহের সাথে একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেছিল, যা তাঁর বাহ্যিক

অনুভূতি ও স্বভাবগত পছন্দকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এর দ্বারা তাঁর মাঝে ওই শক্তি, অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল, যা মানুষের খাদ্য দ্বারা অর্জিত হয়। যথা- একজন কর্মীকে খাওয়ার জন্য বসার সময় স্বীয় অস্থিরতা ও পেরেশানির কথা লিখেছিলেন। এর জবাবে এই বাস্তবতার কথা-ই উল্লেখ করেছেন, যে বিষয়টি অন্য কারো বেলায় সঠিক না হলেও তাঁর বেলায় সম্পূর্ণ সঠিক।

'মুহতারাম! এই তাবলীগের কাজ বাস্তবে মানুষের জন্য খাদ্যস্বরূপ। আল্লাহ স্বীয় মেহেরবানীতে আপনাকে এই খাদ্য দ্বারা ভাগ্যবান করেছেন। এর সাময়িক ঘাটতি সাধারণ আবশ্যকীয় বিষয়। আপনি এ বিষয়ে পেরেশান হবেন না।'

অনেক সময় মনে হয়েছে, কোনো সুসংবাদ শুনে অথবা দাওয়াত দিলে উপকার হবে এমন কোনো লোকের সাথে দেখা হলে তিনি অসুস্থতার কথা ভুলে যেতেন। তাঁর মানসিক শক্তি এতো প্রবল ছিল যে, তা অসুস্থতাকে ছাড়িয়ে যেত।

## দুর্বলতা ও অসুস্থতা

জীবনের শেষ অসুস্থতার সময় এমন আনন্দ সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ১৯৪৪ সনে যখন লাখনৌতে জামাত যায়, তখন একদিন ফজরের নামাযের পর তিনি আমাকে বললেন, আমি চলে আসার পর তো কানপুরে কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। আমি বললাম, লাখনৌ থেকে একটি জামাত যাওয়ার পর আবার কাজ চালু হয়েছে। হাজী ওলী মুহাম্মদের দিকে ইশারা করে বললাম, ইনিও সেই জামাতে ছিলেন। মাওলানা মুসাফাহার জন্য হাত বাড়িয়ে তাঁর হাত মুঠো করে ধরলেন এবং বললেন, আমি অনেক খুশি হয়েছি। আমাকে আর বেশি খুশি করবেন না। কারণ তা বরদাশত করার ক্ষমতা এখন আমার নেই।

মাওলানার অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর চেষ্টায় জান্নাতের স্বাদ পাওয়া যেত। এই রাস্তায় গরম হাওয়া তার কাছে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ার চেয়েও অধিক আনন্দ দিত। একবার মে মাসের শেষ দিকে হযরত মাওলানা (রহ.), শায়খুল হাদীছ যাকারিয়া, মৌলবী ইকরামুল হাসান একটি গাড়িতে করে একস্থানে যাচ্ছিলেন। তখন গরম লু হাওয়ার তাপ অনুভূত হচ্ছিল। কেউ বলল, হাওয়া আসছে; গাড়ির জানালা বন্ধ করে দিন। শায়খুল হাদীছ (রহ.) বললেন, হাঁ; এখন গরম খুব বেশি। তখন মাওলানা ইলিয়াস বললেন, আল্লাহর রাস্তার গরম হাওয়া ভোর বেলার মৃদু বাতাস থেকেও বেশি আনন্দদায়ক।

## জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে গুরুত্ব

একবার দুই বন্ধু একসাথে রেলগাড়িতে সফর করছিল। নামাযের সময় হলে এক বন্ধু নামায পড়ল। কিন্তু অপর বন্ধু ভিড়ের কারণে সময়মতো নামায আদায় করতে পারেনি। মাওলানা ওই রেলগাড়িতে ছিলেন। তিনি তাদেরকে নামাযের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে এক বন্ধু বলল, আমি নামায পড়ে ফেলেছি আর আমার বন্ধু এখন পড়ছে। একথা শুনে মাওলানা অত্যন্ত আফসোস করলেন। তিনি বললেন, আমি এ কাজ শুরু করার পর (আনুমানিক ২০ বছর যাবত) রেলগাড়িতে কখনও নামায জামাত ছাড়া পড়িনি। এমনকি আল্লাহর ফযলে তারাবীহর নামাযও জামাতে পড়ার তাওফীক হয়েছে। যদিও কোনো সময় তারাবীহর নামায দু-রাকাত পড়ার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু কখনওই পুরো নামায ছুটে যায়নি।

## দু'আ করার সময় অবস্থা

মাওলানা দীর্ঘদিন পর্যন্ত অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে দু'আ করতেন। দু'আ করার সময় তাঁর আত্মবিস্মৃতির অবস্থা বিরাজ করত। আর বিস্ময়কর-বিস্ময়কর কথা তাঁর যবান থেকে উচ্চারিত হতো। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর বিশেষ করে মেওয়াতে সফরকালীন তাঁর দু'আ বেড়ে যেত। অনেক সময় এই দীর্ঘ দু'আ একটি আলোচনার বিষয়বস্তুর সমান হয়ে যেত।

তিনি আল্লাহর কাছে অন্তর খুলে দু'আ করতেন এবং চাওয়ার সময় নিজের পক্ষ থেকে কোনো কার্পণ্য করতেন না। তিনি আলোচনা করার সময় প্রায়ই একটি কথা বলতেন, যা এখনও আমার কানে বাজে। তা হলো, 'আল্লাহর কাছেই চাও'।

## চিন্তার বিষয়

আমার বন্ধুগণ!

এ ছিল আমাদের পূর্বসূরীদের যিন্দেগির নমুনা, যাঁরা ইল্‌ম ও আমলের আসমানে সূর্য হয়ে আলোকময় করেছিলেন এই পৃথিবীকে। আজ আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি সামান্য হলেও দৃষ্টি দেই। আমরা নিজেদেরকে তাদের রূহানি সন্তান বলে পরিচয় দেই। অথচ তাঁদের কার্যাবলির সাথে আমাদের কার্যাবলির কোনো মিল আছে কি? আমাদের আমল ও ইল্‌মের মাঝে অনেক পাথর্ক্য অনুভূত হয়।

বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ বিষয়েও আমাদের মাঝে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। সুন্নাতের অনুসরণ পুরোপুরি আমাদের মাঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্যস, কিছু

কাজ আমরা করি। একাকি থাকাবস্থায় আমাদের অবস্থা এক রকম হয় আর প্রকাশ্যে আমাদের অবস্থা অন্য রকম হয়।

অন্তরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে দুই চেহারা দেখা যায়। এর মধ্যে একটি চেহারা লোকদের দেখানোর জন্য। অপর চেহারা পরওয়ারদেগার আল্লাহ জানেন। কেউ জানে না, আমাদের এই দুরবস্থা কবে দূর হবে। আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের রঙে নিজেদের কবে রঙিন করব?

যদিও আজো সমাজে এমন কিছু আল্লাহওয়ালা বান্দা আছেন, যারা আল্লাহর যিকির, তাকওয়া ও পরহেযগারী দ্বারা স্বীয় যিন্দেগী আবাদ করছেন; কিন্তু সাধারণভাবে আমাদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকেই যাচ্ছে। নিজের বাহ্যিক আবরণকে নবীর সুন্নাত দ্বারা এবং ভিতরের অবস্থাকে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক দ্বারা সজ্জিত করে নেই। তাকওয়াকে নিজের প্রতীক বানিয়ে নেই। আল্লাহর সন্তুষ্টিকে স্বীয় যিন্দেগির উদ্দেশ্য বানাই।

এভাবে করার পর কোনো কাজে উদ্যোগ নিলে আল্লাহ তার মধ্যে বরকত ও সফলতা দান করবেন। দীনের বিজয়ের দ্বার খুলে দিবেন। আল্লাহ পুরো দুনিয়ায় এমন প্রভাব ও ভীতিকর পরিবেশ কায়েম করে দিবেন যে, কাফেররা স্ব-স্ব স্থানে বসে কাঁপতে থাকবে। আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের পূর্বসূরীদের আদর্শ অনুযায়ী চলার তাওফীক দান করুন। আখেরাতে তাঁদের সাথে থাকার জন্য কবুল করুন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[৭ম খণ্ড সমাপ্ত]

# খুতুবাতে যুলফিকার
## [অষ্টম খণ্ড]

# তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় করো

'মানুষের উচিত, তার সময়কে স্মরণ করা। কেউ তার সময় ভুলে গেলে আল্লাহ তা'আলা তাকে পরীক্ষায় ফেলে দিবেন। সব সময় মনে রাখা চাই, আমরা কখন কোথায় কী করছি? আমরা চিন্তা করি, যখন আমরা দুনিয়াতে আসি, তখন আমাদের মাল-সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান, ঘর-বাড়ি কোনো কিছু কি ছিল? কিছুই ছিল না। এসব পরে অর্জিত হয়েছে। এসব কিছু কে দিয়েছেন বলুন তো? আল্লাহ দিয়েছেন।'

# তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় করো

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

## শুকরিয়ার আলোচনা

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

'তোমরা আমাকে স্মরণ করো; আমি তোমাদের স্মরণ করব।'[১]

এই আয়াতের প্রথম অংশে যিকির সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশে শুকরিয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে। যিকির অংশে অনেক আলোচনা হয়; কিন্তু এখানে শুকরিয়া সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছে।

## বর্তমান যুগে বস্তুবাদী নেয়ামতের প্রাচুর্য

আল্লাহর যত নেয়ামত বর্তমানে আছে, এর আগে এতো ছিল না। বর্তমানকালে সাধারণ বান্দাও আগের যমানার বাদশাহদের চেয়েও উত্তম যিন্দেগি কাটায়। আগের যমানায় বাদশাহদের ঘরে চেরাগ জ্বলত, যেখানে বর্তমানে গরিব লোকের ঘরে বিদ্যুৎ জ্বলে। এরকম আলোকিত ব্যবস্থা আগের বাদশাহদের ভাগ্যেও জোটেনি। আগের বাদশাহদের খাদেমরা হাতপাখা দিয়ে বাতাস করত। বর্তমানে একজন গরীবের ঘরেও বিদ্যুৎ-এর পাখা ঘোরে। আজকাল সাধারণ মানুষও ঠাণ্ডা পানি পান করতে পারে, যা আগের বাদশাহদের ভাগ্যেও জোটেনি। আগের বাদশাহদের ভ্রমণের জন্য ঘোড়ার

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৫২

প্রয়োজন হতো এবং সফর করতে এক মাস সময় লেগে যেত। আপনি যদি ঘোড়ায় চড়ে পেশোয়ার থেকে করাচি সফর করেন, তাহলে এক মাস সময় লেগে যাবে। কিন্তু আজকে সাধারণ লোক রেলগাড়িতে করে করাচি গেলে সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাবে। আগের বাদশাহগণ শুধু মৌসুমি ফল খেতে পারতেন; অথচ আজকের একজন গরিব লোকও মৌসুমি-অমৌসুমি সব ধরনের ফল খেতে পারে। আগে শুধু এলাকার ফল এলাকার মানুষই খেতে পারত; অথচ আজকে অন্যান্য দেশের ফলও সহজে পাওয়া যায়। আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের দুর্বলতা দেখে এ সমস্ত নেয়ামত ব্যাপক করে দিয়েছেন।

## অকৃতজ্ঞতা বেড়ে গেছে

বর্তমানে যত নেয়ামত সহজে পাওয়া যায়, আগে এমন পাওয়া যেত না। কিন্তু তারপরও বর্তমানে আল্লাহ তা'আলার প্রতি নাশুকরি করা হয়। আগে এরকম ছিল না। সবার মুখ থেকে নাশুকরির কথা শোনা যায়। সবাই বলে কাজ-কর্ম ভালো যাচ্ছে না। ঘরে অনেক সমস্যা হচ্ছে। শরীর-স্বাস্থ্য খারাপ যাচ্ছে। হাজারে হয়তো একজন পাওয়া যেতে পারে, যাকে জিজ্ঞাসা করলে সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবে। এর কারণ কী? খানা-পিনার এতোই আয়োজন যে, বর্তমানে কোনো ফকিরও রুটি চায় না। বরং ধূমপান ও নেশা করার জন্য রুপি চায়।

## অধিক খেয়ে মৃত্যুবরণকারী

বর্তমানে সাধারণ ঘটনায় মৃত লোকদের তুলনায় অধিক খেয়ে মরার লোকের সংখ্যা বেশি। আপনারা বলুন, এই যে হৃদকম্প বন্ধ হয়ে যায়, তা না খাওয়ার কারণে বন্ধ হয়, নাকি চর্বি বেশি খাওয়ার কারণে বন্ধ হয়? ডায়াবেটিস বেশি খাওয়ার কারণে হয়, নাকি অভাবের কারণে? অবশ্যই অধিক খাওয়ার দ্বারা এসব অসুখ হচ্ছে। বর্তমানে অধিকাংশ লোক বেশি খাওয়ার কারণেই মারা যাচ্ছে। তারপরও আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে!

## আল্লাহ তা'আলার হুকুম

আতা ইবনে আবী রাবাহ (রহ.) বলেন, একবার আল্লাহ আমার অন্তরে একথা ঢেলে দিলেন যে, হে আতা! এই লোকদের বলে দিন, যদি তাদের রিযিক সামান্য একটুও কমে যায়, তাহলে তখনই তারা মাহফিলে বসেই আমার অভিযোগ শুরু করে দিবে। অথচ তারা স্বীয় আমলনামা গোনাহ দিয়ে

ভরে নিয়ে আসে। অথচ আমি ফেরেশতাদের মজলিসে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করি না।

## প্রথম বড় নেয়ামত

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.) বলেন, আমাদের প্রতি আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত হলো, তিনি আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছেন। তিনি চাইলে তো গাধাও বানাতে পারতেন। তখন অন্য কেউ আমাদের ওপর মাল বহন করত এবং ডান্ডা দ্বারা আঘাত করত। তিনি যদি আমাদের বানর বানাতেন, তাহলে কেউ আমাদের গলায় দড়ি লাগিয়ে নাচ দেখানোর আয়োজন করত আর আমরা নাচতাম। পরওয়ারদেগার কত বড় ইহসান করেছেন যে, তিনি আমাদের চাওয়া ব্যতীতই মানুষ বানিয়েছেন। কিন্তু এর জন্য যথাযথভাবে তাঁর শুকরিয়া আদায় করা হচ্ছে না।

## সুস্থ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ

আল্লাহ আমাদের আশরাফুল মাখলুকাত বানিয়ে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুন্দর ও সুস্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষ বানিয়েও যদি তিনি জ্ঞান-বুদ্ধি না দিতেন, তাহলে কী হতো? পাগল হতাম। চোখ না দিলে রাস্তায়-রাস্তায় হোঁচট খেয়ে ঘুরতাম। মা-বাবার চেহারা দেখা থেকে বঞ্চিত হতাম। যবান না দিলে মা,-বাবা, ভাই-বোনের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারতাম না। শ্রবণশক্তি না দিলে ইশারায় লোকদের কথা শোনা লাগত। হাত না দিলে আমরা কিভাবে কাজ করতাম? আল্লাহ এসব নেয়ামত আমাদেরকে চাওয়া ছাড়াই দান করেছেন। যদি কেউ আপনাকে দু-লক্ষ টাকা দিয়ে বলে, আপনার চোখ দুটি আমাকে দিয়ে দিন, তাহলে কে রাজি হবেন বলুন? কেউ এক লক্ষ টাকা দিয়ে বলল, আপনার যবানটা কেটে আমাকে দিন, তখন কে রাজি হবেন বলুন? এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে কত বড় নেয়ামত, যা বান্দা পয়সা দিয়েও কিনতে পারে না আর পয়সা দিয়ে কাউকে দিতেও চায় না।

## চিন্তা করে দেখুন

আমার বন্ধুগণ!

আল্লাহ যদি আমাদের বুদ্ধি না দিতেন, তাহলে আমরা পাগল হয়ে যেতাম, চোখ না দিলে অন্ধ হয়ে যেতাম, কান না দিলে বধির হয়ে যেতাম। সুস্থতা না দিলে রুগ্ন হয়ে যেতাম। ঘর না দিলে আশ্রয়হীন থাকতাম। সন্তান না দিলে নিঃসন্তান থাকতাম। মাল-সম্পদ না দিলে দরিদ্র থাকতাম। সম্মান

না দিলে লাঞ্ছিত হতাম। আমরা এখন যেভাবে সম্মানজনক জীবন অতিবাহিত করছি, তা একমাত্র এই মালিকের অনুগ্রহ।

## দ্বিতীয় বড় নেয়ামত

আল্লাহর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় বড় নেয়ামত হলো, তিনি আমাদের ঈমান দান করেছেন। আমাদেরকে মুসলমানের ঘরে সৃষ্টি করেছেন। জন্মের পর আমাদের ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত দেওয়া হয়েছে। এভাবে আমাদের কানে আল্লাহর নাম পৌঁছানো হয়েছে। মা আমাদের যখন সান্ত্বনা দেন, তখন حَسْبِيْ رَبِّيْ جَلَّ اللهُ مَا فِيْ قَلْبِيْ غَيْرُ اللهِ শোনাতেন, কালিমার যিকির শোনাতেন। যখন আমরা একটু বড় হলাম, তখন আমাদের পিতা জুমার দিন হাত ধরে মসজিদে নিয়ে যেতেন। এভাবেই তিনি আমাদেরকে আল্লাহর ঘরের রাস্তা দেখিয়েছেন। একটু চিন্তা করে দেখুন, কত ছোট বয়সে আল্লাহ আমাদের এই নেয়ামত দান করেছেন।

## তৃতীয় বড় নেয়ামত

তারপর তৃতীয় নেয়ামত হলো, আল্লাহ আমাদের শেষ নবীর উম্মত বানিয়েছেন। এটি এমন একটি ফযিলত, আগের নবীরা যা কামনা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা ঈসা আলাইহিস সালামের দু'আ কবুল করেছেন। তিনি কেয়ামতের আগে আবার দুনিয়াতে আসবেন এবং শেষ নবীর উম্মত হয়ে থাকবেন। শেষ নবীর উম্মত হওয়ার কারণে কেয়ামতের দিন আমরা শেষ নবীর সুপারিশ পাব। নবীজি ইরশাদ করেছেন, জান্নাতীদের তিনটি স্তর হবে। এর মধ্যে শুধু দুই অংশ আমার উম্মত হবে আর বাকি এক অংশ সমস্ত নবীর উম্মত হবে।

নবীজি আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নবীকে যেকোনো একটি দু'আ করার অধিকার দিয়েছেন, যে দু'আ আল্লাহ অবশ্যই কবুল করবেন। যথারীতি সমস্ত নবী আল্লাহর কাছে যে দু'আ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেছেন। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি কোনো দু'আ করেছেন? তিনি বললেন, আমি এটি আখেরাতের জন্য রেখে দিয়েছি। আমি কেয়ামতের দিন ওই দু'আ করব এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমার শেষ উম্মতটি জান্নাতে প্রবেশ না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি জান্নাতে প্রবেশ করব না। এটি আল্লাহ তা'আলার কত বড় দয়া যে, তিনি আমাদের শেষ নবীর উম্মত বানিয়েছেন।

আপনারাই বলুন, বৃষ্টির পানির ফোঁটা কি কেউ গণনা করতে পারে? সারা দুনিয়ার গাছের পাতা কি কেউ গণনা করতে পারে? না, কেউ গণনা করতে পারে না। কিন্তু তারপরও অধম বলছে, আসমানের তারকা গণনা করা সম্ভব, গাছের পাতা গণনা করা সম্ভব; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার যে নেয়ামতের বারিধারা আমাদের উপর বর্ষিত হয়েছে, এগুলো গণনা করা আমাদের জন্য অসম্ভব। কেননা, কুরআন শরীফে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا

'তোমরা আল্লাহর নেয়ামত গণনা করে শেষ করতে পারবে না।'[১]

## শরীরের উত্তম ব্যবস্থাপনা

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বলেছেন, মানুষের ব্রেনে পুরো শরীর থেকে প্রতি সেকেন্ডে ১ লক্ষ্য তথ্য মিলে। ব্রেন সেগুলোকে কন্ট্রোল করে। এখন চিন্তা করে দেখুন, ব্রেন সুস্থ থাকা আল্লাহ তা'আলার কত বড় নেয়ামত! আল্লাহ তা'আলা যে ব্রেনের মাধ্যমে শরীর থেকে অঙ্গ-প্রতঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তার জন্য ওয়ারিং করে দিয়েছেন, যাকে নার্ভস্ সিস্টেম বলে। এই ওয়ারিং-এর মাধ্যমে মস্তিষ্ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সিগন্যাল পাঠায়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এই সিগন্যাল অনুযায়ী কাজ করে। এই সব সিগন্যাল প্রথমে মস্তিষ্ক থেকে মেরুদণ্ডের হাড়ের মধ্যে যায়। একে স্পাইন্যাল কার্ড বলে। তারপর সেখান থেকে পুরো শরীরে সিগন্যাল যায়। আমি কোনো মন গড়া কথা বলছি না। বরং দায়িত্বের সাথে বাস্তব কথা বলছি। মানুষের শরীরে অনেকগুলো নার্ভ আছে। বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলোতে ডাক্তারগণ লিখেছেন, প্রতিজন মানুষের মধ্যে এত পরিমাণ ওয়ারিং ব্যবহার করা হয়েছে যে, যদি এক নার্ভকে অপর নার্ভ থেকে আলাদা করে একটাকে আরেকটার সঙ্গে জোড়া দেওয়া হয়, তাহলে এত লম্বা হবে যে, গোটা জগতকে দুবার বেষ্টনি দেওয়া সম্ভব হবে।

এতগুলো ওয়ারিং একজন বান্দার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এই সবগুলো ওয়ারিং যদি ঠিকঠাকমতো কাজ করে, তাহলে আমাদের শরীর সুস্থ থাকে। পক্ষান্তরে যদি কোথাও সার্কিট শর্ট হয়ে যায়, তাহলে বান্দা অসুস্থ হয়ে যায়। তখন মানুষ বলে, অমুকের এই রোগ হয়েছে, অমুকের এই রোগ হয়েছে ইত্যাদি। তারপর বান্দার জীবন শেষ হয়ে যায়। যেভাবে আমাদের ঘরে বিদ্যুতের তারের উপর পিভিসি ইনসুলেশন লাগানো থাকে, তেমনি

---

১. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৩৪

আমাদের শরীরেও আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি নার্ভকে আরেক নার্ভের সঙ্গে ইনসুলেট করে দিয়েছেন। এক শিরার সাথে আরেক শিরার কখনই শর্ট সার্কিট হয় না।

এখন আপনি চিন্তা করুন, এটা কেমন পদ্ধতি, যার কারণে আমাদের শরীর ঠিকমতো কাজ করছে। কখনও কি আমরা আল্লাহ তা'আলার এ শুকরিয়া আদায় করেছি। স্মরণ রাখা উচিত, কিছু-কিছু বিষয় ঠিকমতো হওয়া মানুষের জন্য নেয়ামত। উপমাস্বরূপ আমরা কিছু খেলে তা সহজে পেটের মধ্যে চলে যায়। এটি আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত।

আবার এমন কিছু লোক আছে, যারা সব কিছু খেতে পারে না। এক মহিলা লাহোর থেকে ফোনে দু'আ চেয়েছে। সে বলল, সাত বছর হতে চলেছে। আমি সেভেন আপ অথবা অন্য কোনো পানীয় প্রাণ করা ছাড়া রুটি বা অন্য কিছু খেতে পারি না। খাওয়ার চেষ্টা করলে বমি আসে। আমি সাত বছর যাবত আমার পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য খাবার রান্না করি; কিন্তু আমি নিজে এগুলো খেতে পারি না। এখন বলুন, ওই মহিলা তো সাত বছর যাবত খেতে পারছে না। যদি আমরা সকাল, দুপুর ও রাত্রে খাই, তাহলে কখনও কি একথা চিন্তা করেছি যে, এটা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত। খাওয়ার সাথে-সাথে সহজে পেটে চলে যায়।

## খাদ্যনালীর ভাল্‌ভ

খাদ্যনালীতে একটি ভাল্‌ভ আছে, যা মানুষকে খাওয়ার সময় খাদ্যকে খাদ্যনালীতে ঢুকিয়ে দেয়। বাইরে আসতে দেয় না। একে non-return volve বলে। অর্থাৎ খাদ্যনালীতে ঢোকার পর তা প্রশস্ত হয়ে যায় আর বাইরে চলে যেতে চাইলে তা বন্ধ হয়ে যায়। তখন উক্ত ভাল্‌ভ খাদ্যকে ফিরে আসতে দেয় না। এজন্য আপনি রুটি খেয়ে সাথে-সাথে মাথাটা নিচের দিকে দিয়ে উল্টো হয়ে দাঁড়িয়ে যান; দেখবেন, খাদ্য আর বের হচ্ছে না।

## শয়নবঞ্চিত এক ডাক্তার

আমেরিকায় আমাদের এক ডাক্তার বন্ধু আছেন। তার শরীর এই ভাল্‌ভ নষ্ট হয়ে গেছে। ফলে তিনি কিছু খেলে একটু কাত হলে সব কিছু মুখ থেকে বের হয়ে যায়। এ নিয়ে তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। ডাক্তার বলেছেন, এর কোনো চিকিৎসা নেই। ওই ডাক্তার বেচারা দেওয়ালে টেক লাগিয়ে পা লম্বা করে বসে-বসে ঘুমায়। তিনি বলেন, আল্লাহ আমার কাছ থেকে শুয়ে ঘুমানোর নেয়ামত নিয়ে গেছেন। তাকে দেখে আমাদের একথা মনে হয়েছে যে, হে মালিক! শুয়ে-শুয়ে আরাম করে ঘুমানো আপনার কত বড় নেয়ামত!

## চোখের পাতা

একলোক এক্সিডেন্ট করার ফলে তার চোখের পাতা কেটে যায়। তার এক চোখ ঢাকা ছিল এবং অপর চোখ খোলা ছিল যেমন মাছের চোখ হয়ে থাকে। কিছুদিন পর তার চোখের জখম তো ঠিক হয়ে যায়; কিন্তু তার পেরেশানি ছিল এ কারণে যে, দু-তিন ঘন্টা পরপর তার দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যায়। ডাক্তার বলল, বাতাসে ধুলা ওড়ার সময় মাটির ছোট-ছোট কণা চোখের ভিতর জমে। এজন্য আপনার চোখ বারবার ধুতে হবে। এ কারণে তার দু-তিন ঘন্টা পরপর চোখ ধুতে হয়। আপনারা জানেন, যখন মানুষ দীর্ঘ সময় পানির মধ্যে গোসল করে অথবা কাপড়-চোপড় ধৌত করে, তখন হাত কেমন আকার ধারণ করে। এমনিভাবে ওই ডাক্তারের বারবার চোখ ধোওয়ার কারণে চোখের কুঠুরিতে জখমের মতো হয়ে গেছে। ফলে পানি লাগলে তা জ্বলে।

ডাক্তারগণ বলে দিলেন, আমরা কিছু করতে পারব না। একদিন ওই ডাক্তার অনেকক্ষণ কেঁদে ডাক্তারদের বললেন, আপনারা একটা কিছু করুন। ডাক্তারগণ বললেন, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলা মানুষের চোখের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য এই পর্দা বানিয়েছেন, যা এই মুহূর্তে মানুষের চোখের ভিতরকে বাইরের ময়লা থেকে পরিষ্কার রাখে। আমরা খানা-পিনা করি, কথাবার্তা, চলাফেরা সবকিছুই করি; কিন্তু আমাদের অজান্তেই আমরা অসংখ্যবার চোখের পলক ফেলি। আর ওই লোকের চোখের পলক নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বারবার তার চোখ ধুতে হচ্ছে। ডাক্তারের কথা শুনে লোকটি বলতে লাগল, হে আল্লাহ! চোখের পলক তোমার কত বড় নেয়ামত!

## হাঁপানী রোগীর অস্থিরতা

আপনি অ্যাজমায় আক্রান্ত কোনো রোগীকে দেখুন। আমি দেখেছি। এমন রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে থাকে। তাদের অবস্থা জবাইকরা মুরগির মতো হয়ে থাকে। ঠিকমতো শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া এবং আবার তা ভিতর থেকে ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নেয়ামত। এমন রোগী নিজের কাছে পাম্প রাখে। সামান্য ধুলাবালি এলে-পাম্প ব্যবহার করে আর বলে, কী করব; শ্বাস তো আটকে যাচ্ছে!

## এক পেয়ালা পানির মূল্য

একবার বাদশাহ হারুনুর রশীদ সুলাইমান ইবনে হার্‌ব (রহ.)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহর পানির পিপাসা লাগলে খাদেমকে পানি

আনার হুকুম দিলেন। খাদেম এক পেয়ালা ঠাণ্ডা পানি আনল। বাদশাহ পেয়ালাটা মুখে দিতে যাবেন, ঠিক তখন সুলাইমান ইবনে হার্‌ব বললেন, বাদশাহ নামদার! একটু থামুন। বাদশাহ পেয়ালাটা মুখ থেকে নামিয়ে থেমে গেলেন। সুলাইমান ইবনে হার্‌ব বললেন, বাদশাহ! মনে করুন, আপনার প্রচণ্ড পিপাসা লেগেছে আর এ মুহূর্তে এই পেয়ালা পানি ছাড়া পৃথিবীতে কোথাও এক ফোঁটা পানি নেই। ওই মুহূর্তে আপনি এই এক পেয়ালা পানি কত বিনিময় দিয়ে কিনে নিতে প্রস্তুত হবেন? হারুনুর রশীদ বললেন, আমি আমার অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দেব। তারপর সুলাইমান জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, পানি পান করার পর যদি পেশাব বন্ধ হয়ে যায় এবং পুরো পৃথিবী মাত্র একজন ডাক্তার বা হাকীম থাকে, যে আপনার পেশাব বের করার জন্য চিকিৎসা করতে পারে, তাহলে আপনি তার বিনিময় কত দিবেন? বাদশাহ হারুনুর রশীদ বললেন, বাকি অর্ধেক দিয়ে দেব। তখনই সুলাইমান বললেন, বাদশাহ! একটু চিন্তা করে দেখুন, আপনার পুরো রাজত্ব এক পেয়ালা পানি এবং তা পেশাব হয়ে বের হওয়ার সমতুল্য! আল্লাহু আকবার কাবীরা!

আমরা যদি আল্লাহ তা'আলার এই সমস্ত নেয়ামত নিয়ে একটু চিন্তা করি, তাহলে অন্তর একথা-ই বলবে যে, আমাদের অনেক শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

## সন্তান কত বড় নেয়ামত!

যাকে আল্লাহ তা'আলা সন্তান দিয়েছেন, সে এমন কারো সাথে কথা বলে দেখুক, যার সন্তান নেই। আমি মানুষকে সন্তান পাওয়ার জন্য কাঁদতে দেখেছি। নারীরা কেঁদে-কেঁদে আল্লাহ তা'আলার কাছে সন্তান কামনা করে, কিন্তু সন্তান পায় না। ডাক্তারকে ফি দেয়, চেকআপ করায়, আরো কত কিছু করে। তারপর আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করে। আমরা যারা সন্তান লাভ করেছি, তারা চিন্তা করে দেখি, এটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কত বড় নেয়ামত!

## ভিক্ষুক নারীর মূল্য

আপনি বড়-বড় শহরে দেখবেন, সেখানে রাস্তা-ঘাটে, ফুটপাতে মেয়েরা ভিক্ষা করে। আপনি দাঁড়িয়ে রইছেন, হঠাৎ আপনার কাছে হাত পাতছে, কিছু চাইছে। আমি এরকম কোনো নারীকে রাস্তায় হাত পাততে দেখলে আমার শরীরে কাঁপুনি ধরে যায়। মনে হয়, হায় আল্লাহ! এই নারী তো কারো বোন হবে, কারো মা হবে আর কারো স্ত্রী হবে। আপনি তাকে কোন অবস্থায়

রেখেছেন যে, বেগানা পুরুষের সামনে হাত পাতছে! কেউ তাকে কিছু দিচ্ছে। কেউ তাড়িয়ে দিচ্ছে। তার কত কথা শুনতে হচ্ছে। কত দৃষ্টি তার উপর পড়ছে। সে এভাবে চেয়ে-চেয়ে একটু রুটির ব্যবস্থা করছে আর তা খেয়ে দিন পার করছে।

অপরদিকে আমাদের মেয়েরা কত আরামে ঘরের ভিতর পর্দার আড়ালে দিন কাটায়। মনমতো খাবার প্রস্তুত করে খেতে পারছে। হে আল্লাহ! এর শুকরিয়া কি কখনও আমরা আদায় করতে পারব! যদি আল্লাহ তা'আলা না করুন, আমাদের মেয়েরা এ অবস্থায় থাকত, তাহলে এই আত্মমর্যাদাবোধ কোথায় থাকত! আমাদের ইজ্জত কত সংরক্ষিত যে, ঘরে বসেই তাদের রিযিকের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমরা আমাদের মনমতো খাবার খাই। সকালে উঠে স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে, আজ কী রান্না করব? তারপর মনমতো খাবার প্রস্তুত করে খায়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের কত বড় নেয়ামত দিয়েছেন!

## নিজের সময়কে ভুলো না

মানুষের উচিত, নিজের সময়কে স্মরণ করা। কেউ তার সময় ভুলে গেলে আল্লাহ তা'আলা তাকে পরীক্ষায় ফেলে দিবেন। সব সময় মনে রাখা চাই, আমরা কখন কোথায় কী করছি? আমরা চিন্তা করি, যখন আমরা দুনিয়াতে আসি তখন আমাদের মাল-সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান, ঘর বাড়ি কোনো কিছু কি ছিল? কিছুই ছিল না। এসব কিছু পরে অর্জিত হয়েছে। এসব কে দিয়েছে বলুন? আল্লাহ তা'আলা-ই দিয়েছেন।

## এক বেয়াদবের ধৃষ্টতা

এক বেয়াদব আমাকে বলল, এসব কিছু আমরা নিজস্ব বুদ্ধি দ্বারা অর্জন করেছি। আমি বললাম, আচ্ছা উত্তর দাও, তোমার এই বুদ্ধি কে দিয়েছেন? সে বলল, আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন। আমি বললাম, তোমাকে মেহনত করার তাওফীক কে দিয়েছেন? সে বলল, আল্লাহ তা'আলা। আমি বললাম, সব রিযিক তো আল্লাহ তা'আলাই দিয়েছেন।

## একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

মাওলানা বদরে আলম 'তরজমানুস সুন্নাহ'য় একটা হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন, বনী ইসরাঈলে তিন লোক ছিল। তাদের একজন কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত ছিল। তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, তোমার কোনো দুঃখ আছে কি?

সে বলল, কোন দুঃখের কথা তোমাকে বলব? এক তো হলো আমি কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত, যার ফলে মানুষ আমার চেহারা দেখতে পছন্দ করে না। এছাড়া আমি খুব অভাবে আছি। তখন প্রশ্নকারী লোকটি তার জন্য দু'আ করে দিল। ফলে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল এবং একটা উটনীর মালিক হলো, যে উটনীর গর্ভ থেকে এতো উট ও উটনীর জন্ম হলো যে, সে একটা উটের খামারের মালিক হয়ে গেল। তারপর প্রশ্নকারী লোকটি দ্বিতীয়জনের কাছে এল, যার মাথায় টাক ছিল। প্রশ্নকারী লোকটি তাকে আগের লোকের মতো প্রশ্ন করল। টাকমাথা লোকটি বলল, আমি দুঃখের কথা কী বলব? আমার মাথায় চুল নেই। কারবারও ভালো যাচ্ছে না। প্রশ্নকারী লোকটি তার জন্যও দু'আ করে দিল। ফলে তার অবস্থারও পরিবর্তন হলো। তার মাথায় সুন্দর চুল গজালো এবং একটি গাভীর মালিক হলো। সেই গাভী থেকে আরো অনেক গরু-গাভীর জন্ম হলো। সে অনেক ধন-সম্পদ ও বাড়ির মালিক হয়ে গেল। তৃতীয় লোক অন্ধ ছিল। প্রশ্নকারী লোকটি তাকেও অনুরূপ প্রশ্ন করলে লোকটি বলল, আমার দৃষ্টিশক্তি নেই। কিছু করতে পারি না। মানুষের কাছে চেয়ে-চেয়ে খাই। কোনোভাবে জীবন চলে যায়। না পেরেছি মাকে দেখতে, না পেরেছি বাবাকে দেখতে। এছাড়া আমার খুব অভাব। প্রশ্নকারী লোকটি তার জন্যও দু'আ করে দিল। ফলে তার অবস্থারও পরিবর্তন হলো। দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল এবং সে একটি বকরির মালিক হলো। ওই বকরি থেকে সে অনেক বকরির মালিক হলো।

এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর ওই প্রশ্নকারী লোকটি আবার প্রথম ব্যক্তির কাছে এসে আল্লাহ তা'আলার নামে কিছু চাইল আর বলল, এক সময় আপনার কিছুই ছিল না। এখন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে সব দিয়েছেন। অনেক বড় ধনী বানিয়েছেন। সেখান থেকে আল্লাহর নামে আমাকে কিছু দান করুন। একথা শুনে ধনী হওয়া প্রথম ব্যক্তির মাথায় রক্ত চড়ে গেল। সে প্রশ্নকারীকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিল এবং বলল, আমি ও আমার বাপ-দাদা সবাই আমীর ছিল। আমরা আমীর বংশের লোক। কে বলেছে, আগে আমার কিছুই ছিল না? আমার তো সবই ছিল। তোমাকে একথা বলার সাহস কে দিয়েছে? তখন প্রশ্নকারী লোকটি তাকে বলল, ঠিক আছে; আমি যাচ্ছি। তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আগের অবস্থা করে দিন। একথা বলে প্রশ্নকারী লোকটি চলে যাওয়ার পর ওই লোকের উটের পালে একটা রোগ ছড়িয়ে পড়ল। ফলে তার সব উট মরে গেল এবং কুষ্ঠ রোগ পুনরায় তার শরীরে দেখা দিল। সে পুনরায় আগের দুরবস্থার শিকার হয়ে গেল।

তারপর প্রশ্নকারী লোকটি দ্বিতীয় লোকের কাছে গিয়ে আগের মতো আল্লাহ তা'আলার নামে কিছু চাইল এবং তাকে আগের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। একথা শুনে দ্বিতীয় লোকটিও রেগে গেল। বলতে লাগল, তুমি এসব কী বলছ? আমি এগুলো সব নিজে কামাই করেছি। লোকেরা আমাকে বড় ব্যবসায়ী বলে ডাকে। এগুলো আমার কষ্টের কামাই। এমনিতেই এগুলো হয়নি। একথা বলে সে প্রশ্নকারী লোকটিকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিল। ফলে প্রশ্নকারী লোকটি তাকেও বদদু'আ দিয়ে চলে গেল আর বলল, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তোমার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিন। তারপর এই দ্বিতীয় লোকটির অবস্থা আগের মতো হয়ে গেল। তার সব গাভী ও গরু অজানা রোগে আক্রান্ত হয়ে মরে গেল।

তারপর প্রশ্নকারী লোকটি তৃতীয়জনের কাছে এল। তার কাছেও অনুরূপ কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহ তা'আলার নামে কিছু চাইল। তাকেও আগের অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এর উত্তরে এই তৃতীয় লোকটি বলল, হাঁ, ভাই! তুমি সত্যই বলছ। আমি তো আগে অন্ধ ছিলাম। অভাবী ছিলাম। মানুষের কাছে হাত পেতে খেতাম। একদিন আল্লাহ তা'আলার এক বান্দা এসে আমার জন্য দু'আ করল। ফলে আল্লাহ তা'আলা আমার অবস্থার আমূল পরিবর্তন করে দিলেন। আমাকে অনেক কিছু দান করলেন। আর আজ আপনি আল্লাহ তা'আলার নামে আমার কাছে চেয়েছেন। তো ভাই! শোনো, ওই দুই পাহাড়ের মাঝখানে আমার অনেক বকরি চড়ে বেড়াচ্ছে। সেখান থেকে তোমার যত প্রয়োজন হয় নিয়ে যাও। একথা শুনে প্রশ্নকারী লোকটি বলল, তোমার বরকত হোক। আমি ফেরেশতা। মানুষ নই। আল্লাহ তা'আলা আমাকে তিন বান্দার কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাদের মধ্য তো দুজন আগের কথা ভুলে গেছে। কিন্তু তুমি ভোলনি। আল্লাহ তা'আলা তোমার মাল-সম্পদে আরো বরকত দান করুন।

ওই লোক বনী ইসরাঈলের একজন নেতৃতাবস্থানীয় লোক ছিলেন। মোটকথা, মানুষ তার আগের অবস্থার কথা স্মরণ করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরো বরকত দান করেন।

## অহংকারের কথা

আপনারা দেখবেন, কিছু লোকের কাজ প্রথম দিকে অনেক ভালো হয়, পরে তাদের অবস্থার অবনতির দিকে যায়। তখন তারা এসে বলে, আগে আমরা মাটিতে হাত লাগালে স্বর্ণ মাটি হয়ে যেত আর এখন স্বর্ণে হাত লাগালে তা মাটি হয়ে যায়। এর কারণ কী জানি না। প্রকৃতপক্ষে এর কারণ

দুটি। প্রথমত তারা আগের কথা ভুলে গিয়ে নাশুকরি করে। তারা তখন অহংকারী হয়ে যায়, যার ফলে তারা নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

স্মরণ রাখা চাই, আল্লাহ তা'আলা যা দিতে চান, তা আবার নিয়ে যেতেও পারেন। বান্দার জন্য বন্দেগী ও অক্ষমতা-ই মানানসই। কিন্তু যে বান্দা বড়ত্ব দেখায়, আল্লাহ তার অবস্থা পরিবর্তন করে দেন। তিনি আজ চাইলে আমাদের দিতে পারেন আবার আগামীকাল চাইলে নিয়েও যেতে পারেন।

## একটি সোনালি মূলনীতি

আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য নেয়ামত চলে যাওয়ার অপেক্ষা না করা চাই। বরং নেয়ামত থাকতেই তার কদর করা চাই। কেননা, নেয়ামত চলে যাওয়ার পর তো আপনি উপমার মতো হয়ে যাবেন। আজ আমি যা বলেছি, তার খোলাসা হলো, নেয়ামত থাকতেই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা চাই। তাহলে আল্লাহ তা'আলা নেয়ামত বৃদ্ধি করে দিবেন। আর অহংকার আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না।

## অহংকারের শাস্তি

আমাদের শহরে এক জমিদার ছিল। ইংরেজ সরকার তাকে এতো জমি দিয়েছিল যে, উক্ত যমিনে একটা রেল স্টেশন নির্মাণ করা যায়। এমনকি পরপর তিনটি রেল স্টেশন যে পরিমাণ দূরত্বে হয়, এই পরিমাণ জমি তার ছিল। তার বিলাসবহুল বাড়ি ছিল। তার স্ত্রী-সন্তান, ধন-সম্পদের কোনো কমতি ছিল না। তার এক বন্ধু তাকে বলল, আমার কারবার ভালো যাচ্ছে না। আমি বিপদে পড়েছি। একথা শুনে সে অহংকার করে বলতে লাগল, তোমাদের দিয়ে কী হবে? তোমরা শুধু পেরেশানি নিয়ে ঘুরে বেড়াও। আর আমার তো অবস্থা এমন যে, আমার বংশধরের পরপর ২১ পর্যন্ত কারো কামাই করে খাওয়ার চিন্তা করতে হবে না।

তার এ অহংকার আল্লাহ তা'আলার পছন্দ হলো না। ছয় মাসের মধ্যে তার মৃত্যু হলো। তার ১৮ বছর বয়সের এক যুবক সন্তান ছিল। সে তার সমস্ত সম্পদের মালিক হয়ে গেল। তার কিছু বন্ধু-বান্ধব তাকে ভুল পথে নিয়ে গেল। সে শরাব পানে অভ্যস্ত হয়ে গেল। প্রতিদিন তার ঘরে নতুন মেহমান আসত। প্রতিদিন সে পানির মতো টাকা খরচ করতে লাগল। একদিন তার এক বন্ধু তাকে বলল, চলো বাইরে আমরা কোথাও ভ্রমণ করি। একথা বলে তাকে থাইল্যান্ড নিয়ে গেল। সেখানে ক্লাবে গিয়ে সেখানকার মেয়েদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। সেখানে বসে পানির মতো পয়সা খরচ

করতে লাগল। সারা রাত সে ক্লাবে ভোগ-বিলাসে মগ্ন থাকত। একপর্যায়ে তার টাকা শেষ হয়ে গেল। সে ফকির হয়ে গেল। অবশেষে সে তার ঘর বিক্রি করতে বাধ্য হলো। তারপর রাস্তার পাশে ঘুমাতে লাগল এবং যেখানে দাঁড়িয়ে তার পিতা অহংকার করেছিল, সেখানে সে ভিক্ষা করতে লাগল।

আল্লাহ তা'আলা দেখিয়ে দিলেন, আমি তোমাদের যা দেই, তোমরা এর উপর অহংকার করো। যেখানে দাঁড়িয়ে তোমরা অহংকার করেছ, সেখানেই তোমাদের পরবর্তীরা দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করবে। বন্ধুগণ! অন্য গুনাহের শাস্তি আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে দিবেন। কিন্তু অহংকারের সাজা অনেক সময় দুনিয়াতেই দিয়ে দেন।

## শোকরের অর্থ

শুকরিয়া শব্দের অর্থ হলো নিজের অনুগ্রহকারীকে স্মরণ করে তার প্রশংসা করা, তার কথাকে মেনে নেওয়া, তার নাফরমানি করতে লজ্জা করা। আজকাল কেউ সেভেন আপ পান করালে তাকে ধন্যবাদ দেয়। অথচ যে সত্তা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত খাওয়াচ্ছেন, তাঁকে স্মরণ করার কথা মনে থাকে না। মানুষ তার নিজের ছেলেকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিলে তার প্রশংসা করে বেড়ায়। অনুগ্রহকারী ব্যক্তি আমাকে অনুগ্রহ করেছিল। সে একটা কাজের কথা বলেছিল। এখন তার কাছে না গেলে কেমন দেখা যায়? অথচ যে সত্তা ঘরের সবাইকে রিযিক দান করছেন, তাঁর প্রশংসা যবান থেকে বেরই হয় না।

## শুকরিয়ার অনুভূতি পয়দা করা

আমাদের উচিত, তিনভাবে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করা। প্রথমত যবান দ্বারা। আজকাল এমন অবস্থা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো-কোনো বান্দাকে এ পরিমাণ সম্পদ দিয়েছেন যে, সে এক থেকে দশ ঘরের পরিবারের লোকদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করতে পারে। অথচ তাকে জিজ্ঞাসা করলে বলে, আমার অবস্থা ভালো নয়। বলুন, এর থেকে বড় নাশুকরি আর কী হতে পারে। জবানটা কেন এত ছোট হয়ে গেল। একথা কি বলা যায় না যে, আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, আমি তার উপযুক্ত ছিলাম না? সারা জীবন সিজদায় পড়ে থাকলেও আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা চিন্তা করলে দেখতে পাব, আমরা আসলেই অনেক বড় অকৃতজ্ঞ। আমাদের রব আল্লাহ কত বড় মহান স্বত্তা যে, অকৃতজ্ঞদেরও দান করেন। এভাবেই শুকরিয়ার অনুভূতি আনা দরকার।

## যবানী শুকরিয়া

আমাদের উচিত, সর্বদা আমরা যবান দ্বারা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করি। ঠাণ্ডা পানি পান করলে এমনকি গরম রুটি খেয়েও আলহামদু লিল্লাহ বলা উচিত। হাদীছে আছে, বান্দা কোনো নেয়ামত পেয়ে যখন আলহামদু লিল্লাহ বলে, সে যেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল। সন্তান-সন্ততি, ঘর-বাড়ি, দোকান, সবকিছুর ব্যাপারে আলহামদু লিল্লাহ বলা উচিত।

আমার বন্ধুগণ! আমাদের ঘর-বাড়ি থাকাবস্থায় আলহামদু লিল্লাহ বলার অভ্যাস করা চাই। আমাদের আশেপাশে, আলহামদু লিল্লাহ বলার মতো লোকের সংখ্যা অনেক কম। মহিলাদের একথা শেখাতে হবে, যেন তারা এ বিষয়ে বাচ্চাদের শেখায়। আমরা প্রতিনিয়ত বলব, আলহামদু লিল্লাহ; আল্লাহ তা'আলা আমাকে সফলতার মধ্যে রেখেছেন। আলহামদু লিল্লাহ বেশি করে বলব। দ্বিতীয়ত সুবহানাল্লাহ বারবার বলব। তৃতীয় শব্দ আল্লাহু আকবার। আরো একটি শব্দ হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যদি এই শব্দসমূহ বেশি-বেশি মুখে উচ্চারণ করি, তাহলে এর দ্বারা মুখের শোকর আদায় হবে।

## শারীরিক শুকরিয়া

আমাদের চেষ্টা করা উচিত, বেশি-বেশি আল্লাহ তা'আলার হুকুম মানব। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ

'হে ঈমানদাররা! তোমরা উত্তম বস্তু খাও এবং নেক কাজ করো।'[১]

যেহেতু আমরা আল্লাহ তা'আলার দেওয়া রিযিক থেকে খাই, এজন্য আমাদের অধিক পরিমাণে তাঁর ইবাদাত করা উচিত। এর দ্বারা শারীরিক শুকরিয়া আদায় হবে।

## নেয়ামতসমূহ চলমান রাখার জন্য সহজ ব্যবস্থা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

'যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় কর, তাহলে আমি নেয়ামতসমূহ বৃদ্ধি করে দেব।'[২]

---

১. সূরা মুমিনুন : আয়াত ৫১

২. সূরা ইবরাহীম : আয়াত ৭

শুকরিয়া এমন একটি আমল, যার কারণে নেয়ামতসমূহ বাকি থাকে এবং বৃদ্ধিও হতে থাকে। নেয়ামতসমূহ চলমান রাখার জন্য সহজ ব্যবস্থা হলো, কবি বলেন,

ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے

بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے

'ভাঙ্গা সম্পর্ক তিনিই গড়ে দেন,

যে আল্লাহর হাতে সব ছেড়ে দেয়।'

اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا

لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے

'তাঁর দান ও করুণার গল্প অনেক,

লক্ষ লক্ষ চাও, কোটি-কোটি দিবেন।'

এ কারণে যে চায়, সে সব সময় কম হওয়ার অভিযোগ করে থাকে। অথচ দাতার খাযানা অনেক পরিমাণে ভরপুর থাকে। আর যে চায়, তার জামার আঁচল ছোট হওয়ার কারণে তা অতি তাড়াতাড়ি ভরে যায়।

## কওমে সাবার দৃষ্টান্তমূলক পরিণাম

আমার বন্ধুগণ!

যদি আমরা নাশুকরি করি। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা না করি, তাঁর হুকুমসমূহ পালন না করি এবং গুনাহসমূহ থেকে বিরত না থাকি, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেয়ামতসমূহ ছিনিয়ে নিবেন। এজন্য নেয়ামত অস্বীকার করা থেকে বাঁচা প্রয়োজন। কুরআন শরীফে এক সম্প্রদায়ের ঘটনা উল্লেখ আছে, যাকে সাবা সম্প্রদায় বলে। মুফাসসিরগণ লিখেছেন, সে সময় তাদের রাস্তার উভয় পাশে বাগান হয়েছিল। ফল এতো বেশি হতো যে, কোনো ব্যক্তি খালি টুকরি নিয়ে বাগান দিয়ে যাতায়াত করলে পড়ে থাকা ফল দিয়ে তার টুকরি পূর্ণ হয়ে যেত। ফল ছেঁড়ার প্রয়োজন হতো না। তাদের সেখানে প্রথা ছিল, সেখান থেকে কোনো ফল নেওয়ার ইচ্ছা করলে পেড়ে নেওয়া হতো। কোনো বাধা-নিষেধ ছিল না। এভাবে তারা সর্বদা ফল খেত। আল্লাহ তা'আলা সেই জাতিকে বললেন,

كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ

'আমার বান্দারা! আমার দেওয়া নেয়ামতসমূহ খাও এবং আমার শুকরিয়া আদায় করো।'[১]

কিন্তু তারা নাশুকরি করল এবং বলতে লাগল, হে আল্লাহ! সবদিকে সবুজ-শ্যামল বাগান এবং ফল আছে। এগুলো দেখে-দেখে তো আমাদের অলসতা এসে গেছে। আমরা এক শহর থেকে অন্য শহরে সফর করি। কোনো অনুভব হচ্ছে না। কেননা, রাস্তার উভয় পাশে গাছে পরিপূর্ণ। মাঝখানে কোনো বিরান ভূমি দেখা গেলে অনুভব করি, আমরা এক শহর থেকে অন্য শহরে আসা-যাওয়া করছি। যখন তারা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের নাশুকরি করল, তখন আল্লাহ তা'আলা যমীনের নিচের পানি শুকিয়ে দিলেন। পানি শুকিয়ে যাওয়ার পর বাগানের সব গাছ শুকিয়ে গেল এবং এর ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে তাদের ঘটনা উল্লেখ করেন।

আমার বন্ধুগণ! কেয়ামতের দিন আপনারা বলতে পারবেন না, আমাদেরকে কুরআন শোনানোর জন্য কেউ আসেনি, যারা আমাদের বিস্তারিত বলে দিবে, আমাদের ওপর আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা ইরশাদ করেন,

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

'সাবার অধিবাসীদের জন্য তো তাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন; দুটি উদ্যান; একটি ডান দিকে, অপরটি বাম দিকে। তাদের বলা হয়েছিল তোমরা তোমাদের প্রতিপালকপ্রদত্ত রিযিক ভোগ করো। তার জন্য রয়েছে উত্তম নগরী আর ক্ষমাশীল প্রতিপালক।'[২]

তোমাদের পক্ষ থেকে কোনো ভুল হয়ে গেলে মাফ চেয়ে নিবে। তোমাদের পরওয়ারদেগার তো মাফ করা পছন্দ করেন। কিন্তু তারা এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারল না। বলতে লাগল-

رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا

'হে আমাদের রব! তুমি আমাদের সফরের দূরত্ব বাড়িয়ে দাও।'[৩]

---

১. সূরা সাবাঃ আয়াত ১৫
২. সূরা সাবা : আয়াত ১৫
৩. সূরা সাবা : আয়াত ১৭

এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের বাগান উজাড় করে দিলেন। তারপর ইরশাদ করলেন,

ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَهَلْ نُجٰزِيْٓ اِلَّا الْكَفُوْرَ.

'তারা নাশুকরি করার কারণে আমি তাদের শাস্তি দিয়েছি। নাশুকরির শাস্তি এমনই হয়।'[১]

## অভাব, অপমান ও ভয়ের পোশাক

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে অন্য এক জাতির ব্যাপারে বলেন, তাদের কোনো ভয় ছিল না। দুশ্চিন্তাও ছিল না। তারা ছিল নিরাপদ ও প্রশান্ত হৃদয়ের অধিকারী। সর্বদিক দিয়ে তারা রিযিকপ্রাপ্ত ছিল। কিন্তু তারা আল্লাহ তা'আলার নাশুকরি করল। ফলে তারা অভাব-অনটনে পতিত হলো এবং তাদের ভিতর ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। এখানে আল্লাহ তা'আলা লেবাসের কথা বলেছেন। এ সম্পর্কে মুফাসসিরগণ লিখেছেন, যেমনিভাবে লেবাস মানুষের শরীরের সাথে লেগে থাকে, ঠিক তেমনিভাবে অভাবে পড়লে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ভয় পেলে শরীর অবসন্ন হয়ে যায়। যেন সে অভাব ও ভয়ের লেবাস পরিধান করেছে। কুরআনের আয়াত শুনুন-

فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ

'তারপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহরাজি অস্বীকার করল। ফলে আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মফল হিসেবে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আস্বাদন করালেন।'[২]

## আমাদের অভিযোগের চিকিৎসা

আমার বন্ধুগণ!

আজ আমরা স্বীয় জীবনের প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। আমাদের তো অভাব-অনটন ও ভয়ের লেবাস পরিধান করানো হয়নি। অথচ এ রকম পরিণতি হয়ে যেতে পারত। কেননা, প্রত্যেক বান্দা অভিযোগ করছে। সব কাজের ব্যাপারেই সবাই অভিযোগ করে। ধনী-গরিব সবাই অভিযোগ করছে। সবাই ভয় পায়, কখনও না এমন হয়ে যায়, এদিকে আবার কী হয়ে যায়? অমুক আক্রমণ করলে কী অবস্থা হবে? এগুলো কেন হচ্ছে? আমাদের নাশুকরির কারণে আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভয়ের লেবাস পরিয়ে দিচ্ছেন। এখন

---

১. সূরা সাবা : আয়াত ১৭

২. সূরা নাহল : আয়াত ১১২

চিকিৎসা হলো, আমরা বেশি-বেশি ইসতিগফার করব এবং আল্লাহকে কৃতজ্ঞতার সাথে মেনে চলব।

## অভিযোগের পট্টি

একবার রাবেয়া বসরী (রহ.) কোথাও দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পাশ দিয়ে এক যুবক যাচ্ছিল। তার মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী হয়েছে বেটা? সে বলল, মাথায় ব্যথা; তাই পট্টি বেঁধেছি। রাবেয়া বসরী তাকে তার বয়স সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। যুবক বলল, আমার বয়স ত্রিশ বছর। তিনি বললেন, তোমার মাথায় ত্রিশ বছরে এর আগে মাথা ব্যথা না হওয়ার কারণে তুমি তো শুকরিয়ার পট্টি কখনও বাঁধনি। এখন প্রথমবার মাথায় ব্যথার কারণে সাথে-সাথে অভিযোগের পট্টি বাঁধলে। আমাদের অবস্থা এমনই হচ্ছে। বছরের পর বছর নেয়ামত ও প্রশান্তির যিন্দেগি অতিবাহিত করছি; কিন্তু এর শুকরিয়া আদায় করছি না। অথচ একটু কষ্ট পেলেই সাথে-সাথে অভিযোগ শুরু করে দেই।

## স্বামী-স্ত্রীর অভিযোগ

স্বামী তার স্ত্রীর জন্য জীবনভর আরামের ব্যবস্থা করে। অথচ হঠাৎ একটু অভাব হলেই স্ত্রী বলে, আমি আপনার ঘরে এসে কী পেয়েছি? আপনি আমার জন্য কী করেন? সব তো বাচ্চাদের জন্য করছেন। ঠিক স্বামীও এরকম করে। স্ত্রী বাঁদীর মতো ঘরে পবিত্রভাবে যিন্দেগি অতিবাহিত করে, কিন্তু স্বামী এর পরোয়া করে না। স্ত্রী কথা বলতে চাইলে স্বামী তার কথায় কান দেয় না। এ হচ্ছে নাশুকরি।

## শোকরকারী ভিক্ষুকের মনোরঞ্জন

একবার নবীজির কাছে এক ভিক্ষুক এসে কিছু চাইল। নবীজির নিকট খেজুর ছিল। তিনি ওই খেজুর ভিক্ষুককে দিলেন। কিন্তু ভিক্ষুক এতে সন্তুষ্ট না হয়ে আরো চাইতে লাগল। অবশেষে নবীজি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর অন্য এক ভিক্ষুক এসে সেও কিছু চাইল। নবীজি তাকেও একটা খেজুর ভিক্ষা দিলেন। এসে সে খুব খুশি হলো। সে প্রাণভরে কৃতজ্ঞতা জানালে নবীজি তখন খাদেমকে উম্মে সালামার ঘরে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করার মতো কিছু আছে কিনা? খাদেম ঘরে গিয়ে চল্লিশ দীনার নিয়ে এল। নবীজি উক্ত চল্লিশ দীনার সেই ভিক্ষুককে দান করলেন।

## শুকরকারী স্ত্রীর মর্যাদা

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম স্বীয় ছেলে ইসমাঈল ও স্ত্রীকে মক্কার যে উপত্যকায় রেখে যান, সেখানে কোনো সবুজ বা আবাদী জমি ছিল না। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম যুবক হলে বনু জুহাম গোত্রের এক মেয়ের সাথে তার বিবাহ হয়। তিনি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। শিকার একটা অনিশ্চিত পেশা ছিল। কখনও কিছু পাওয়া যেত আবার কখনও কিছুই পাওয়া যেত না। একবার তিনি শিকারে থাকাবস্থায় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর ঘরে এসে স্বীয় পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের অবস্থা কেমন চলছে? পুত্রবধূ বললেন, কোনোমতে দিন পার হচ্ছে। শিকার কখনও মিলে আবার কখনও মিলে না। পুত্রবধূ এভাবে নাশুকরি করল। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, আমাকে ফিরে যেতে হবে। তোমার স্বামী এলে তাকে বলবে, যেন ঘরের চৌকাঠ বদলে ফেলে। পুত্রবধূ তাঁর কথা কিছুই বুঝল না। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম চলে গেলেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম শিকার থেকে ফিরে এলে তাঁর স্ত্রী তাঁকে সব ঘটনা খুলে বললেন। তখন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, তিনি তো আমার সম্মানিত পিতা ছিলেন। তাঁর সাথে তো আমার দেখা হয়নি। কিন্তু তিনি আমাকে একটি পয়গাম দিয়ে গেছেন। তা হলো চৌকাঠ বদলে নিতে। এর অর্থ হলো, তোমার স্ত্রী নাশুকরি করছে, একে পরিবর্তন করা হোক।

তারপর তিনি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিদায় করে দেন। কিছুদিন পর অন্য এক গোত্রের এক মেয়ের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। স্ত্রী ধৈর্যশালিনী ও শোকরকারিনী ছিলেন। এক বা দু-বছর পর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম আবারো তাঁদের ঘরে তাশরীফ আনলেন। তখনো ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ঘরে ছিলেন না। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নতুন পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন অবস্থা চলছে তোমাদের? নববধূ বলল, আমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাকে এতো উচ্চ আখলাক, তাকওয়া ও মহব্বতের অধিকারী স্বামী দান করেছেন। আমি তো তাঁর শুকরিয়া আদায় করতে পারছি না। ইবারহীম আলাইহিস সালাম ঘরের খানাপিনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। বধূ বললেন, রিযিক তো আল্লাহর হাতে। ব্যবস্থা হলে খেয়ে তাঁর শুকরিয়া আদায় করি; না পেলে সবর করি।

তাঁর এই উত্তর শুনে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম খুশি হয়ে গেলেন। তারপর তিনি বললেন, তোমার স্বামীকে আমার সালাম জানাবে আর বলবে, তোমার ঘরের চৌকাঠ খুব ভালো; একে হেফাযত করতে বলবে। আমি এখন

চলে যাচ্ছি। তারপর তিনি চলে গেলেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ঘরে এসে সব শুনে বললেন, তিনি তো আমার সম্মানিত পিতা ছিলেন। তিনি আমাকে চৌকাঠ হেফাযত করতে বলেছেন। অর্থাৎ তোমার যথাযথ হক আদায় করতে বলেছেন। এই স্ত্রীর গর্ভ থেকেই ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর পৃথিবীতে আগমন করে।

## একটি সূক্ষ্ম বিষয়

আলেমগণ লিখেছেন, আল্লাহর ফয়সালা ছিল, ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশধর থেকে নবীজির জন্ম হবে। তাই তিনি চাননি, তাঁর বংশক্রমে কখনও কোনো অকৃতজ্ঞ নারী থাকুক। এ কারণে আল্লাহ ইসমাঈল আলাইহিস সালামের আগের স্ত্রীকে পরিবর্তন করে একজন ধৈর্যশালিনী ও কৃতজ্ঞতা আদায়কারিনী স্ত্রীর ব্যবস্থা করলেন, যার গর্ভ থেকে আসা বংশধরের মধ্যে আমাদের নবীজি জন্মলাভ করেন।

## হজ্বের সফরে শুকরিয়া প্রকাশ

সাইয়্যেদ নাফীস শাহ হজের সময় শুকরিয়া সম্পর্কে একটি সুন্দর কবিতা লিখেন। তা এই–

شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا

تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا

'শোকর তোমার ও দয়াময়! আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না। আমায় তোমার ঘরে ডেকেছ, আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।'

اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا

گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا

'তোমার প্রেমিক বানিয়েছ, আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না। কাবার আশেপাশে ঘুরিয়েছ, আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।'

مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا

جام زم زم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا

'বহুদিনের তৃষ্ণা তুমিই নিবারণ করেছ। যমযমের পানি পান করিয়েছ, আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।'

ڈال دی ٹھنڈک مرے سینے میں تو نے ساقیا

اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا

'ও সাকী! তুমিই আমার অন্তরে প্রশান্তি ঢেলে দিয়েছ, তোমার বুকে তুলে নিয়েছ, আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।'

بھا گیا میری زبان کو ذکر الا اللہ کا

یہ سبق کس نے پڑھایا، میں تو اس قابل نہ تھا

'আমার জিহ্বা ইল্লাল্লাহর যিকিরে আদ্র হয়েছে।
এই পাঠ আমাকে কে শিখাল? আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।'

خاص اپنے درکار کھا تو نے اے مولا مجھے

یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا

'আমাকে তোমার ঘরের জন্যই খাস করেছ হে প্রভু! এভাবে মানুষের দ্বারে-দ্বারে ফেরাওনি, আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।

میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا

پر نہیں تو نے بھلایا، میں تو اس قابل نہ تھا

'আমি অপরাধী, তোমার স্মরণে ত্রুটি করেছি। কিন্তু তারপরও তুমি আমাকে ভোলনি। আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।

میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی

تو ہی مجھ کو در پہ لایا، میں تو اس قابل نہ تھا

আমি পথ হারা ছিলাম, তুমিই আমাকে পথ দেখিয়েছ, তুমিই আমায় দরবারে ঠাঁই দিয়েছ, আমি তো এর যোগ্য ছিলামনা।'

عہد جو روز ازل میں نے کیا تھا یاد ہے

عہد وہ کس نے نبھایا، میں تو اس قابل نہ تھا

'রোজে আযলের' দিন যে প্রতিশ্রুতি করেছিলাম, তা আমার মনে আছে।
সেই প্রতিশ্রুতি তো তুমি পুরা করালে, আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।'

تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب

گنبد خضراء کا سایہ، میں تو اس قابل نہ تھا

'তোমার দয়া ও করুণায় আমার নসিব হলো সবুজ গম্বুজের ছায়া। আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।'

میں نے جو دیکھا سو دیکھا بارگاہ قدس میں

اور جو پایا سو پایا، میں تو اس قابل نہ تھا

'আমি আল্লাহর দরবারে যা দেখেছি তা অসাধারণ, যা পেয়েছি তা ও অসাধারণ। আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।'

بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس

سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا

'দোজাহানের সরদারের দরবারে এসে ভাবছি, এই আমি কীভাবে এসে গেলাম; আমি তো এর যোগ্য ছিলাম না।'

## আমাদের অন্তরে বস্তুর প্রভাব

কত আশ্চর্যজনক কথা যে, যে দোকান ও দফতর থেকে আসবাবের মাধ্যমে রিযিক মিলে, সেখানে মানুষ আট ঘন্টা প্রতিদিন দায়িত্ব পালন করে। অথচ মুসাব্বিবুল আসবাব আল্লাহ, যাঁর কাছ থেকে রিযিকের ব্যবস্থা হয়, তাঁর কাছে হাত পাতার জন্য আট মিনিটও সময় পাওয়া যায় না। কেউ কি কখনও তাহাজ্জুদের সময় আল্লাহ তা'আলার দরবারে আট মিনিট হাত পেতেছে? ওখান থেকে তো কোনো উপায় ছাড়াই রিযিক মিলে। যেখান থেকে উপায় গ্রহণের মাধ্যমে পাওয়া যায়, সেখানে আট ঘন্টা আর যেখানে উপায় ছাড়াই পাওয়া যায়, সেখানে আট মিনিটও সময় দেওয়া যায় না। আমাদের উচিত, আমরা একাকি নির্জনতায় আল্লাহ তা'আলার সামনে বসে আমাদের সমস্ত অবস্থা পেশ করি। কেননা, যে বান্দা তাঁর দরবারে চায়, তিনি তার উপর অত্যধিক খুশি হন। তাঁর শুকরিয়া করলেও তিনি খুশি হন।

## হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া

একবার মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আপনার শুকরিয়া কিভাবে আদায় করব? আপনার একেকটি নেয়ামত

এমন যে, এগুলোর একটির জন্য যদি সারা জীবন আপনার ইবাদতে পড়ে থাকি, তারপরও এর শুকরিয়া আদায় হবে না। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর ওপর ওহী পাঠালেন, হে মূসা! যদি তোমার অন্তরে এ আওয়াজ থাকে যে, আপনার শুকরিয়া সারাজীবন আদায় করলেও তা আদায় হবে না। তাহলে তুমি যেন শুকরিয়ার হক আদায় করেছ। অর্থাৎ এটিই শুকরিয়ার জন্য যথেষ্ট।

## রিযিক পৌঁছানোওয়ালা পিওন

আমার বন্ধুগণ! আল্লাহ তা'আলা কখনও রিযিকের প্রাচুর্য এজন্য দেন যে, এগুলো সে যেন গরিব-অসহায়দের নিকট পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ এতো রিযিক আল্লাহ তা'আলা তাকে তার নিজের জন্য দেননি। বরং এখানে অন্য যাদের হক রয়েছে, তাদের পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাকে মাধ্যম বানিয়েছেন। কিন্তু উক্ত লোক তা ঠিকমতো পৌঁছে না দিলে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে রিযিক উঠিয়ে নিয়ে অন্য আরেকজনকে সেই দায়িত্ব দিয়ে দেন। তার পরিবর্তে আরেকজনকে মাধ্যম বানানো হয়, যা তার নিজের প্রয়োজনের চেয়েও অধিক। তা কেন? তা এজন্য এর প্রকৃত হকদার পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া। সুতরাং সে তা ঠিকমতো তার হকদারের নিকট না পৌঁছালে আল্লাহ তা'আলা তাকে এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে দেন এবং তার স্থানে অন্য আরেকজনকে দায়িত্ব দেন, যে ঠিকমতো তা পালন করবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা রিযিক অতিরিক্ত দিলে কখনও এটা মনে করা উচিত নয় যে, এগুলো সব আমারই জন্য। কুরআনের আয়াত-

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

'এবং তাদের ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অধিকার।'[১]

এই বক্তব্য অনুযায়ী এগুলোর মধ্যে অন্য বান্দারও হক রয়েছে। এ দায়িত্ব পালন করাও আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় করার তাওফীক দান করুন। তিনি আমাদেরকে বঞ্চিত হওয়া থেকে রক্ষা করুন। তিনি আমাদের মাথা অন্যের সামনে নত করা থেকে যেমনিভাবে হেফাযত করেছেন, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের হাতকেও অন্যের সামনে পাতা থেকেও রক্ষা করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

---

১. সূরা যারিয়াত : আয়াত ১৯

# ইল্‌মের ফযীলত

'আল্লাহর দরবারে ইল্‌মের মর্যাদা অনেক। আদম আলাইহিস সালাম হলেন মাটির তৈরী আর ফেরেশতারা নূরের তৈরী। আবার নূরের তৈরী সেই মাখলুক সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত। তারা সর্বদা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করেন। তাদের সেখানে কোনো বিরতি নেই। সুবহানাল্লাহ! কোথায় মাটি আর কোথায় নূর! কিন্তু ইল্‌ম এমন একটি নেয়ামত, যা এই মাটিকে সেই আলমে পাকের সিজদাকারী বানিয়েছেন। প্রবাদ আছে, অন্ধকার রাতে জোনাকির আলোও ভালো লাগে। চিন্তা করার বিষয় হলো, হযরত আদম আলাইহিস সালামের কিছু বস্তুর জ্ঞান অর্জন হলো। তারপর এই পুরস্কার পেলেন যে, আসমাউল হুসনার জ্ঞান নসিব হলো। কেয়ামতের দিন তার কী পুরস্কার অর্জিত হবে? আল্লাহু আকবার!'

# ইল্‌মের ফযীলত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ.

وَقَالَ فِيْ مَقَامٍ آخَرَ: كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ.

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

## অস্থায়ী ও স্থায়ী জীবন

দুনিয়াতে সমস্ত মানুষ সম্মানজনক জীবন অতিবাহিত করতে চায়। সম্মান দুভাবে অর্জন করা যায়। প্রথমত সম্পদ দ্বারা, দ্বিতীয়ত নেক আমল দ্বারা। কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য এই যে, সম্মান সম্পদ দ্বারা অর্জিত হয়, তা সম্পদের মতো অস্থায়ী হয়। কবি বলেন,

جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا

'দুর্বল ডালের উপর যে বাসা বাঁধা হবে, তা ক্ষণস্থায়ী হবে।

এজন্য সম্পদের উপর ভিত্তি করে সম্মান পাওয়া ব্যক্তি দুনিয়াতে তাড়াতাড়ি হীনতায় নেমে আসে। আমি বহুবার পর্যবেক্ষণ করেছি, এক ব্যক্তি আজ রাষ্ট্রপ্রধান তো কাল প্রজা। আজ আমীর, কাল ফকির। আজ মন্ত্রী, কাল বন্দী। আজ প্রধানমন্ত্রী, কাল প্রধান আসামী। এ কারণে সম্পদ দ্বারা অর্জিত সম্মান ক্ষণস্থায়ী। এর বিপরীত সম্মান নেক আমল দ্বারা অর্জিত হয়। আর তা চিরস্থায়ী হয়। কেননা, নেক আমল হলো স্থায়ী সৎকর্ম। নেক আমলের জন্য ইল্‌মের প্রয়োজন হয়। যে মানুষ ইল্‌ম অর্জন করে, সে দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মান পায়।

## ফেরেশতাদের ওপর আদম আলাইহিস সালামের মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা যখন এই সৃষ্টিজগতকে সাজানোর ইচ্ছা করলেন, তখন ফেরেশতাদের বললেন,

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

'আমি পৃথিবীতে খলীফা বানাতে যাচ্ছি।'[১]

ফেরেশতারা বলল, হে জগতের প্রভু! আপনি এমন মানুষকে খলিফা বানাবেন, যারা পৃথিবীতে ঝগড়া-বিবাদ করবে এবং রক্ত প্রবাহিত করবে।

وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

'আর আমরা আপনার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করি।'[২]

আমরা যখন আপনার ইবাদাত করি, তখন অন্য কাউকে সৃষ্টি করার প্রয়োজন কী? আল্লাহ তা'আলা বললেন,

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

'ফেরেশতারা! আমি তা জানি, যা তোমরা জান না।'[৩]

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)কে সৃষ্টি করলেন।

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا

'আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন।'[৪]

তারপর ফেরেশতাদের বললেন,

أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ

'তোমরা এসবের নাম বলো।'

তারা বলল.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

'আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন, তা ছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞান নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়।'[৫]

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ৩০
২. সূরা বাকারা : আয়াত ৩০
৩. সূরা বাকারা : আয়াত ৩০
৪. সূরা বাকারা : আয়াত ৩১
৫. সূরা বাকারা : আয়াত ৩২

তোমরা এই বস্তুগুলোর নাম শোনাও। তারা বলতে লাগল, আমরা ওই সমস্ত বস্তুর নাম জানি না। তারপর আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আদম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি ওগুলোর নাম বলে দিলেন।

## আদম আলাইহিস সালামের পুরস্কার

হযরত আদম আদম আলাইহিস সালাম সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। সবাই জানে, যখন কেউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তখন সে পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়। বরং দুনিয়াবাসী চেষ্টা করে, তাকে এমন পুরস্কার দেওয়া উচিত, যা অধিক সময় পর্যন্ত স্মরণ রাখে। তারা সেই উদ্দেশ্যে এর জন্য সার্টিফিকেট তৈরি করে, যেন সেই ছাত্র তাদের স্মরণ করে যে, আমি অমুক কাজের জন্য এই পুরস্কার পেয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস সালামকে পরীক্ষায় পাস হওয়ার পর এমন পুরস্কার দিয়েছেন, যা দুনিয়াবাসী সব সময় যেন স্মরণ রাখে। তাহলো, আল্লাহ তাঁকে সিজদা করার জন্য ফেরেশতাদের হুকুম করলেন। কত বড় পুরস্কার! সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের বললেন, আদমকে সিজদা করো।

## সর্বপ্রথম ইসরাফীল আলাইহিস সালাম সিজদা করেছেন

হাদীছে এসেছে, সর্বপ্রথম হযরত ইসরাফীল আলাইহিস সালাম হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করেন। তারপর জিবরাইল আলাইহিস সালাম তারপর সমস্ত ফেরেশতা সিজদা করলেন। কিন্তু বিতাড়িত শয়তান অস্বীকার করল।

أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

'সে অস্বীকার ও অহংকার করার ফলে কাফির হয়ে গেল।'[১]

### দুটি কথা

এখানে দুটি কথা বোঝা উচিত। কেননা, বর্ণনায় আছে, হযরত ইসরাফীল আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম সিজদা করলেন। এজন্য তার এই সম্মান অর্জিত হলো যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কপালে সম্পূর্ণ কুরআন লিখে দিলেন। এর উপর ভিত্তি করে আলেমগণ লিখেছেন, ইল্‌ম এমন একটি সম্মানিত নেয়ামত যে, এর কারণে আলেম সম্মানিত হয়। যেব্যক্তি কোনো আলেমকে সম্মান করে, আল্লাহর দরবারে সে পুরস্কারের উপযুক্ত হয়ে যায়। ইল্‌মের কারণে

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ৩০

হযরত আদম আলাইহিস সালাম বড় পুরস্কার পেলেন। যারা আলেম (হযরত আদম আলাইহিস সালাম)কে সম্মান করার জন্য সর্বপ্রথম সিজদা করল, আল্লাহ তাদের পুরস্কারে ভূষিত করলেন। যে আলেমের সম্মান করেনি, সে ছিল আযাযীল। সে দুনিয়ার প্রতি ইঞ্চি জায়গায় সিজদা করেছিল। তার জীবন ইবাদাত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু সে একজন আলেম (হয়রত আদম আলাইহিস সালাম)-এর সাথে বেয়াদবি করে বলল,

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ

'আমি তার থেকে ভালো। আমি আগুনের তৈরী আর সে মাটির তৈরী।'[১]

এর ফলে আল্লাহ তার উপর রাগান্বিত হলেন। তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বললেন,

إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ

'তোমার উপর কিয়ামত পর্যন্ত আমার অভিশাপ বর্ষিত হবে।'[২]

## ইল্‌মের মর্যাদা

আল্লাহর দরবারে ইল্‌মের অনেক মর্যাদা আছে। আদম আলাইহিস সালাম মাটির তৈরী আর ফেরেশতারা নূরের তৈরী। আবার তারা সেই মাখলুক, যারা সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত।

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ . يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ

'এবং তার সান্নিধ্যে যারা আছে, তারা অহংকারবশে তার ইবাদাত করা থেকে বিমুখ হয় না এবং ক্লান্তিও বোধ করে না। তারা দিবা-রাত্র তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, আর তাতে শৈথিল্য করে না।'[৩]

আল্লাহর নিকট যারা আরশের উপরকার সৃষ্টি, তারা সর্বদা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করেন। তাদের সেখানে কোনো বিরতি নেই। সুবহানাল্লাহ! কোথায় মাটি, কোথায় আরশ! কিন্তু ইল্‌ম এমন একটি নেয়ামত, যা এই মাটিকে সেই আলমে পাকের সিজদাকারী বানিয়েছেন। প্রচলিত আছে, অন্ধকার পাত্রে জোনাকির আলোও ভালো লাগে। চিন্তা করার বিষয় যে,

---

১. সূরা আরাফ : আয়াত ১২
২. সূরা ছোয়াদ : আয়াত ৭৮
৩. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ১৯-২০

হযরত আদম আলাইহিস সালামের কিছু বস্তুর জ্ঞান অর্জিত হলো। তারপর এই পুরস্কার পেলেন যে, আসমাউল হুসনার জ্ঞান তাঁর নসিব হলো। কেয়ামতের দিন তার কী পুরস্কার অর্জিত হবে! আল্লাহু আকবার!

## আদম আলাইহিস সালাম ও কারিগরি শিল্প

এই দুনিয়া থেকে আকাশ পর্যন্ত ফেরেশতা থেকে আরশ পর্যন্ত ইল্‌মে এলাহীর মাদ্রাসা। সেই মাদ্রাসা থেকে আদম আলাইহিস সালাম দুনিয়ার মাঝে কৃষি, হস্তশিল্প ও কারিগরি বিদ্যা নিয়ে এসেছেন। আপন সন্তানদের তিনি এসব বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। দুনিয়াতে তিনি প্রথম শিক্ষক ছিলেন।

## হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম ও লেখার ইল্‌ম

হযরত আদম আলাইহিস সালামের পর হযরত ইদরীস আলাইহিস সালাম এসেছেন। হাদীছে এসেছে, তিনি দুনিয়ার মধ্যে ইল্‌মকে কলমের মাধ্যমে প্রসারিত করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম এর খেদমত করেছেন। তার আগে ইল্‌ম মুখে-মুখে অন্যের কাছে পৌঁছানো হতো। কলমের সাহায্য নেওয়া হতো না। কথাকে লেখার মাঝে আনার ইল্‌ম সর্বপ্রথম দুনিয়ার মধ্যে ইদরীস আলাইহিস সালাম করেছেন। তিনি ইবরানী ও সুরয়ানী ভাষার এবং অন্য বর্ণনায় আরবি ভাষারও ভিত রাখেন। প্রথমে অক্ষর, তারপর শব্দ, তারপর পাথরের উপর লিপিবদ্ধ করা শুরু করেছেন।

## নূহ আলাইহিস সালাম ও হালাল হারামের জ্ঞান

ইদরীস আলাইহিস সালামের পর হযরত নূহ আলাইহিস সালাম এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কাঠ দ্বারা বস্তু বানানোর ইল্‌ম দিয়েছেন। তিনি নৌকা বানালেন। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হালাল-হারামের জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। দুনিয়ার মাঝে প্রথম হালাল-হারামের জ্ঞান হযরত নূহ আলাইহিস সালাম নিয়ে এসেছেন। সেখান থেকে হালাল-হারাম শুরু হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ.

'আমি তোমার নিকট ওহি প্রেরণ করেছি যেমন প্রেরণ করেছি নূহ ও তার পরবর্তী নবীদের প্রতিও।'[১]

এই আয়াতে নূহ আলাইহিস সালামের নাম বিশেষভাবে এসেছে।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১৬৩

## শরীয়তের পূর্ণতা

কেমন জানি শরীয়ত হযরত নূহ আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হয়। তার উদাহরণ এই যে, বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হলো। তাকে প্রথমে কাপড় পরিধান করানো হয়নি। কেননা, সে ছোট। একটা কাপড় দ্বারা পেঁচিয়ে রাখে, যাতে গন্ধ না ছড়ায়। শুরুতে তার শরীর কাপড়বিহীন থাকে। কিছুদিন পর একটা ছোট পোশাক বানায়। তেমনিভাবে তার জন্য নতুন জায়গা বানানো প্রয়োজন হয়। শরীর বৃদ্ধির সাথে-সাথে জামার পরিমাপ বৃদ্ধি পায়। সাধারণত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে মানুষের শরীর যেটুকু গঠন হয়, তারপর তার পোশাক সারা জীবনের জন্য ওই মাপের হয়ে থাকে। এটিই ইনসানিয়াতের উদাহরণ। শুরুতে তার কোনো জ্ঞানই ছিল না। তাকে প্রথমে কৃষিবিদ্যা, কারিগরিবিদ্যা এবং এসব বিদ্যাকে কলম দ্বারা আয়ত্ব করার বিদ্যা শিখানো হয়, যেন এটি প্রথমে শরীয়তের পোশাক ছিল, যা মানুষ পরিধান করেছে।

তারপর নবীগণ তাশরীফ এনেছেন। তো তখন থেকে ক্রমান্বয়ে শরীয়তের লেবাসের আকৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে। শরীয়ত ধারাবহিকভাবে পূর্ণতা অর্জন করল। নবীগণ তাশরীফ আনার পর ইনসানিয়াত যৌবনে পৌঁছল। ফলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক শরীয়তের লেবাস নিয়ে এলেন, যার আকার কেয়ামতের আগে আর বৃদ্ধি হবে না। এর পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে না। এ কারণেই ইসলাম কিয়ামত পর্যন্ত সবার জন্য সমভাবে যথেষ্ট।

## নবীগণ ও বিশেষ ইল্‌ম

পৃথিবীতে একেক নবী একেক বিষয়ে বিদ্যা নিয়ে এসেছেন। যেন একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কয়েকজন ওস্তাদ পড়ান। তারা সবাই সব বিষয়েই জ্ঞান অর্জন করেছেন ঠিক, কিন্তু নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের ডিগ্রী অর্জন করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে সমস্ত নবী শরীয়তের ইল্‌ম নিয়ে এসেছেন। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো এক বিষয়ে আল্লাহ একেক নবীকে বিশেষত্ব দান করেছেন।

## ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তর্কবিদ্যা

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে তর্কবিদ্যা নিয়ে এসেছেন। বিতর্কের জন্য তিনটি বিষয় জরুরি। প্রথমত, কোনো বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা কিংবা গবেষণা করার অভ্যাস থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, অন্তর শান্ত হতে হবে। তৃতীয়ত, যখন তার বিপরীত কেউ কথা বলে, তখন এমন স্পষ্ট উত্তর

দিবে যে তার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মাঝে তিনটি সৌন্দর্য ছিল।

তাঁর ভিতর চিন্তা-ফিকিরের এতো অভ্যাস ছিল যে, যখন তারকা দেখেছেন তখন বললেন,

هٰذَا رَبِّيْ

'এটি আমার প্রভু।'[১]

কিন্তু যখন দেখলেন, তা ডুবে যাচ্ছে, তখন বললেন, নিমজ্জমান বস্তু প্রভু হতে পারে না। এ আমার প্রভু নয়। তারপর চাঁদ উদিত হলো। তা দেখে বললেন,

هٰذَا رَبِّيْ

'এটি আমার প্রভু।'[২]

যখন দেখলেন, তা ডুবে যাচ্ছে, তখন ভাবলেন, এ আমার প্রভু হতে পারে না। তারপর সূর্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ল। তখন বললেন,

هٰذَا رَبِّيْ هٰذَا اَكْبَرُ

'এটি আমার প্রভু। কেননা এটি অনেক বড়।'[৩]

فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيْءٌ مِمَّا تُشْرِكُوْنَ

'যখন সূর্য ডুবে গেল, তখন বললেন, আমি নিমজ্জমান বস্তুকে প্রভু মানি না।'[৪]

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ

'আমি আমার রুখ ওই যাতের দিকে করি, যিনি যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন।'[৫]

বিতর্কের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট এই যে, সে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে চিন্তা ফিকির করত এবং মনে শান্তি অর্জন করত। আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে এই নেয়ামত দান করেছেন।

---

১. সূরা আন'আম : আয়াত ৭৬
২. সূরা আন'আম : আয়াত ৭৭
৩. সূরা আন'আম : আয়াত ৭৮
৪. সূরা আন'আম : আয়াত ৭৮
৫. সূরা আন'আম : আয়াত ৭৯

তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন-

كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰى

'হে আল্লাহ! আপনি মৃতকে কিভাবে জীবিত করেন?

আল্লাহ তা'আলা বললেন,

اَوَلَمْ تُؤْمِنْ

'আপনি কি বিশ্বাস করেন না?'

তিনি বললেন, হে আমার প্রভু! এর উপর আমার পূর্ণ ঈমান আছে।

وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِيْ

'আমি তো শুধু মনের প্রশান্তির জন্য জিজ্ঞাসা করেছি।'[১]

আল্লাহ তা'আলা কিছু মৃত পাখিকে জীবিত করে দেখালেন। যখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের অন্তরে পূর্ণ বিশ্বাস এসে গেল, তখন নমরুদের দরবারে তর্ক করলেন এবং তাকে চুপ করিয়ে দিলেন। বিস্তারিত বিবরণ এই যে, একবার নমরুদ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে ডাকল এবং জিজ্ঞাসা করল, তুমি আমাকে কেন খোদা মান না। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, আমার প্রভু তিনি, যিনি জীবিতকে মৃত করতে পারেন আবার মৃতকে জীবিত করতে পারেন। নমরুদ বড় কম জ্ঞানের মানুষ ছিল। যদি জ্ঞান থাকত, তাহলে কেন তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করেনি?

সে বলতে লাগল, এ কাজ তো আমিও করতে পারি। তারপর এক নির্দোষ ব্যক্তিকে ডেকে এনে হত্যা করল। আর এক দোষী ব্যক্তিকে ডেকে ক্ষমা করে দিল। তারপর সে বলতে লাগল, এই দেখো, জীবিত ও মৃত করার কাজ আমি করে দেখিয়েছি। একথা শুনে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বুঝলেন, তাকে শক্ত করে বুঝ দিতে হবে। তিনি বললেন,

فَإِنَّ اللّٰهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ

'আমার প্রভু সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উঠান। যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহলে সূর্যকে পশ্চিম দিক থেকে উঠিয়ে দেখাও।'[২]

এবার নমরুদ হতভম্ব হয়ে গেল। তার নিকট কোনো উত্তর ছিল না।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৬০

২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ২৫৭

## ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও স্বপ্নবিদ্যা

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দুনিয়ার মাঝে স্বপ্নের ব্যাখ্যার জ্ঞান নিয়ে এসেছেন, যাকে স্বপ্নব্যাখ্যার জ্ঞান বলে। যখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেলখানায় ছিলেন, ওই সময় তিনি দুই ব্যক্তির স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাদের একজনকে হত্যা করা হলো এবং দ্বিতীয়জনকে ক্ষমা করা হলো। একবার বাদশাহ স্বপ্ন দেখলেন। তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না। একব্যক্তি বাদশাহকে বলল, জেলখানায় একজন কয়েদি আছে। আমি তাকে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করব। তারপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম সেই স্বপ্নের এমন ব্যাখ্যা দিলেন, যাতে বাদশাহর মন ভরে গেল। এমন একটি সময় এল যে, বাদশাহ তার সিংহাসন ও মুকুট হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দায়িত্বে দিয়ে দিলেন।

### একটি সূক্ষ্ম বিষয়

এখানে একটি সূক্ষ্ম চিন্তার বিষয় আছে। আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দুটি বস্তুর মধ্যে সফলকাম করেছেন। এক. সৌন্দর্য, দুই. স্বপ্নের ব্যাখ্যা। নবীজি বলেন, আমার ভাই ইউসুফের গায়ের রং শ্যামলা ছিল। এমন সুন্দর ছিল যে, মিসরের সম্রাটের স্ত্রী দেখে বলল,

مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

'এ কোনো মানুষ নয়। এ তো সম্মানিত এক ফেরেশতা।'[১]

যে দেখত, সে-ই মন দিয়ে বসত। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন যৌবনে পৌঁছলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জ্ঞান দান করলেন। কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে,

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا

'যখন সে পূর্ণ বয়সে পৌঁছল, তখন আমি তাকে জ্ঞান দান করলাম। তার মাঝে বিশেষ জ্ঞান ছিল।'[২] কুরআন শরীফে আছে,

تَأْوِيلَ الْأَحَادِيثِ

'স্বপ্নের ব্যাখ্যার জ্ঞান।'[৩]

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৩১
২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২২
৩. সূরা ইউসুফ : আযাত ২১

এখানে বোঝার বিষয় হলো, যখন তার ভাইয়েরা তাঁকে কূপে ফেলে দিল আর তিনি বের হয়ে এলেন; তারপর যারা তাকে উদ্ধার করল, তারা তাঁকে বিক্রি করে দিল। তখন তার নিকট এই দুই নেয়ামত থেকে একটি নেয়ামত ছিল। তা ছিল সৌন্দর্যের নেয়ামত। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ.

'এবং তারা তাকে বিক্রি করল স্বল্পমূল্যে মাত্র কয়েক দেরহামের বিনিময়ে।'[১]

যখন সৌন্দর্যকে ইল্‌ম থেকে পৃথক করা হলো, তখন আল্লাহর নিকট সৌন্দর্যের কোনো মূল্য রইল না। সুন্দরওয়ালাদের জন্য চিন্তার বিষয়! ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্যের মূল্য অল্প ছিল। চিন্তার বিষয়! আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জ্ঞান দান করলেন। তখন তার ওপর পরীক্ষা করলেন। আল্লাহ তাকে সফলতা দিলেন। তিনি জেলে গিয়েছিলেন। একসময় জেল থেকে বের হলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, দুর্ভিক্ষ এসেছে; আপনি বলুন, আমরা কী করব? তিনি বললেন,

اِجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ

'আমাকে খাদ্যমন্ত্রী বানিয়ে দিন।'[২]

তাকে খাদ্যমন্ত্রী বানিয়ে দেওয়া হলো।

দেখুন, আল্লাহ ইল্‌মের কারণে সম্মান দিয়েছেন। সম্মান কী অর্জিত হলো? সিংহাসনে বসে ধনভাণ্ডার ভাগ করছিলেন। একসময় ভাইয়েরা খাদ্য নেওয়ার জন্য এল। ইউসুফ আলাইহিস সালাম একটা বাহানা করে তার ভাই বিনইয়ামীনকে নিজের কাছে রেখে দিলেন। পরে ভাইয়েরা এল এবং বলল,

يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

'হে মিসরের অধিপতি! আমাদের পরিবার খাদ্যসংকটে পড়ে গেছে। আমরা অল্প মূল্য নিয়ে এসেছি। আপনি আমাদের পূর্ণ খাদ্য দিয়ে দিন। আমাদের সদকা করুন। আল্লাহ সদকাকারীদের প্রতিফল দেন।'[৩]

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ২০
২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৫৫
৩. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৮

ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাবলেন, আমি নবীর পুত্র; এরাও নবীর পুত্র। আমার সামনে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাচ্ছে। তখন তিনি বললেন,

مَا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ

'তোমরা ইউসুফ-এর সাথে কী ব্যবহার করেছ?'[১]

একথা শুনে তাদের চোখ খুলে গেল। তারা জিজ্ঞাসা করল,

أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ

'তুমিই কি ইউসুফ?'

ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন,

قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهٰذَا أَخِي

'হাঁ, আমি ইউসুফ আর এ আমার ভাই।'

قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

আল্লাহ আমাদের উপর দয়া করেছেন যে, নিশ্চয় যেব্যক্তি মুত্তাকী ও ধৈর্যশীল। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের মতো যারা নিজের নফসের অনুসরণকারী হবে, আল্লাহ তাদের মাটিতে দাঁড় করাবেন। যে ইউসুফ আলাইহিস সালামেরর মতো খোদাভীতির জীবন অতিবাহিত করবে। আল্লাহ তাকে রাজ-সিংহাসনে বসাবেন। আল্লাহ এমন সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান নষ্ট করবেন না।[২]

## দাউদ আলাইহিস সালাম ও বর্ম তৈরির জ্ঞান

হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা লোহা দ্বারা বর্ম তৈরির জ্ঞান দান করেছিলেন। আল্লাহ বলেন,

وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ.

'আমি তার জন্য লোহাকে নরম করেছি।'[৩]

তিনি লোহার আংটা বানাতেন। তারপর সেগুলো একত্র করে লোহার বর্ম বানাতেন। যা সেই সময় যুদ্ধে কাজে লাগত। আল্লাহ তাঁকে এই বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন। যার বর্ণনা আল্লাহ কুরআনে করেছেন–

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৯
২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৯০
৩. সূরা সাবা : আয়াত ১০

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ

'আমি তাকে লোহার পোশাক বানানোর জ্ঞান দান করেছি।'[১]

এই ইল্‌মের কারণে আল্লাহ তাঁকে সাম্রাজ্য দান করেছেন। দাউদ আলাইহিস সালামের পিতা বাদশাহ ছিলেন না।

## সুলাইমান আলাইহিস সালাম ও পাখির সাথে কথা বলার জ্ঞান

তারপর তাঁর ছেলে হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বাদশাহ হলেন। তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন এবং সে সময়কার বাদশাহও ছিলেন। আল্লাহ তাঁকে এমন বাদশাহী দান করলেন, যেমনটি দুনিয়াতে আগে ও পরে কেউ পায়নি। তার রাজত্ব মানুষ, জিন, পাখি, মাছ ও বাতাসের উপর ছিল। তাঁকে এক বিশেষ জ্ঞান দান করা হলো। তিনি মানুষকে বললেন–

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ

'হে মানুষ! আল্লাহ আমাকে পাখির সাথে কথা বলার জ্ঞান দান করেছেন।'[২]

একবার তিনি দেখলেন, তাঁর সৈন্যদের মাঝে হুদহুদ নেই। এই হুদহুদ পাখি তাঁর ঠোঁট দিয়ে মাটিতে পানি আবিষ্কার করত। যখন তিনি তাকে অনুপস্থিত দেখলেন, তখন বললেন, সে শাস্তির উপযুক্ত হবে। এ সময় হুদহুদ চলে এল। সে বলল, আমি আপনার নিকট সাবা সম্প্রদায়ের এক শাহজাদীর খবর নিয়ে এসেছি। তারা সূর্যের পূজা করে।

## ইল্‌মের কারণেই হুদহুদ পাখির সাহসী ভূমিকা

এখানে চিন্তা করা উচিত, কোথায় সুলাইমান আলাইহিস সালামের স্থান আর কোথায় ছোট পাখি হুদহুদের স্থান। কেননা, তার নিকট ইল্‌ম ছিল। তাই সে বড়-বড় কথা বলেছিল। সে বলল–

أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ

'আমি যা জানি, আপনি তা জানেন না। আমি সাবা গোত্রের খবর নিয়ে এসেছি।'[৩]

---

১. সূরা আম্বিয়া : আয়াত ৮০
২. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ১৬
৩. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ২২

এই পাখির কি সুযোগ ছিল যে সুলাইমান আলাইহিস সালামের সামনে কথা বলবে? কিছু ইল্‌ম তাকে এই অধিকার দিয়েছে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম তার সংবাদের ভিত্তিতে চিঠি পাঠালেন। শেষে ওই সময়টি এল যে, রানী বিলকীস নিজে তাঁর দরবারে এসে হাজির হলেন।

## আসিফ ইবনে বারখিয়ার মর্যাদা

যখন বিলকীস রানী আসছিল, তখন সুলাইমান আলাইহিস সালাম ইচ্ছা করলেন, সে আসার আগে-আগে তার রাজসিংহাসনটা নিয়ে আসবেন। যখন দরবার বসল, তখন হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন,

أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

'তোমাদের মাঝে কে আছে, যে বিলকীস আসার আগে তার সিংহাসনটা আমার নিকট নিয়ে আসবে?'[১]

قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ

'ইফরীত নামক জিন বলল, আমি তার সিংহাসন আপনি দাঁড়ানোর আগেই নিয়ে আসব।[২]

হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, দেরি হয়ে যাবে। আমি তাড়াতাড়ি চাই। তখন জিন চুপ হয়ে গেল। তারপর সুলাইমান আলাইহিস সালাম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ কি আছে এই কাজটি করে দেখাবে? শেষে ইবনে বারখিয়া নামক এক ব্যক্তি দাঁড়াল–

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ

'যেব্যক্তির নিকট কিতাবের ইল্‌ম ছিল, সে বলল, তার সিংহাসন আপনি চোখ ফেরানোর আগেই আমি নিয়ে আসব।'

فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي

'সুলাইমান চোখ ফিরিয়ে দেখল, সিংহাসন উপস্থিত। সে বলল, এটি আমার প্রভুর অনুগ্রহ।'[৩]

এর দ্বারা ইল্‌মের শক্তি অনুভব করা উচিত। যে কাজ জিন করতে পারেনি, সেই কাজ আলেম মানুষ করে দেখিয়েছে!

---

১. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ৩৮
২. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ৩৯
৩. সূরা নাম্‌ল : আয়াত ৪০

## খিযির আলাইহিস সালাম ও জাগতিক বিদ্যা

ইল্‌মের এতখানি গুরুত্ব যে, নবী নন এমন ব্যক্তিও নবীর শিক্ষক হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন। হযরত খিজির আলাইহিস সালাম সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ লিখেছেন, তিনি নবী ছিলেন না। বড় ওলী ছিলেন। তাঁর নবী হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে; কিন্তু ওলী হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। তিনি নবী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর কাছে একটি বিশেষ জ্ঞান ছিল, যার বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا.

'তারপর তারা সাক্ষাত পেল আমার বান্দাদের মধ্যে একজনের, যাকে আমি আমার নিকট হতে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং আমার নিকট হতে শিক্ষা দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান।'[১]

তাঁকে আল্লাহ খোদাপ্রদত্ত ইল্‌ম দান করেছেন, যা ছিল জাগতিক জ্ঞান। সৃষ্টির জ্ঞান অর্জন করা আমাদের জন্য প্রয়োজন নেই। আমাদের শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করা চাই। নবীগণ শরীয়তের জ্ঞান নিয়ে আসতেন। কিন্তু খিজির আলাইহিস সালামের নিকট সৃষ্টির জ্ঞান ছিল। এমন একটি সময় এসেছে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পয়গম্বর হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে পাঠালেন, আপনি গিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করুন। এখানে এই সূক্ষ্ম বিষয়টি চিন্তা করা উচিত যে, এই নবী নবী নন এমন ব্যক্তির নিকট জ্ঞান অর্জন করতে গেছেন।

## ইবাদাতের পূর্ণতা

প্রথমে শরীয়তের মাঝে ইবাদাত আংশিক ছিল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তে ইবাদাত পূর্ণতা পেল। যেমন- নামায আগে পড়া হতো, কিন্তু পূর্ণ নামায নয়। আল্লাহ এই উম্মতকে পূর্ণ নামায দিয়েছেন। রোযা আগে রাখা হতো, কিন্তু পূর্ণ নয়। এই উম্মত পূর্ণ রোযা পেল। তারাও তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তাদের মাঝে সম্মানসূচক সিজদা জায়েয ছিল। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে তাঁর পিতামাতা সম্মানসূচক সিজদা করলেন। এই উম্মতে তাওহীদের বাস্তবায়ন হয়েছে পূর্ণভাবে। ওই সমস্ত বস্তু, যার মাঝে তাওহীদের বিপরীত কোনো বিষয়ের সন্দেহ হয়েছিল, শরীয়ত তা বন্ধ করে দিয়েছে। যেমন ছবি তৈরি করা হারাম করে দিয়েছে, যাতে মূর্তি না বানায়। সম্মানসূচক সিজদা হারাম হয়ে গেছে,

---

১. সূরা কাহফ : আয়াত ৬৫

যেন অন্যের ইবাদাত নষ্ট না হয়। যা তাওহীদের বিপরীত, শরীয়ত তার মূল উৎপাটন করে দিয়েছে। এই পূর্ণতার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা দিয়েছেন-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

'আজ আমি তোমাদের জন্য দীনকে পূর্ণ করে দিয়েছি। তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি।'[১]

## আলেমের মর্যাদা

আমার বন্ধুগণ!

এই দুনিয়ায় ইল্‌মের বাদশাহ চলছে। বরং বলা যায়, দুনিয়ার মাঝে ইল্‌মের গৌরব, ইল্‌মের উপর আল্লাহর গৌরব। আল্লাহ বলেন,

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

'প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির উপরে রয়েছে একজন সর্বজ্ঞানী।'[২]

কেননা দুনিয়াতে ইল্‌মের গৌরব বিরাজমান। এজন্য নবীদেরকে আল্লাহ তা'আলা অনেক বড় সম্মান দান করেছেন। এই ধারাবাহিকতায় নবুওত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছে। এই নেয়ামত কেয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে। এজন্য যেব্যক্তি ইল্‌ম অর্জন করবে, সে অগ্রগামী হয়ে যাবে। আলেমগণ নবীদের বংশধর। হাদীছে এসেছে-

الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

'আলেমরা নবীগণের উত্তরাধিকারী।'

তারা সেই কাজ করবে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় করেছেন। এই নেসবতের কারণে আল্লাহ তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। কাজও বড়, মর্যাদাও বড়। এতো বড় মর্যাদা যে,

فَقِيهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

'হাজারো আবেদ থেকে শয়তানের নিকট একজন আলেম বড় ভয়ংকর।' হাজার আবেদ ফাসেক, গুনাহগার তো নয়। হাজার আবেদ একদিকে, একজন আলেম অন্যদিকে। কথাটা বান্দাকে পেরেশান করে দেয়। ইল্‌ম আল্লাহর গুণ। আল্লাহর বাদশাহী সঠিক। যার মাঝে ইল্‌মের গুণ আসবে,

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৩

২. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৭৬

তার মাঝে বাদশাহীর গুণ আসবে। ইবাদাত করা গোলামের কাজ। গোলামের সংখ্যা যদি এক হাজার হয়, তারা কি একজন বাদশাহর বিরোধিতা করতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى اَدْنٰكُمْ

'আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর এমন, যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর।'

## আলেমদের মূল দায়িত্ব

আলেমদের মূল কাজ এই আয়াতে বলা হয়েছে-

الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ

যাদেরকে আমরা আল্লাহওয়ালা বলি। احبار، حبر এর বহুবচন, যার দ্বারা উদ্দেশ্য আলেম। তাদের মূল কাজ কী? بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللهِ তাঁদের কাজ কিতাবুল্লাহর সংরক্ষণ।[১] আলেমগণ কুরআনের প্রত্যেক আয়াতের উপর লক্ষ্য করে তা সংরক্ষণ করেন। বরং তার খবর দুনিয়ার প্রত্যেক বান্দার নিকট পৌছান। কোনো খারাপ ব্যক্তির মতামত অনুপ্রবেশ করতে দেন না। তাঁরা সত্যকে মিথ্যা থেকে পৃথক করে দেন। আলেমদের পুরো জীবন এই পথে অতিবাহিত করা উচিত। একাজ তখন সহজ হবে, যখন খাঁটি মনে কাজ করবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كُوْنُوْا رَبّٰنِيّٖنَ

'তোমরা রাব্বানী হয়ে যাও।'

এটা আমরের সীগা। আল্লাহ আলেমদের বলেন, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও।

بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتٰبَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ

'কেননা, তোমরা কুরআন শরীফ পড়াও। এজন্য তোমাদের উচিত আল্লাহওয়ালা হয়ে যাওয়া।'[২]

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৪

২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ৭৯

## ইল্‌মের উদ্দেশ্য

আলেমগণ যখন ইখলাসের সাথে কাজ করে, আল্লাহ্ তাদের উপর বরকত অবতীর্ণ করেন যেমন নবীদের উপর করেছেন। ইল্‌মের উদ্দেশ্য হলো ইখলাস। ইখলাস ব্যতীত কাজ হয় না। দীনের কাজ ইখলাস দ্বারা হয় – অর্থ দ্বারা হয় না।

## ইখলাসের তাজমহল

আকাবিরে দেওবন্দ আল্লাহর কিছু মুখলেছ বান্দার একটি জামাতের নাম, যাদের অন্তরে ঢনের ব্যথা ছিল। তাঁরা এমন কাজ করেছেন যে, তাঁদের সে অনুগ্রহ পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। আল্লাহর রহমত ও তাঁর দয়া এই অধমকে দীনের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে ৪০-এর অধিক রাষ্ট্রে ভ্রমণ করার তাওফীক হয়েছে। আমেরিকা, আফ্রিকা, মালয়শিয়ার জঙ্গল, রাশিয়ার সার্বিয়ার জঙ্গল, যে জায়গায় ছয় মাস রাত্র, ছয় মাস দিন ওই জায়গা দেখেছি, যাকে দুনিয়ার শেষ প্রান্ত বলা হয়। সেখানে প্রশাসন লিখে দিয়েছে, এটা দুনিয়ার শেষ প্রান্ত।

বছর একটা দিন এমন আসে, যেদিন সমুদ্রের পাড়ে দুনিয়ার লাখ-লাখ পর্যটক উপস্থিত হয়। সূর্য ওখানে অস্ত যেতে আসে। কিন্তু অস্ত যেতে-যেতে আর অস্ত যায় না – আবার উদয় হতে শুরু করে। লাখ-লাখ লোক সেখানে এই দৃশ্য দেখে। এজন্য একে দুনিয়ার শেষ প্রান্ত বলে। আল্লাহ এই অধমকে যেখানে নিয়েছেন, ওলামায়ে দেওবন্দের কোনো-না-কোনো রূহানি সন্তানকে দীনের খেদমত করতে দেখেছে।

কবি বলেন–

یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے

ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے ہر سرو یہاں مینارہ ہے

এটি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দোলনা, ইতিহাসের দুর্লভ অধ্যায়,

এখানে প্রতিটি ফুল একটি স্ফুলিঙ্গ, প্রতিটি বৃক্ষ একটি সুউচ্চ মিনার।

عابد کے یقین سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل

آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل

হাজী আবেদ রহ.-এর একীন দ্বারা আলোকিত, নেককারদের স্বচ্ছ আমল,

দৃষ্টিরা কি কখনও দেখেছে ইখলাসের এমন তাজমহল?

کہسار یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں
اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں

পর্বতরাজি এখানে দেবে যায়, তুফান এখানে থেমে যায়।
এই ফকিরী ঝুঁপড়ির সম্মুখে রাজপ্রাসাদগুলো অবনত হয়ে যায়।

## ফয়েজ পেতে একটি শর্ত

দীনের কাজ তখন হয়, যখন অন্তরে খুলুস থাকে। অর্থের নিয়তে করলে উপকার হয় না। আল্লাহর জন্য করলে আল্লাহ উপকৃত করবেন। প্রত্যেকের উপকার হয় না। শুধু তার উপকার হয়, যাকে আল্লাহ কবুল করেন।

## শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.)-এর ফয়েজ

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.) আকাবির ওলামায়ে দেওবন্দের একজন বিরল ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দীনের দরদ দিয়েছেন। তিনি ঢনের কাজ করেছেন। এর জন্য তিনি কুরবানি দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁর কুরবানির কারণে তাঁকে এমন কিছু ছাত্র দিয়েছেন, যারা দীনের অনেক কাজ করেছেন।

আমি শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর কোনো ছাত্রকে এমন দেখিনি যে, তাঁরা জীবনে দীনের কাজ ছাড়া অন্য কিছু করেছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সাইয়্যেদ হুসাইন আহমাদ মাদানি, মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী বেশি প্রসিদ্ধ। শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর ছাত্রদের একজন অখ্যাত ব্যক্তিত্বর আলোচনা আজ আপনাদের সামনে পেশ করছি। আপনারা কিছু নতুন কথা জানতে পারবেন।

## হযরত মাওলানা গোলাম রাসূল (রহ.)-এর মর্যাদা

মুলতানের পরে সুজাআবাদ গ্রাম দিয়ে এক বুযুর্গ যাচ্ছিলেন। তাঁর নাম মাওলানা গোলাম রাসূল পুনটুবি (রহ.)। পুনটু একটি ছোট গ্রাম। তিনি সেই গ্রামে দাওরা পড়েছেন। শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর সাথে এমন সম্পর্ক ছিল যে, হযরত যে রাস্তা দিয়ে দারুল হাদীছে যেতেন, তিনি রাতে গোপনে সেই রাস্তা পাগড়ি দিয়ে ঝাড় দিতেন। তিনি গোপন হয়ে থাকতেন, যাতে অন্য ছাত্ররা তাকে না দেখে। একবার পাগড়ি দ্বারা ঝাড় দেওয়া অবস্থায় শায়খুল হিন্দ দেখলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, গোলাম রসূল! এ তুমি কী করছ? শেষে তাকে বলতে হলো। শায়খুল হিন্দ খুশি হয়ে তাঁকে দু'আ দিলেন।

শিক্ষকের দু'আ ছাত্রের কাজে লাগল। এক হলো দু'আ করা, এক হলো দু'আ নেওয়া। দুয়ের মাঝে পাথর্ক্য আছে। দু'আ করানো হলো, সন্তান বলবে, মা আমার জন্য দু'আ করো। বাবা আমার জন্য দু'আ করো। হযরত আমার জন্য দু'আ করুন। আর দু'আ নেওয়া হলো, মানুষ এমন ভালো এবং আদবওয়ালা হবে যে, তার ভালো দেখে তার বড়দের অন্তর থেকে দু'আ বের হয়ে আসবে।

আজকে দু'আ করানেওয়ালা অনেক হয়। কিন্তু দু'আ নেওয়ার মাসুষ হয় অল্প। হাদীছে এসেছে, তিনজন সাহাবী ছিলেন এবং সকলেই যুবক ছিলেন আর তাদের সবার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। একে অপরের উপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ইল্‌ম অর্জন করার ব্যাপারে অগ্রগামী ছিলেন। তাঁদের জযবা দেখে রাসূল সা. তাহাজ্জুদ নামাযে তাঁদের প্রত্যেকের নাম দিয়ে দু'আ করতেন। রাসূলের দু'আর বরকতে আল্লাহ তাঁদের তিনজনকে দুনিয়াতে বড় মর্যাদা দিয়েছেন। তাঁদের থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ফকীহ হয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) মুফাসসির হয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) মুহাদ্দিছ হয়েছেন।

হযরত মাওলানা গোলাম রাসূল শায়খুল হিন্দ-এর দু'আর বরকত পেয়েছেন। সুজাআবাদ থেকে তিন কিলোমিটার দূরে তার বাড়ি ছিল। তিনি একটি কিতাব লিখেছেন, যার নাম শরহে মেয়াতে আমেল। সম্ভবত কিছু আলেমের নিকট এ কিতাবটি পৌঁছেছে। ছাত্রগণ সুজাআবাদ বাস থেকে নেমে নিজের মালপত্র মাথায় নিয়ে তিন কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পুনটু যেতেন। তার নিকট ৩৫০ জন ছাত্র পড়তেন। তার দুজন ছাত্রের নাম ছিল আব্দুল্লাহ। একজন আব্দুল্লাহ দরখাস্তী (রহ.), যিনি হাফেজে হাদীছ ছিলেন। দ্বিতীয়জন মাওলানা আব্দুল্লাহ বাহলুয়ী (রহ.), যিনি সুজাআবাদের শায়েখ ছিলেন। তিনি হাজারো আলেমের শায়েখ ছিলেন। তার কুরআন বহুত প্রসিদ্ধ ছিল। হযরত মাওলানা গোলাম রাসূল একবার খায়রুল মাদারিসের বার্ষিক মাহফিলে গেলেন। সে সময় পাকিস্তানের বড়-বড় আলেমগণ উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ জালান্ধরী (রহ.) তাকে 'শামসুন নুহাত' উপাধিতে ডাকলেন। এতো আলেমের উপস্থিতিতে যাকে শামসুন নুহাত বলা হয়, তাঁর ইল্‌মের কী হবে? তিনি বললেন, দুনিয়া থেকে যদি শরহে জামী তুলে দেওয়া হয় আর কেউ যদি বলে, আমার শরহে জামী প্রয়োজন, আমি তাকে মূল কিতাব টীকাসহ লিখে দিতে পারব।

## খাজা আব্দুল্লাহ বাহলুবীর সোহবতের বরকত

আল্লাহ তা'আলা আলেমদের মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ বাহলুবীর ফয়েজ খুব বেশি প্রসার করেছেন। তিনি রমজান মাসে তাফসীর করতেন। তিনশত আলেম এর দ্বারা উপকৃত হতেন। তাঁর ইল্‌মের গভীরতার বরকত এই ছিল যে, তার নিকট একজন আলেম মুরীদ হলেন। তিনি বলেন, আমি হযরতের সাথে দেখা করার জন্য গিয়েছি। আমি কিছুক্ষণ তাঁর অনুমতি চাইলাম। হযরত বললেন, যদিও আপনি শিক্ষকতায় ব্যস্ত, তারপরও কিছুক্ষণ আপনার নিকট থাকব। আমার অন্তরে একথা এল, যখন আমার শায়েখ থাকার জন্য বললেন, তাহলে থেকে যাই। তারপর আমি বললাম, হযরত তিন দিন থাকবেন। শায়খ বললেন, বহুত ভালো। আমি তিন দিন তার সঙ্গে ছিলাম। তার বরকতে আমার অবস্থা এই হলো যে, ঘরে ফেরার পর তিন বছরে তাহাজ্জুদ কাজা হয়নি। অথচ এর পূর্বে ধারাবাহিক তিন দিনও তাহাজ্জুদ পড়তে পারতাম না।

## মেহনতের চাকা

দীনের জন্য মানুষের কষ্ট করা উচিত। পয়সা ব্যতীত কারো বরকত হয় না। কোনো বুযুর্গ ব্যক্তির জীবনী পড়ুন। যিনি যতটুকু কষ্ট করেছেন, আল্লাহ ততটুকু বরকত প্রসারিত করেছেন। যেমন– প্রসিদ্ধ আছে, যত পয়সা ঢালবে, ততটুকু মিষ্টি পাবে। এভাবে এপথে যত চেষ্টা করবে, নিজের আরাম-আয়েশ ঢনের জন্য যতখানি কুরবানি দিবে, ততটুকু ফল পাবে।

আল্লাহর দীনের জন্য আরাম-আয়েশ কুরবানি করা উচিত।

## আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ

আপনারা যারা এই পাহাড়ের ভিতর ইল্‌মের চেরাগ জ্বালিয়েছেন, এটি আল্লাহর বড় নেয়ামত। বরং অধম বলছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا

'তারপর আমি কিতাবের বংশধর বানিয়ে দিয়েছি নিজের বান্দাদের থেকে তাদেরকে যারা আমার মনোনীত ছিল।'[১]

হে আলেমগণ! এতে আমাদের কোনো গৌরব নেই। বরং গৌরব হলো, তিনি আমাদের মতো মানুষকে এ কাজ করার তাওফীক দান করেছেন।

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ৩২

منت منہ کہ خدمت سلطاں ہمی کنی

منت ازو شناس کہ در خدمت گذاشتت

'তুমি বাদশাহর প্রতি দয়া করছ না যে, তুমি বাদশাহর খেদমত কর। এটা তোমার উপর তার দয়া যে, তিনি তোমাকে তাঁর খেদমতের জন্য গ্রহণ করেছেন।'

আমাদের কর্তব্য হলো, আমরা তাঁর দয়া প্রকাশ করব আর পাশাপাশি নিজেদের কর্তব্যও আদায় করব।

## কল্যাণের ফয়সালা

আপনারা দীনের কাজ ইখলাসের সাথে করুন। প্রতিজন ছাত্রের উপর মেহনত করুন। দিনে তাকে পড়ান আর রাতে আল্লাহর নিকট চান। এটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত। আপনি যদি এমন করেন, তাহলে আল্লাহ ভালোর ফয়সালা করবেন। এটি আমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ম। এভাবেই তাদের ফয়েজ প্রসার লাভ করেছে।

## হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর দৃঢ়তা

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)কে দীনের জন্য বড় কুরবানি করতে হয়েছে। তাঁর জীবনীতে লেখা আছে, যখন হাকীম মুহাম্মদ আজমল-এর বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়, যারা তাঁকে গোসল দিয়েছে, তারা দেখেছে, তাঁর পিঠে বড়-বড় জখমের দাগ। তারা আত্মীয়-স্বজন ও ঘরের মানুষদের জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু কারো কিছু জানা ছিল না। সবাই পেরেশান ছিল। হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানি এ সময় কলকাতা ছিলেন। তাঁর নিকট শায়খুল হিন্দ-এর মৃত্যুর খবর পৌঁছলে তিনি জানাযায় উপস্থিত হলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, বলুন, এর কারণ কী?

হযরত মাদানির চোখে অশ্রু এসে গেল। তিনি বলতে লাগলেন, হযরত বলতে নিষেধ করেছেন যে, আমার জীবদ্দশায় কাউকে একথা বলবে না। এটি আমার কাছে তাঁর আমানত ছিল। আমি বলতে পারিনি। এখন তিনি ইন্তেকাল করেছেন। এখন বলতে পারব। যখন মাল্টায় তিনি বন্দি হলেন, ওই সময় হযরতকে এমন শাস্তি দেওয়া হয়েছিল যে, শরীরে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল। কয়েকবার এমন হয়েছে যে, ইংরেজরা জ্বলন্ত কয়লা বিছিয়ে হযরতকে তার উপর রাখত। জেলার বলত, মাহমুদ সাহেব! শুধু বলুন

ইংরেজদের বিরোধিতা করবেন না। এতটুকু বললেই আমরা আপনাকে ছেড়ে দেব। কিন্তু হযরত বললেন, এ আমি বলতে পারব না।

তারা হযরতকে বেশি কষ্ট দিয়েছে। তিনি যখন রাতে ঘুমানোর জন্য আসতেন, তখন শুতে পারতেন না। ঘুম না আসার কষ্ট এবং এ দিকের কষ্ট! আমরা হযরতের অবস্থা দেখে চিন্তিত হয়ে যেতাম। আমি একদিন কেঁদে বললাম, হযরত ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.) 'কিতাবুল হিয়াল' লিখেছেন। এমন কোনো ব্যবস্থা আছে কি যে, আপনি তাদের শাস্তি থেকে বেঁচে যাবেন?

হযরত বললেন, না। পরদিন হযরতকে শাস্তি দিল। ধারাবাহিকভাবে কয়েকদিন দেওয়ার পর একদিন এক ইংরেজ দাড়িয়ে বলল, তোমার কি হলো? কেন বলছ না, আমি ইংরেজদের বিরোধিতা করব না। হযরত বললেন, তার কারণ হলো, আমি আমার নামটা আল্লাহর দফতর থেকে কাটিয়ে তোমাদের দফতরে উঠাতে চাই না।

হযরত মাদানি (রহ.) বলেন, একবার হযরত এলেন। আমরা দেখলাম, হযরতকে কষ্টদায়ক শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আমরা হযরতের সাথে তিন-চারজন ছাত্র ছিলাম। আমরা বললাম, হযরত কিছু দয়া করুন। যখন হযরত দেখলেন, আমরা একত্র হয়ে কথা বলছি, তখন তার মুখে রাগ প্রকাশ পেল। তিনি বললেন, হুসাইন আহমাদ! তুমি আমাকে কী মনে করছ? আমি হযরত বেলাল ও সুমাইয়া (রাযি.)-এর রূহানি সন্তান। আমি রূহানি সন্তান হযরত খুবাইবের। আমি রূহানি সন্তান ইমাম মালিক (রহ.)-এর, যার মুখে ময়লা মেখে মদীনায় ঘোরানো হয়েছে। আমি রূহানি সন্তান ইমাম আবুহানীফা (রহ.)-এর, যাঁর লাশ জেল থেকে বের হয়েছে। আমি রূহানি সন্তান ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর, যাকে এতো চাবুকাঘাত করেছে যে, যদি হাতিকে মারা হতো, তাহলে সে চিৎকার দিতে থাকত। আমি রূহানি সন্তান মুজাদ্দিদে আলফেছানী রহ,-এর, যাঁকে দু-বছরের জন্য গুলিয়ার কিল্লার জেলখানায় রাখা হয়েছে। আমি রূহানি সন্তান শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবীর, যাঁর উভয় হাত কব্জির নিকট কেটে বিকল করে দেওয়া হয়েছে। হুসাইন আহমাদ! আমি কি ইংরেজদের কাছে নতি স্বীকার করে নেব? কখনও নয়। তারা আমার শরীর থেকে জান বের করতে পারবে, কিন্তু অন্তর থেকে ঈমান বের করতে পারবে না।

সুবহানাল্লাহ! যখন এমন দৃঢ়তা হয়েছে, তখনই আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ শুরু করেছেন। আল্লাহ আমাদেরও দৃঢ়তা এবং ইখলাসের সাথে ঢনের কাজ করার তাওফীক নসিব করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

# ইল্‌ম ও আলেম সমাজের মর্যাদা

'ইল্‌ম অর্জন করার জযবা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্বভাবগতভাবেই বিদ্যমান যেভাবে প্রত্যেক মানুষের জন্মগতভাবে ক্ষুধা লাগে, পিপাসা লাগে, নিদ্রা আসে। কেননা এগুলো তার শরীরের প্রয়োজন। এভাবে ইল্‌ম শিক্ষার জযবাও প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে দেওয়া হয়েছে। তার উদাহরণ হলো, যদি আপনি ভ্রমণ করেন এবং পথে কোনো মানুষের ভিড় দেখেন, তখন সবাই প্রশ্ন করে, ভাই! এখানে কী হয়েছে? দেখুন, অন্তরে একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছে যে, এখানে কী হয়েছে। এটি ইল্‌ম অর্জনের আর্কষণ। অনুরূপ কিছু মানুষের পত্রিকা পড়ার অভ্যাস আছে। সকালে উঠেই একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে, কোনো নতুন খবর আছে? এটিও ইল্‌ম অর্জনের আকর্ষণ।'

# ইল্‌ম ও আলেম সমাজের মর্যাদা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. وقال تعالى فى مقام اخر: وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

## কুদরতের কীর্তি

মানুষ আল্লাহর কুদরতের অপূর্ব কীর্তি। তারা দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি। এছাড়া তারা তাঁর গুণাবলির বহিপ্রকাশ। সারাটা জগত আল্লাহ মানুষের জন্য বানিয়েছেন আর মানুষকে বানিয়েছেন নিজের জন্য। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ

'দুনিয়া তোমাদের জন্য আর তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে পরকালের জন্য।'

কবি বলেন,

کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے

چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے

ফসলে ভরা মাঠ তোমার খাদ্যের জন্য,

চন্দ্র-সূর্য-তারকা তোমায় আলো দেয়ার জন্য।

بحر و بر شمس و قمر ماہ و ثما کے واسطے

یہ جہاں ترے لئے ہے تو خدا کے واسطے

জল ও স্থল, সূর্য-চন্দ্র সব তোমার-আমার জন্য,

এ পৃথিবী তোমার জন্য, তুমি খোদার জন্য।

সমস্ত পৃথিবী আল্লাহ আমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আর আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাতের জন্য।

## জীবনের উদ্দেশ্য

আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পরকালের প্রস্তুতির জন্য পাঠিয়েছেন। যদি আল্লাহ চাইতেন, তাহলে রূহজগতেই বান্দাদের ওলী বানিয়ে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ বেলায়াত অর্জন করার জন্য মানুষকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন, যাতে এখানে কষ্ট করে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে।

## বেলায়াতের স্তরসমূহ

বেলায়াতের দুটি স্তর আছে। এক. সাধারণ বেলায়াত। অর্থাৎ যে কালিমা পড়েছে, সে সাধারণ বেলায়াত অর্জন করে ফেলেছে। আল্লাহ বলেন,

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

'আল্লাহ ঈমানদারদের বন্ধু।'[১]

দুই. বিশেষ বেলায়াত, যা অর্জন করার জন্য মানুষকে আল্লাহভীরু ও পরহেযগার হতে হয়। আল্লাহ বলেন,

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

'জেনে নাও, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং কোনো চিন্তাও নেই।'[২]

খাওফ বলে বাইরের ভয়কে আর হুযন বলে ভিতরের চিন্তাকে। তাদের বাইরের ও ভিতরের কোনো ভয় বা চিন্তা নেই।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ

'তারা ওই সকল মানুষ, যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অর্জন করে।'[৩]

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ

'তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ দুনিয়াতেও, আখেরাতেও।'[৪]

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ২৫৭
২. সূরা ইউনুস : আয়াত ৬২
৩. সূরা ইউনুস : আয়াত ৬৩
৪. সূরা ইউনুস: আয়াত ৬৪

## ইল্‌ম ও আমলের সৌভাগ্য

প্রশ্ন জাগে, মানুষ তাকওয়া কিভাবে অর্জন করবে? এর জন্য সর্বপ্রথম ইল্‌ম শিক্ষা করা দরকার। দ্বিতীয়ত, তার উপর আমল করা। উভয়টি আল্লাহর নেয়ামত। দুনিয়ার সৌভাগ্যের চাবিকাঠি ইল্‌ম ও আমলের মধ্যে নিহিত। কুরআনের যেস্থানে ওই সমস্ত মানুষের আলোচনা করা হয়েছে, যাদের উপর আল্লাহ বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেছেন, সেখানে তারা কোন প্রকারের মানুষ তা-ও বলে দিয়েছেন,

مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

'তারা হলো নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককার।'[১]

ইল্‌মের সাথে এই চার প্রকারের প্রথম দুই প্রকারের সম্পর্ক বেশি। কেননা, নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে খবর নিয়ে আসেন। সত্যবাদী তাঁরা, যাঁরা নবীদের স্বীকার করে এবং বিশ্বাস করে। তাঁদের সাথে ইল্‌মের সম্পর্ক বেশি। এর দ্বারা জানা গেল, দুনিয়ার সৌভাগ্য ইল্‌ম-আমলের মধ্যে নিহিত।

## ইল্‌ম অর্জনের স্বভাবজাত চেতনা

ইল্‌ম অর্জন করার জযবা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্বভাবগতভাবেই বিদ্যমান যেভাবে প্রত্যেক মানুষের জন্মগতভাবে ক্ষুধা লাগে, পিপাসা লাগে, নিদ্রা আসে। কেননা এগুলো তার শরীরের প্রয়োজন। এভাবে ইল্‌ম শিক্ষার জযবাও প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে দেওয়া হয়েছে। তার উদাহরণ হলো, যদি আপনি ভ্রমণ করেন এবং পথে কোনো মানুষের ভিড় দেখেন, তখন সবাই প্রশ্ন করে, ভাই! এখানে কী হয়েছে? দেখুন, অন্তরে একটা আকর্ষণ তৈরি হয়েছে যে, এখানে কী হয়েছে। এটি ইল্‌ম অর্জনের আর্কষণ। অনুরূপ কিছু মানুষের পত্রিকা পড়ার অভ্যাস আছে। সকালে উঠেই একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করে, কোনো নতুন খবর আছে? এটিও ইল্‌ম অর্জনের আকর্ষণ।

## অঙ্গের প্রকারসমূহ

মানুষের শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ রয়েছে। এই অঙ্গগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. কিছু আছে ইল্‌মের অঙ্গ, যার দ্বারা মানুষ ইল্‌ম অর্জন করে। যেমন– চোখ, কান, দেমাগ। এগুলো ইল্‌ম অর্জনের মাধ্যম।

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ৬৯

২. কিছু আছে আমলের অঙ্গ। যেমন– হাত, পা দেমাগের কর্মকাণ্ড অনুযায়ী আমল করে।

৩. কিছু আছে মালের অঙ্গ। এগুলো কিছু বস্তুর ভাণ্ডার হয়। যেমন– মানুষের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলি ইত্যাদি।

আল্লাহর বন্টন দেখুন। হাত, পা, যাকে শ্রমিক অঙ্গ বলা হয়, তাকে সবচেয়ে নিচে রেখেছেন। যেগুলো সম্পদ অঙ্গ সেগুলো মাঝখানে রেখেছেন। আর ইল্‌মের অঙ্গগুলোকে রেখেছেন সবচেয়ে উপরে। মানুষের শরীরের মধ্যে ইল্‌মের স্থান সবচেয়ে উপরে রাখা হয়েছে। তারপর সম্পদের অঙ্গ। তারপর শ্রমের অঙ্গ। দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইল্‌ম অর্জনের অঙ্গগুলোকে সম্মান দিয়েছেন। ইল্‌ম অর্জনের অঙ্গ যদি সম্মান পায়, তাহলে যে মানুষ আলেম হবে, আল্লাহ তাঁকে কী পরিমাণ সম্মান দান করবেন?

## তালিবুল ইল্‌মের ফযীলত

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহ.) বলেন, নিয়ত যদি সঠিক হয়, তাহলে তালিবে ইল্‌ম থেকে উত্তম কেউ নেই। হাদীছে এসেছে-

مَنْ كَانَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَتِ الْجَنَّةُ فِي طَلَبِهِ

'যে বান্দা ইল্‌মের খোঁজে আত্মনিয়োগ করে, জান্নাত তাকে খুঁজে বেড়ায়।'

আরেক হাদীছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

'যেব্যক্তি ইল্‌ম অর্জনের জন্য বের হলো, ফিরে আশা পর্যন্ত সে আল্লাহর রাস্তায় থাকে।'

এই হাদীছ দ্বারা জানা যায়, যেভাবে মুজাহিদ আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, রাস্তায় যে কষ্ট আসে এবং কষ্ট সহ্য করতে হয়, তাদেরকে সেই কষ্টের প্রতিদান দেওয়া হবে। এভাবে তালিবে ইল্‌ম যখন ইল্‌ম অর্জন করার জন্য ঘর থেকে বের হয়, ফিরে আসা পর্যন্ত তার প্রত্যেক সেকেন্ড আল্লাহর রাস্তায় গণনা করা হয়। যে ঘরের আরাম ছেড়ে কষ্ট করে, তার প্রতিদান সে পাবে।

## আলেমের মর্যাদা

এক হাদীছে বর্ণিত আছে, আল্লাহপাক যখন কোনো সাধারণ মানুষের উপর খুশি হন, তখন তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করেন। পক্ষান্তরে

যখন কোনো আলেমের উপর খুশি হন, তখন তার জন্য জান্নাতে শহর বানিয়ে দেন। যেমন– দুনিয়াতে বিত্তবানদের নিজেদের সর্দারী ও রাজত্ব থাকে, ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহপাক রাব্বুল আলামীন ওলামায়ে কেরামকে জান্নাতে সম্মানে ভূষিত করেন। আল্লাহ তা'আলা ইল্‌ম অর্জনকারীদের বড় শান ও মর্যাদা দান করেছেন। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, যদি উলামায়ে কেরাম না থাকতেন, তাহলে মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মতো জীবন যাপন করত। হাদীছ শরীফে এসেছে–

اَلْعِلْمُ نُوْرٌ

'ইল্‌ম হলো আলো।'

কেমন যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম العلم نور বলে অজ্ঞতার প্রতি ঘৃণার কথা প্রকাশ করেছেন। সর্বপ্রথম যখন ওহি অবতীর্ণ হলো, তার প্রথম শব্দটি ছিল اِقْرَءْ অর্থাৎ 'পড়ো'। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতের প্রতি প্রথম যে পয়গাম এসেছে, তাতে পড়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

ইরশাদ হচ্ছে–

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

'আপনি পড়ুন, আল্লাহ পাক আপনাকে সম্মানিত করবেন।'[১]

এর দ্বারা ইল্‌মের গুরুত্ব বোঝা যায়।

## জাগতিক শিক্ষা ও দ্বীনি শিক্ষা

এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জরুরি হলো, সে যেন ইল্‌মে দীন শিক্ষা করে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, এক হলো জাগতিক ইল্‌ম, যা স্কুল-কলেজে শিখানো হয়। তা মানুষের দুনিয়াতে ভালোভাবে চলার উপায় হয়। তার দ্বারা মানুষ কাজ করার ভালো স্থান পায়, ভালো টাকা পায়। মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য করে। দুনিয়ার কষ্ট দূর করার জন্য সম্পদ অর্জন করে। জাগতিক শিক্ষা মানুষের প্রয়োজন আছে। তার বিপরীতে ইল্‌মে দীনের মূল উদ্দেশ্য হলো, আমরা ইল্‌ম অর্জন করে আল্লাহর পরিচয় লাভ করব। কেননা, ইল্‌ম ছাড়া আল্লাহকে ভালোভাবে জানা যায় না। এজন্য তার গুরুত্ব বেশি। এজন্য পুরুষ-নারী উভয়কে দীন শিক্ষার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

---

১. সূরা আলাক : আয়াত ৩

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

'দীনি ইল্‌ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ।'

তা শিক্ষা করার জন্য বয়সের কোনো সময়সীমা বর্ণনা করা হয়নি। বলা হয়নি, কৈশোর বা যৌবন বয়সে দীন শিক্ষা করে নাও। বরং বলা হয়েছে-

اُطْلُبُوْا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى اللَّحْدِ

'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত দীন শেখো।'

এজন্য মানুষ পুরো জীবন ছাত্র হয়ে থাকবে। এজন্য আমরা সারা জীবন ইল্‌ম শিক্ষা করব আর উন্নতির শিখরে পৌঁছতে থাকব।

## ইল্‌ম অনুযায়ী আমল

এসব হাদীস নয় ১/৮০

ইল্‌ম ও আমলের দ্বারা মানুষ আল্লাহর পরিচয় লাভ করে। শুরুতে কুরআন শরীফের দুটি আয়াত পড়া হয়েছে। প্রথম আয়াত দ্বারা জানা যায়, ইল্‌মওয়ালা ব্যক্তি সম্মান পাবে। দ্বিতীয় আয়াত দ্বারা জানা যায়, আমলদার ব্যক্তি সম্মান পাবে। ইল্‌ম ও আমলের মাঝে ওই সম্পর্ক, যার কারণে বান্দা সম্মান পায়। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ ইল্‌মওয়ালাদের সম্মান করবেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, যে যতটুকু আমল করবে, সে ততটুকু সম্মান পাবে। প্রকৃতভাবে উভয়টি এমন, যার দ্বারা মানুষের সম্মান বৃদ্ধি পায়। মানুষ আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে। এজন্য আমাদের ইল্‌ম অর্জন করা উচিত এবং তার উপর আমল করা উচিত। ইল্‌ম ব্যতীত আমল হয় না এবং আমল ব্যতীত ইল্‌ম বেকার।

## পৃথিবী ও ইল্‌মের সূর্য

আল্লাহর নিকট ইল্‌মওয়ালা ব্যক্তির সম্মান অনেক। হাদীছে এসেছে, ইল্‌ম একটি আলো। একথা অন্তরে গেঁথে নিন যে, ইল্‌মের আলো সূর্যের আলো থেকে উত্তম। কেননা, সূর্য কিছুক্ষণের জন্য আলো দেয়; তারপর ডুবে যায়। শুধু দিনে আলো দেয়, রাত্রে আলো দেয় না। কিন্তু ইল্‌ম দিনে ও রাতে সমানভাবে আলো দেয়। আপনি দেখবেন, আলেমদের মাহফিল অধিক রাত পর্যন্ত হয়ে থাকে। হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.) যে সময় স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করছিলেন, ওই সময় তিনি রাত ১টায় মাহফিল শেষ করে দারুল উলূম ফিরতেন। কখনও ২টা বাজে আসতেন।

এজন্য ছাত্ররা দারুল উলূম দেওবন্দর দারোয়ানকে বলে রাখত, যখন হযরত এসে ওযু করে তাহাজ্জুদের জন্য মসজিদে যাবেন, তখন আমাদের

জাগিয়ে দিবেন। যখন হযরত সালাম ফেরাতেন, তখন ছাত্ররা হাদীছের কিতাব নিয়ে হযরতের পিছনে বসে থাকত। রাত দুটা বাজে হাদীছের ক্লাস হতো। ওই সময় ছাত্রদের মাঝে ইল্‌ম অর্জনের এতো আগ্রহ ছিল। হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.)-এর চেহারায় এমন নূর ছিল যে, তিনি যখন আওয়াবীন অথবা তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন, তখন তাঁর ছাত্ররা খুঁটি ও দেওয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে হযরতের চেহারা দেখতে থাকত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর চেহারায় নূরের বৃষ্টি দান করেছেন।

## আবেদের ওপর আলেমের ফযীলত

হাদীছে বর্ণিত আছে, নবীজি ইরশাদ করেন,

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلٰى أَدْنَاكُمْ

'আলেমের সম্মান আবেদের উপর এ রকম যে, তোমাদের সাধারণের উপর আমার সম্মান।'

مَجْلِسُ فَقِيْهٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً

'একজন ফকীহর মজলিস ৬০ বৎসর ইবাদাত থেকে উত্তম।'

ইল্‌মের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা হাজার রাকাত নফল পড়া থেকে উত্তম। যেমন– তায়াম্মুম করার মাসআলা শেখা হাজার রাকাত নফল পড়ার চেয়ে উত্তম।

## জান্নাতেও আলেমগণের নেতৃত্ব

একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, দুনিয়া ও আখেরাতের সর্দারী ইল্‌মওয়ালাদের হবে। কান্‌যুল উম্মালের চতুর্থ খণ্ডে হযরত জাবের (রাযি.) থেকে বর্ণিত আছে, যখন মানুষ জান্নাতে যাবে এবং জান্নাত উপভোগ করতে দীর্ঘ সময় চলে যাবে, তখন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন, হে আমার বান্দারা! তোমাদের কোনো বস্তুর প্রয়োজন আছে কি? তারা বলবে, হে আল্লাহ! প্রত্যেক বস্তুর উপস্থিতিতে আমরা আরামের জীবন কাটাচ্ছি। আল্লাহ বলবেন, ভালো কথা। তোমরা আলেমদের জিজ্ঞাসা করো। তারা আলেমদের প্রতি মনোনিবেশ করবে এবং বলবে, আল্লাহ একথা জিজ্ঞেস করেছেন। এখন আপনারা বলুন, আমাদের চাওয়ার মতো আরও কিছু আছে কিনা। আলেমগণ বলবে, হাঁ; আল্লাহ ওয়াদা করেছেন,

وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ

'আমার কাছে আরও আছে।'[১]

আল্লাহর দিদার হবে। এখন পর্যন্ত তো জান্নাতের নেয়ামত পেলাম। কিন্তু আল্লাহকে দেখা হয়নি। আলেমদের উত্তর শুনে জান্নাতিরা আর্জি পেশ করবে। তারপর আল্লাহ জান্নাতীদের নিজের দিদার দান করবেন।

## আলেমগণের ঘুমও ইবাদাত

হাদীসের নামে জালিয়াতি
৩৩৮ পৃষ্ঠা

এক হাদীছে এসেছে-

نَوْمُ الْعُلَمَاءِ عِبَادَةٌ

'আলেমদের ঘুমও ইবাদাত।'

আলেমদের ঘুমও ইবাদাত! একটি উদাহরণ দ্বারা বোঝা সহজ হবে। আপনি যদি কোনো কাঠুরিয়াকে কাজ করার জন্য ঘরে আনেন; সে কাঠ কাটল এবং কাজ শুরু করল। এর মাঝে তার অলসতা এল। ফলে সে কিছুক্ষণ বসে অলসতা দূর করে শরীরে শক্তি জোগাল। সে যে সময়টুকু বসে থাকে, ওই সময়টুকুও তার মজুরির শামিল হয়। দুনিয়ার কেউ তার মুজরি কাটে না।

যেভাবে দুনিয়াতে কোনো মজুরকে তার অলসতা দূর বা কুড়াল ঠিক করার সময়কার মজুরি দেওয়া হয়, এভাবে ইল্‌মওয়ালারা যখন কাজ করেন, আল্লাহ তাদের ওই সময়ের প্রতিদান দেন। যখন তাদের শরীর স্থির হয়ে যায় এবং তারা বিশ্রাম করে, তখন আল্লাহ বিশ্রামের সময়টা পারিশ্রমিকের হিসাবে ধরেন। সুবহানাল্লাহ! জাগ্রত অবস্থায় তাদের প্রতিদান দেওয়া হয়। আল্লাহর কি রকম মেহেরবানি যে, তারা শুয়ে যাওয়ার পরও প্রতিদান পায়। এখানে চিন্তার বিষয় যে, আলেমগণ ঘুমের সময়টুকুর প্রতিদান পায়, তাহলে জাগরণের সময়ের কী পরিমাণ প্রতিদান পাবে।

এসব হাদীস নয় ২/৬২ পৃষ্ঠা

## শহীদের ওপর আলেমগণের ফযীলত

হাদীসের নামে জালিয়াতি ৩৩৭

হাদীছে এসেছে, কেয়ামতের দিন আলেমদের কালি শহীদগণের রক্তের থেকেও বেশি মর্যাদা পাবে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, একদিকে শহীদের রক্ত অন্যদিকে আলেমদের কালি। ভাসা-ভাসা জ্ঞানে একথাটি বোঝা কঠিন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর মাঝে অনেক সূক্ষ্ম কথা আছে। আলেমের উপমা এমন,

---

১. সূরা কা-ফ : আয়াত ৩৫

যেমন বাদশাহ এর ছেলে হওয়া আর শহীদের উপমা যেমন বাদশাহর সৈনিক হওয়া। প্রত্যেকে জানে, শাহজাদার সম্মান সৈনিকের উপর অর্জন হয়। আলেমরা নবীদের বংশধর এবং শহীদ নবীদের সৈনিক ও খাদেম, যারা দীনের হেফাযত করার জন্য নিজের জান কুরবানি দেন। পরিষ্কার কথা যে, বংশধরের সম্মান খাদেমের উপর নির্ভরশীল।

আলেমগণ দ্বিতীয় সূক্ষ্ম কথা বর্ণনা করেন যে, শহীদ যখন শহীদ হয়, সে তাঁর নিজের রক্ত দিয়ে যমীনকে সৌন্দর্য দান করে। কিন্তু আলেম যখন ইল্‌ম ছাড়ায়, তখন তার ইল্‌ম দ্বারা মানুষ সৌন্দর্য পায়। কেননা, যদি মানুষের ইল্‌ম না হয়, তাহলে জানোয়ার হয় বরং জানোয়ারের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়।

তৃতীয় সূক্ষ্ম কথা এই যে, শহীদ যখন শহীদ হয়, তার পূর্বে সে কারো সাথে লড়াই করে। লড়াইয়ের কারণে তাঁর প্রতিপক্ষ হত্যার শিকার হয়। তার প্রতিজ্ঞা থাকে, আমি কাফেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেব। কিন্তু কাফের তার উপর সফলকাম হয়ে তাকে শহীদ করে দিল। কিন্তু আলেম নিজে জীবিত থাকেন এবং যাকে ইল্‌ম দেন, তাকে জীবিত করার চেষ্টা করেন। বলা হয়েছে, اَلنَّاسُ مَوْتٰى মানুষ মৃত আর اَهْلُ الْعِلْمِ اَحْيَاءٌ কিন্তু ইল্‌মওয়ালারা জীবিত।

চতুর্থ সূক্ষ্ম কথা হলো, শহীদ যখন শহীদ হন, নিজে জান্নাতে চলে যান। যে তাকে শহীদ করে সে জাহান্নামী হয়। কিন্তু আলেম তার বিপরীত। আলেম যে ইল্‌ম শিক্ষা দেন, তার বিনিময়ে তিনি নিজে জান্নাতে যান। যে ছাত্রদের তিনি পড়িয়েছে, তাদেরও সাথে করে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। হাদীছে এসেছে, কেয়ামতের দিন একজন আলেম ও শহীদ পোলসেরাতের উপর দিয়ে যাবেন। ওই সকল শহীদকে বলা হবে, তোমরা জান্নাতে যাও, তোমার ঘর তোমার জন্য অপেক্ষমাণ। কিন্তু যখন আলেম যাবেন, তাকে বলা হবে,

قِفْ هٰهُنَا وَاشْفَعْ لِمَنْ شِئْتَ

'এখানে দাঁড়াও এবং যার জন্য ইচ্ছা সুপারিশ করো।

হাদীছে এসেছে

فَقَامَ مَقَامَ الْاَنْبِيَاءِ

তখন তিনি নবীদের স্থানে দাঁড়াবেন।

## ইল্‌মি সুওয়ালের ফযিলত

যদি কোনো সুওয়ালকারী অক্ষম হয়ে রুটির জন্য সুওয়াল করে এবং ঘরের মহিলা নিজের খাদেম অথবা বাচ্চাকে রুটি দিয়ে বলল, যাও; ওই

সুওয়ালকারীকে দিয়ে আসো, হাদীছে এসেছে, ওই রুটি সদকা করার কারণে আল্লাহ তিনজনকে ক্ষমা করে দেন।

১. যে কষ্ট করে পিষে আটা বের করে।

২. যে মহিলা সেই আটা দ্বারা রুটি বানায়।

৩. ওই খাদেম বা বাচ্চা, যারা ওই রুটি সুওয়ালকারী পর্যন্ত পৌঁছায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার রহমত কত বড়, যিনি প্রতিদানের মাঝে খাদেমকেও শরীক করেন।

একধরনের প্রশ্ন ইল্‌ম শিক্ষার জন্য হয়ে থাকে। হাদীছে এসেছে-

شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ

'মূর্খতার ওষুধ হলো প্রশ্ন করা।

অন্য বর্ণনায় আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ

প্রশ্নের সৌন্দর্য করা অর্ধেক ইল্‌ম।

কুরআন শরীফে আদেশ করা হয়েছে–

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

'যদি তোমরা না জান তাহলে আলেমদের জিজ্ঞাসা করো।'[১]

শরীয়তের ইল্‌ম অর্জনের জন্য জিজ্ঞাসা করা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কাজ। তবে কাউকে ছোট বা খাট করার জন্য প্রশ্ন না করা চাই। এরকম প্রশ্ন করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَآءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.

'তোমরা এমনসব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করো না; যদি তা প্রকাশ করা হয়, তাহলে তোমাদের কাছে তা খারাপ লাগবে।'[২]

অতএব অনর্থক বা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

হযরত আলী (রাযি.) বলেন–

اَلْعِلْمُ خَزَائِنُ فَسْئَلُوْا يَرْحَمُكُمُ اللهُ فَاِنَّهُ يُؤْجَرُ فِيْهِ اَرْبَعَةٌ.

---

১. সূরা নাহল : আয়াত ৪৪

২. সূরা মায়েদা : আয়াত ১০১

ইল্‌ম হলো ভাণ্ডার। অতএব, তোমরা জিজ্ঞাসা করো; আল্লাহ তোমাদের উপর রহম করবেন। একাজে চার প্রকার বান্দাকে প্রতিদান দেওয়া হয়।

اَلسَّائِلُ وَالْمُعَلِّمُ وَالسَّامِعُ وَالْمُحِبُّ لَهُمْ

১. যিনি প্রশ্ন করেন।

২. যিনি প্রশ্নের উত্তর দেন।

৩. যিনি পাশে বসে প্রশ্ন ও উত্তর শুনেন।

৪. যিনি প্রশ্নকারী ও উত্তরদাতাকে ভালোবাসেন এবং তাদের সাহায্য করেন।

আল্লাহ এই চার প্রকারের সবাইকে ক্ষমা করে দিবেন।

রুটি চাওয়ার কারণে তিন বান্দাকে ক্ষমা এবং ইল্‌মের প্রশ্ন করার কারণে চার বান্দাকে ক্ষমার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

## ইল্‌ম অর্জনের জন্য মুজাহাদা জরুরি

আমাদের উচিত ইল্‌ম অর্জনের জন্য তন, মন ও ধনের বাজি লাগানো। স্মরণ রাখবে, সত্যিকার ছাত্র সে-ই হয়ে থাকে, যে মাদরাসাকে নিজের বাসস্থান মনে করে এবং কিতাবের কাগজকে নিজের কাফন মনে করে। দিন-রাত এই চিন্তা করে যে, আমি অল্প সময়ের মধ্যে বেশি-বেশি উপকার কিভাবে অর্জন করব।

# পূর্বসূরীদের ইল্‌মি নিমগ্নতা

## ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ইল্‌মি নিমগ্নতা

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ওস্তাদ ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর নিকট যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি রাতে ঈশার পর বাতির সামনে কিতাব খুললেন। তার থেকে কিছু পড়লেন। তারপর বাতি জ্বালিয়ে কিতাব দেখলেন। তারপর শুয়ে গেলেন। আমি পুরো রাত জাগ্রত ছিলাম এবং আমি গণনা করেছি, এক রাতে ১৭ বার উঠে বাতি জ্বালালেন। ১৭ বার মানে কী। যদি ৮ ঘন্টার রাত হয়, তাহলে প্রত্যেক আধা ঘন্টা পর বাতি জ্বালালেন। প্রশ্ন হলো, তিনি ঘুমালেন কোথায়? আসল কথা হলো, তিনি এজন্য চেরাগ বন্ধ করতেন, যেন অযথা তেল না জ্বলে এবং অপচয় না হয়। যখন তিনি শুতেন, ঘুমাতেন না; বরং তিনি চিন্তা-ফিকির করতেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, সকাল বেলায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি রাতে ১৭ বার উঠেছেন। আপনি কত সময় ঘুমালেন? ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) উত্তর দিলেন, আমি রাতে ঘুমাইনি। এ রাতে আমি ১০০০ হাজার মাসআলা বের করেছি। আল্লাহু আকবার! ইল্‌ম অর্জন করার বাসনা এমন হওয়া চাই যে, মানুষ ঘুম থেকে বেশি ইল্‌ম অর্জন করবে। মানুষ অধ্যয়নের মাঝে ডুবে যাবে।

## ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর অধ্যয়নে নিমগ্নতা

ইমাম মুসলিম (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। তিনি একবার কোনো একটি হাদীছ খোঁজ করছিলেন। ওই সময় তাঁর ক্ষুধা লাগল। সাথে খেজুরের একটি থলে ছিল। তিনি একটি খেজুর মুখে দিতেন এবং কিতাব অধ্যয়নে মগ্ন ছিলেন। ওই সময় অধ্যয়নে এতো গভীরতা ছিল যে, খবর ছিল না, তিনি কতগুলো খেজুর খেয়েছেন। বেশি খাওয়ার কারণে অসুস্থ হয়ে গেলেন এবং তাতেই আল্লাহর সাথে মিলিত হলেন।

## হযরত শাহ আব্দুল আযীযের ইল্‌মি নিমগ্নতা

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.)-এর জীবনের শেষ সময় ছিল। একবার তাঁর ছেলে শাহ আবদুল আযীয (রহ.) কুরআন শরীফের সবকে পানি চাইলেন। এক ছাত্র উঠে ঘরে গেল এবং বলল, শাহ সাহেব পানি চেয়েছেন। যখন শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবী (রহ.) শুনলেন, তখন তিনি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন, আফসোস! আমার বংশ থেকে ইল্‌মের নুর উঠে গেছে! স্ত্রী বলল, আপনি এত তাড়াতাড়ি ফয়সালা করবেন না। এখনই পরীক্ষা করে দেখা যাবে। তিনি গ্লাসে পানি ঢাললেন এবং তার সাথে সিরকা মিলিয়ে দিলেন। সিরকা গাঢ় হলে তাতে আশ্চর্য স্বাদ অনুভব হয়।

ওই ছাত্র সিরকা মিলানো পানি নিয়ে গেলে শাহ সাহেব তা-ই পান করে ফেললেন। যখন ক্লাস থেকে উঠলেন, তখন মা জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলে! তুমি পানি পান করেছ? তিনি বললেন, জি, পান করেছি। মা বললেন, ওই পানি কী রকম ছিল? তিনি বললেন, মা আমার জানা ছিল না, ওই পানি কী রকম ছিল। এবার মা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলবীকে বললেন, দেখুন, আব্দুল আযীযের পানির এতো কঠিন পিপাসা ছিল যে, পানির মধ্যে সিরকার স্বাদ পায়নি। এর দ্বারা জানা যায়, সে বেআদবীর কারণে পান করেনি। বরং নিজের প্রয়োজনে পান করেছে, যা শরয়ীভাবে জায়েয ছিল। নতুবা কুরআনের ক্লাস করতে পারত না। এজন্য আমাদের বংশ থেকে এখনও আদব উঠে যায়নি। একথা শুনে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) শান্তির নিশ্বাস নিলেন এবং দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আমার বংশে ইল্‌ম ও আদব সর্বদা বজায় রাখুন।

## বর্তমান ছাত্রদের অবস্থা

বর্তমানে যখন ছাত্ররা মুতালাআ করে, তখন তাদের অবস্থা কী হয়? তাদের অবস্থা এই যে, কিতাব তাদের সামনে এবং দিল-দেমাগ অন্য জায়গায়।

কবি বলেন,

کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے

ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے

কিতাব খুলে বসলেই চোখ অশ্রুশিক্ত হয়ে আসে,

প্রতিটি পাতায় তোমার মুখ ভেসে ওঠে।

তাদের কিতাবের পৃষ্ঠায় কারো চেহারা দেখা যায়। যেমন– কোনো মানুষ রাস্তায় চলতে অন্যদের সালাম করে।

এভাবে ছাত্ররা মুতালাআর সময় তাদের কিতাবের সাথে শব্দের সালাম করে চলে যায় এবং বলে এটা অধ্যয়ন হয়ে গেছে। যদি আমরা এভাবে অধ্যয়ন করি, তাহলে আমাদের উপর ইল্‌মের নূর কী মিলবে? অথচ উদ্দেশ্য হলো কিতাব থেকে ইল্‌ম অর্জন করা, তারপর সে অনুযায়ী নিজের জীবন অতিবাহিত করা। প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! একাগ্রতার সাথে ইল্‌ম অর্জন করা চাই। যখন জামাতে বস, তখন একাগ্রতার সাথে কথা শুনো। ক্লাসে শিক্ষক পড়ান। তারা শুধু চোখ খুলে থাকেন। চোখ খোলা থাকে এবং দেমাগ ঘুমিয়ে থাকে। বর্তমান যামানার ছাত্ররা শিক্ষককে বুঝতে দেয় না, তারা ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু সময় চলে যায়। প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা! প্রকৃতভাবে নফস ও শয়তান আমাদেরকে ইল্‌ম থেকে বঞ্চিত করতে চায়। সময়ের কদর করা চাই। স্মরণ রাখা উচিত, জীবনের এই সময়টুকু একবার চলে গেলে আর ফিরে আসবে না।

## উদ্দেশ্য একটিই

যখন এভাবে ডুবে কিতাব পড়বে, তাহলে ইল্‌ম ও মাআরেফ-এর মুতি সামনে আসবে এবং ইল্‌মের নূর মিলবে। এজন্য আমাদের উচিত, আমরা কষ্ট ও মজার সাথে ইল্‌ম অর্জন করব। সকাল-সন্ধ্যায় এটা চিন্তার বিষয় হবে। এদিক-সেদিকের খেয়ালকে অন্তরে কখনও আনবে না। একে বলে একক উদ্দেশ্য। মানুষের প্রত্যেক সময় নিজের উদ্দেশ্য চিন্তা করা উচিত যে, আমার ইল্‌ম অর্জন করতে হবে। শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরি (রহ.) নিজের জীবনীতে লিখেছেন, ছাত্রাবস্থায় যখন আত্মীয়-বন্ধুদের চিঠি আসত, আমি ভয়ে ওই চিঠি পড়তাম না। তা বক্সে রেখে দিতাম। ভাবতাম, যদি কোনো ভালো খবর হয়, তাহলে ঘরে যাওয়ার জন্য মন অস্থির হবে। আর যদি কোনো খারাপ খবর হয়, তাহলে পড়ায় দিল বসবে না। শেষ সময়ে যখন দারুল উলূমের পরীক্ষা শেষ করে অবসর হতাম, তখন সমস্ত চিঠি বের করে পড়তাম এবং সূচি বানাতাম। ভালো খবরের চিঠির পৃথক সূচি খারাপ খবরের চিঠির পৃথক সূচি বানাতাম। তারপর নিজের গ্রামে আসতাম। যাদের ভালো খবর, তাদের মুবারকবাদ দিতাম। যাদের খবর খারাপ, তাদের সামনে অনুতপ্ত হতাম এবং সমবেদনা জানাতাম। এভাবে মানুষ আমার উপর খুশি হয়ে যেত। তারা সারা বৎসর আমার কথা স্মরণ রাখত। তারা জানত, যে সময় তারা চিঠি পাঠিয়েছে আমি ওই সময় তা পড়েছি।

তাঁরা সারা দুনিয়াতে সম্মান পেয়েছেন। ইল্‌ম শিক্ষার মাঝে তাঁরা একাগ্রতা দেখিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের ছাত্ররা কিতাব ব্যতীত বাইরের কথা শোনার বেশি আশা রাখে। যখন তাকরার করার জন্য বসে, তখন কিছু কিতাবের কিছু বাইরের কথা বলে। কারণ, শয়তান তাদের ইল্‌ম অর্জন করা থেকে বিরত রাখছে।

## ওস্তাদের মূল্যায়ন

যেসব শিক্ষকের কাছ থেকে আপনি ইল্‌ম শিখছেন, আপনার জানা নেই, পরে তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ হবে কিনা। এই নেয়ামত তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করো, যাদের শিক্ষক ইন্তেকাল করেছেন। তারা নিজেদের মুরব্বীহীন মনে করে। হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) রেশমী রুমাল আন্দোলনের সময় ইচ্ছা করেছেন, এখন আমি মক্কা শরীফে যাচ্ছি। একদিন তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে চেয়ারে বসে মাটিতে পা রেখে কোনো কিতাব অধ্যয়ন করছিলেন। তখন তাঁর উপস্থিতিতে আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরি বুখারি শরীফ পড়াচ্ছিলেন। ওই সময় তাঁর দৃষ্টি শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর উপর পড়ল। যখন ক্লাস শেষ হলো, তখন তিনি ছাত্রদের বললেন, তোমরা বসো; আমি আসছি।

তিনি ক্লাস স্থগিত করে বাইরে এসে সোজা শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর নিকট এসে তাঁর পায়ের পাশে বসে গেলেন। তারপর শায়খুল হিন্দকে আরজ করলেন, হযরত আপনি প্রথমে এখানে ছিলেন; আমাদের প্রয়োজন হলে আমরা আপনার নিকটে আসতাম। আপনি হিজরতের ইচ্ছা করেছেন। আমরা তো মুরব্বীহীন হয়ে যাব। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী একথা বলছেন এবং কাঁদছেন। তিনি বাচ্চার মতো কাঁদছিলেন। শায়খুল হিন্দ (রহ.) কাশ্মিরি (রহ.)কে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, আনোয়ার শাহ! আমি ছিলাম; মানুষ আমার নিকট আসত। যখন আমি চলে যাব, তখন মানুষ তোমার কাছে ইল্‌ম শিক্ষার জন্য আসবে।

যখন আনোয়ার শাহ (রহ.) চলে গেলেন, তখন হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর মনে হলো, সে তো নিজের শিক্ষকদের দু'আর এতো কদর করেছে! আমি এতো বড় কাজের জন্য যাচ্ছি; কিন্তু আমার উপর ওস্তাদের স্নেহ নেই, যাদের দু'আ নিয়ে যাব। শায়খুল হিন্দ (রহ.) একথা ভাবতে-ভাবতে হযরত কাসেম নানুতবি (রহ.)-এর খেয়াল এল। তিনি উঠে সোজা হযরত নানুতবি (রহ.)-এর ঘরে গেলেন। দরজায় করাঘাত করলেন এবং

বাইরে দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিলেন, মা! আমি মাহমুদ হাসান। যদি হযরত নানুতবি (রহ.)-এর কোনো জুতা ঘরে পড়ে থাকে, তবে সেটি পাঠিয়ে দিন। মা নানুতবির এক জোড়া জুতা তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলেন।

শায়খুল হিন্দ (রহ.) নিজের শিক্ষকের জুতা তাঁর মাথায় রাখলেন এবং আল্লাহর নিকট দু'আ করলেন। হে আল্লাহ! আজকে আমার শিক্ষক নেই। আমি তাঁর জুতা মাথায় রাখলাম। হে আল্লাহ! এই সম্পর্কের কারণে আমাকে হেফাযত করুন এবং আমাকে আমার উদ্দেশ্যে সফলতা দান করুন।

ওস্তাদের মর্যাদা ওই সময় বুঝে আসে, যখন দেখার জন্য শুধু তাঁদের জুতা অবশিষ্ট থাকে।

## প্রকৃত ছাত্র হয়ে যান

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ.

'নিশ্চয় তাতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার আছে অন্তর আছে কিংবা যে শ্রবণ করে একাগ্রচিত্তে।'[১]

আল্লাহ আপনাদেরকে এই সুযোগ দান করেছেন যে, আপনারা শিক্ষকের সামনে বসে ইল্‌ম অর্জন করেন। কিন্তু শিক্ষকের সামনে বসে ইল্‌ম অর্জন করার জন্য কুরআন একটি মূলনীতি বলে দিয়েছে।

কখনও বুকের মধ্যে দিলের বদলে সিল থাকে, যার কারণে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না। কুরআনে মুলনীতি বলে দিয়েছে, কুরআনের উপদেশ গভীর একাগ্রতার সাথে শ্রবণ করতে হবে। যেন আল্লাহ বলে দিয়েছেন, কুরআনের কথায় ওই ব্যক্তির উপকার হয়, যার অন্তরে তলব ও একাগ্রতা থাকে। যদি আপনি ওস্তাদের সামনে এই খেয়াল রাখেন, তাহলে আল্লাহ আপনাকে ইল্‌মের নূর দান করবেন।

## আলেম ও সাধারণ লোকের তাওবার মাঝে পার্থক্য

হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলা এক আলেমের তাওবার কারণে চল্লিশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। সাধারণ মানুষ তাওবা করার কারণে শুধু একটা গুনাহ ক্ষমা করা হয়। মুহাদ্দিছগণ বলেন, সাধারণ মানুষ সৈনিকের মতো আর একজন আলেম অফিসারের মতো। একজন সৈনিক অসুস্থ হয়, একজন অফিসারও অসুস্থ হয়। কার সুস্থতা বেশি

---

১. সূরা ক্বাফ : আয়াত ৩৭

প্রয়োজন? অফিসারের সুস্থতা বেশি প্রয়োজন। কেননা, তিনি পূর্ণ বাহিনীকে পরিচালনা করেন এবং অফিসার ব্যতীত বাহিনী অকার্যকর। যেভাবে অফিসারের সুস্থতার বেশি প্রয়োজন, এভাবে যারা দীনের কাজ করেন, তাদের মাঝে অফিসার (আলেম) এর সুস্থতা বেশি প্রয়োজন। যেমন- খায়বর কেল্লার সময় হযরত আলী (রাযি.)-এর চোখে অসুখ হলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখের লালা মুবারক লাগিয়ে দিলেন। ফলে আল্লাহ তাঁকে সুস্থতা দান করলেন। তারপর তাঁর হাতে ঝান্ডা দিয়ে পাঠালেন এবং আল্লাহ বিজয় দান করলেন।

যখন সাধারণ মানুষ আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায়, তখন আল্লাহ তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। যখন একজন আলেম আল্লাহর নিকট ক্ষমা চান, আল্লাহ তার চল্লিশটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

## আল্লাহর প্রিয়

আপনাদের ভাগ্য ভালো যে, আল্লাহ আপনাদের কুরআন ও সুন্নাহর ইল্‌ম অর্জন করার তাওফীক দিয়েছেন। আপনারা আল্লাহর পছন্দনীয় ও প্রিয় বান্দা। আল্লাহ কুরআনে বলেছেন–

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا.

'অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম তাদেরকে, আমার বান্দাদের মধ্য হতে আমি যাদের নির্বাচন করেছি।'[১]

স্মরণ রাখা উচিত, আপনাদের উপর আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি রয়েছে। এখন আপনার নেওয়ার কাজ। চেষ্টা যত বেশি হবে, তত বেশি পাবেন। যে যত বেশি থলি নিয়ে আসবেন, সে তত বেশি পাবেন। তিনি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত; বড় দানশীল তিনি। আপনাদের চেষ্টা থালার মতো; আল্লাহর থালা পূর্ণ করে দিবেন এবং ইল্‌মের নূর দ্বারা আপনাদের পূর্ণ করে দিবেন।

## ইল্‌ম অনুযায়ী আমল গড়ে তুলুন

প্রথম কথা হলো, আপনারা ইল্‌ম অর্জন করুন; তার দ্বারা সম্মান পাবেন। আমি একটি আয়াত পড়েছি, যার সম্পর্ক আমলের সাথে ছিল। ইল্‌মকে আমলের ধাঁচে রাখা উচিত। অর্থাৎ যা পড়েন তা আমল করুন। যদি ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করেন, তাহলে ইল্‌ম সব সময় আপনাদের সিনায় থাকবে।

---

১. সূরা ফাতির : আয়াত ৩২

ইল্‌ম আমলের দরজায় কড়া নাড়ে। যদি খুলে যায়, তাহলে ভালো। অন্যথায় সবসময়ের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

## আকাবিরের ইল্‌ম অনুযায়ী আমল

আমাদের আকাবির উলামায়ে দেওবন্দ ইল্‌মের সূর্য ছিলেন। কিন্তু তাঁরা যে ইল্‌ম শিখেছেন, তার প্রত্যেকটি অংশের উপর আমল করেছেন। তাঁরা সুন্নাতে নববীর নমুনা ছিলেন। তাঁদের সুন্নাতের উপর আমল ও শরীয়তের উপর দৃঢ়তার আশ্চর্য ঘটনা কিতাবে লিখা আছে।

❖ ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ইংরেজরা আলেমদের গ্রেফতার শুরু করে। ওই সময় হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবি (রহ.)কে গ্রেফতার করার ওয়ারেন্ট জারি হলো। বন্ধুরা পরামর্শ করে হযরতকে একটা ঘরে লুকিয়ে রাখল। তিনি তিন দিন গোপন ছিলেন। তিন দিন পর সেখান থেকে বের হলেন। বন্ধুরা বলল, বাইরের অবস্থা ভালো নয়। বের হওয়া আপনার জন্য ক্ষতিকর হবে। কিন্তু তিনি বললেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জীবনে তিন দিন গারে ছাওরে লুকিয়ে ছিলেন। এ কারণে আমি চাই, এই সুন্নাতের উপরও আমার আমল হোক। সুবহানাল্লাহ!

❖ হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.)-এর সুন্নাতের উপর আমলের ঘটনা অগণিত। বিশেষভাবে তাঁর শেষ জীবনে রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের অবস্থা আশ্চর্যজনক। তাহাজ্জুদে সাধারণত দু-পারা কুরআন পড়তেন। কেরাতের মাঝে এতো খুশি ও ভয় প্রকাশ পেত যে, সিনা থেকে নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যেত। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে হাদীছে আছে, তিনি এভাবে নামায পড়তেন। হুজুরের ভিতর থেকে কান্নার কারণে হাড়ের জোশ মারার শব্দ শোনা যেত। হুসাইন আহমাদ মাদানি (রহ.)-এর নামাযের মাঝে এই সুন্নাতের অনুসরণ পাওয়া যায়। নামাযের পর তিনি ইসতিগফার ও দু'আ করতেন। এমনভাবে কাঁদতেন ও হেঁচকি মারতেন, যেন কোনো বাচ্চা কাদঁছে।

❖ হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (রহ.)-এর জীবনীতে লিখা আছে, একবার তিনি হজে গেলেন। ওই সময় আরবের সফর সাধারণত উটের পিঠে হতো। এই সফরে যেরকম বর্তমানে মুআল্লিম থাকেন, সে-সময় তাদের মুতাওয়াফ বলা হতো। তিনি মুতাওয়াফকে আগেই বলে রেখেছেন, আমি সুন্নত অনুযায়ী হজ আদায় করব। তুমি এমন কোনো নিয়ম করবে না, যা সুন্নত অনুযায়ী না হয়।

মিনায় অবস্থানরত অবস্থায় সুবহে সাদেকের আগে মুতাওয়াফ এল এবং চিৎকার করতে লাগল, তৈরি হও, আরাফাতের জন্য এখনই বের হব। উটওয়ালারা তাড়াহুড়া করতে লাগল। হযরত সাহারানপুরি (রহ.) দুটি তাঁবুর মাঝখানে তাহাজ্জুদ নামায পড়ছিলেন এবং কুরআন পড়ায় মগ্ন ছিলেন। দীর্ঘ কেরাত, পূর্ণ আরকান এবং ইতমিনানের সাথে নামায আদায় করে সালাম ফিরিয়ে মুতাওয়াফের দিকে ফিরে এবং রাগ হয়ে বললেন, তুমি তো ওয়াদা করেছ, সুন্নাতের বিপরীত কোনো কাজ করবে না। তাহলে সূর্যোদয়ের আগেই যাওয়ার জন্য কেন বললে। সে বলল, আমি কী করব, উটওয়ালা মানছিল না। যদি তারা উট নিয়ে চলে যায়, তাহলে হজ আদায় করা যাবে না। সে বলল, ফরজের কারণে সুন্নাত ছাড়া কোনো সমস্যা নেই। হযরত আরো বেশি রাগ করে বললেন, তোমাকে মুতাওয়াফ মেনেছি, কিন্তু পীর মানিনি। যাও নিজের কাজ করো। আমি সূর্যোদয় হওয়ার এক মিনিট আগেও উঠব না। আমরা নিজেদের মাল এবং সময় খরচ করে এতো কষ্ট করে সফর করে আসি, যাতে সুন্নাত অনুযায়ী হজ আদায় করি। তোমাদের উটওয়ালাদের গোলাম হতে আসি না। উটওয়ালারা নিজের উটের উপর অধিকার আছে, তা নিয়ে যাবে। আমাদের উপর তাদের কোনো অধিকার নেই যে, যাওয়ার জন্য তাগিদ দিবে। তুমি অসময় চিৎকার করে আমাদের পেরেশান করেছ। নামায ভালোভাবে পড়তে দাওনি। আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তুমি অন্য হাজীদেরকে নিয়ে চলে যাও। আমি অক্ষম নই। আরাফাতও দূরে নয়। আমি পায়ে হেঁটে যাব; তবু সুন্নাত ছাড়ব না।

এ আমাদের আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের শান ছিল। কোনো অবস্থায় সুন্নাত ছাড়বেন না। যখন অন্তরে এ জযবা হবে যে, আমরা যে ইল্‌ম অর্জন করি, তার উপর আমল করব, নিজের জীবনে সুন্নাত অনুযায়ী আমল করব, তাহলে আল্লাহ ইল্‌মের নূর আপনাদের সিনায় সবসময় দান করবেন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, যে আমলই করবেন, আল্লাহর খুশির জন্য করবেন। দুনিয়ায় প্রসিদ্ধ হওয়ার জন্য করবেন না। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য আমল করার তাওফীক দিন।

## এক বালিকার উপদেশ

স্মরণ রাখবেন, আলেমদের সর্তকতার জীবন অবলম্বন করা প্রয়োজন। হযরত হাসান বসরী (রহ.) বলেন, একবার এক ছোট বাচ্চী আমাকে উপদেশ দিল, যা আমি কখনও ভুলব না। কেউ জিজ্ঞাসা করল, হযরত কী উপদেশ? তিনি বললেন, একবার বৃষ্টির সময় ছিল। আমি নামায পড়ার জন্য

মসজিদে যাচ্ছিলাম। রাস্তা পিচ্ছিল ছিল। সামনে একটা ছোট বাচ্চী আসছিল। যাওয়ার সময় আমি ওকে বললাম, সাবধানে হাঁটো, যেন পিছলে না যাও। সে উত্তর দিল, হযরত! আমি সাবধান তো হব, কিন্তু আপনিও সাবধান হোন। আমি যদি পিছলে যাই, তাহলে শুধু আমার ক্ষতি হবে। কিন্তু যদি আপনি পিছলে যান, তাহলে উম্মতের কী হবে? আমার জন্য একথা একটি উপদেশ।

আপনারা দৃঢ়তার সাথে শরীয়ত ও সুন্নাতের উপর আমল করুন। আল্লাহ্ এই ইল্‌ম ও আমলের কল্যাণে দুনিয়া ও আখেরাতে আপনাদের ইজ্জত দান করবেন। আল্লাহ্ আপনাদের সবাইকে এখানে আসা ও ইল্‌ম অর্জনের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমাদের সবাইকে তাঁর পছন্দনীয় বান্দাদের মধ্যে শামিল করে নিন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

# ঈমানের মহত্ত্ব

'কালিমা পড়লে ঈমান আনা সম্পন্ন হয়ে যায় না। বরং ঈমানের আসল কার্যক্রম শুরু হয়। কালিমা পড়ার মাধ্যমে মানুষ ঈমানের গণ্ডিতে প্রবেশ করে। তারপর তাকে নেক আমলও করতে হয়। এতেই ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে। একেই বলে, 'মুখের কথায় স্বীকৃতি দেওয়া আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সত্যায়ন করা।'

মুখের ঈমান তো কালিমা পাঠ করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে যায়। তারপর বাকি থাকে অন্তরের ঈমান। অন্তরের ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে নেক আমলের মাধ্যমে। সুতরাং যিনি পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে চান, তাকে মুখে ঈমান আনার সাথে-সাথে নেক কাজও করতে হবে। তবেই তার ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করবে।'

# ঈমানের মহত্ত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ.

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

## ঈমানদারকে ঈমান আনার হুকুম

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

'হে ঈমানদাররা! তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি।'[১]

এই আয়াতে আল্লাহ ঈমানদারদের ঈমান আনার হুকুম করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই আয়াতে আল্লাহ সরাসরি ঈমানদারদের সম্বোধন করেছেন। কাফির, মুশরিক কিংবা মুনাফিকদের ঈমান আনতে বলেননি। ঈমানদারদের আবার ঈমান আনতে বলার অর্থ কী?

মুফাসসিরগণ লিখেছেন, এর অর্থ হলো তাকওয়া অর্জন করা। অথবা এর অর্থ হতে পারে মুখে ঈমান আনার সাথে-সাথে অন্তর দিয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা।

## মুখে স্বীকার ও অন্তরে বিশ্বাস

অন্তরে বিশ্বাসই হলো আসল। কবি বলেছেন-

تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا

لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی

'তুমি আরব হও কিংবা আজম হও, তোমার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থহীন যদি না অন্তরে সাক্ষ্য দাও।'

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ১৩৬

কালিমা পড়লে ঈমান আনা সম্পন্ন হয়ে যায় না। বরং ঈমানের আসল কার্যক্রম শুরু হয়। কালিমা পড়ার মাধ্যমে মানুষ ঈমানের গণ্ডিতে প্রবেশ করে। তারপর তাকে নেক আমলও করতে হয়। এতেই ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে।

আরবিতে একেই বলে,

إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْجِنَانِ

'মুখের কথায় স্বীকৃতি দেওয়া আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে সত্যায়ন করা।'

মুখের ঈমান তো কালিমা পাঠ করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে যায়। তারপর বাকি থাকে অন্তরের ঈমান। অন্তরের ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করে নেক আমলের মাধ্যমে। সুতরাং যিনি পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে চান, তাকে মুখে ঈমান আনার সাথে-সাথে নেক কাজও করতে হবে। তবেই তার ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

## সর্বক্ষেত্রে জয়ী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

কথা ও কাজের মধ্যে বিস্তর পাথর্ক্য রয়েছে। কোনো কিছুর বলার পর তা কাজে বাস্তবায়ন করার জন্য অনেক কিছু করতে হয়। এটি অবশ্যই কঠিন কাজ।

কবি ইকবাল নিজের সম্পর্কে অনুতাপ করে বলেছেন-

اقبال بڑا پدیشک ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے

گفتار کا یہ غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا

'ইকবাল কথায় বড়ই পটু, সে কথার গাজী; কিন্তু কাজের গাজী নয়।'

এই কবিতাটি বলার কারণ একথা বোঝানো যে, কথা ও কাজ সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। আল্লামা ইকবাল এই কবিতায় বর্তমান মুসলমানদের অবস্থা তুলে ধরেছেন।

مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے

من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا

'ঈমানদীপ্ত লোকেরা তো একরাতে মসজিদই বানিয়ে ফেলল। কিন্তু অন্তর আমার পুরাতন পাপী; বহু বছরেও প্রকৃত নামাযী হতে পারল না।'

## ঈমানের নিদর্শন

প্রকৃতপক্ষে ঈমানের নিদর্শন মানুষের আমলের দ্বারা অর্জিত হয়। আমলের দৃঢ়তা যত হয়, ঈমান ততই মজবুত হয়। আমলের দ্বারাই দীনের প্রচার-প্রসার সবচেয়ে বেশি হয়।

## ঈমানদারের মুআমালা এমনই হয়

আল্লাহর নবীর দুই সাহাবীর মাধ্যমে পুরো একটি দেশের মানুষ মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা ইন্দোনেশিয়া গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁরা ব্যবসা করতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় দোকান বন্ধ রাখতেন। তবু তাদের দোকানের সামনে সবসময় ভিড় লেগে থাকত। তাঁদের লেনদেন এতোই পরিচ্ছন্ন ছিল যে, মানুষ তাঁদের দোকান ছাড়া অন্য কোনো দোকানে যেত না। একদিন তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনাদের দোকান প্রায়ই বন্ধ থাকে। তবু মানুষ আপনাদের দোকানেই ভিড় করে। আপনাদের জন্য অপেক্ষা করে। অন্য দোকানে যায় না। রহস্যটা কী?

তাঁরা বললেন, আমাদের নবী আমাদেরকে এভাবেই ব্যবসা করতে শিখিয়েছেন। আমরা লেনদেন স্বচ্ছ রাখি। কাউকে ধোঁকা দেই না। একথা শুনে তারা মুসলমান হয়ে গেল এবং দুই সাহাবীর বরকতে পুরো দেশের অধিবাসীর সবাই মুসলমান হয়ে গেল। এখন তো হাজারো বক্তৃতা-ওয়ায শুনেও মানুষ ইসলামের পথে আসতে চায় না। অথচ সাহাবায়ে কেরামের ব্যবসা-বাণিজ্যের রীতি দেখে হাজার-হাজার মানুষ মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

## চিন্তা করে দেখুন

আমরা যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করি, তাদের একটু চিন্তা করা দরকার যে, আমাদের চোখ কি মুসলমান হয়েছে? যদি মুসলমান হয়, তাহলে আমার চোখ কখনও হারাম দৃষ্টিপাত করবে না। আর যদি করে ফেলে, তাহলে বুঝতে হবে, সে এখনো মুসলমান হয়নি। আমার জবান কি মুসলমান হয়েছে? যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমি এর দ্বারা গীবত বা মিথ্যা বলব না। যদি বলে ফেলি, তাহলে বুঝতে হবে, আমার জিহ্বা এখনও মুসলমান হয়নি। এভাবে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রতঙ্গের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার যে, এগুলো দ্বারা কোনো গুনাহ হচ্ছে কিনা? যদি হয়, তাহলে বুঝতে হবে, আমার অঙ্গ-প্রতঙ্গ এখনও পুরোপুরি মুসলমান হয়নি। তাহলে আমরা নিজেদেরকে কিভাবে মুসলমান দাবি করি?

خرد نے کہہ بھی دیا لاالہ تو کیا حاصل
دل و نگاہ مسلماں نہیں تو کچھ بھی نہیں

'বিবেক তো 'লা-ইলাহ' বলে দিল; তাতে কী?
হৃদয় ও দৃষ্টি যদি মুসলমান না হয়; তবে কিছুই হয়নি।'

## ঈমানের অবস্থান

ঈমানের স্থান হচ্ছে দিল বা অন্তর। ঈমান অনেক বড় সম্পদ। এমনকি ঈমান মানুষের প্রাণের চেয়েও মূল্যবান। আল্লাহর নিকট ঈমান এতই দামী যে, পৃথিবীর সকল মানুষ যদি কাফির হয়ে যায়, তবুও তারা কখনও একজন মুমিনের সমকক্ষ হতে পারবে না। কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তির ৯৯ টি গোনাহের খাতা হবে। এর মোকাবেলায় একজন ফেরেশতা ছোট একটি কাগজ নিয়ে নেকীর পাল্লায় রাখবেন। সাথে-সাথে নেকীর পাল্লা ঝুঁকে যাবে। তখন সেই ব্যক্তি অবাক হয়ে বলবে, আল্লাহ! এ কী? তখন আল্লাহ ইরশাদ করবেন, এ তোমার ঈমান। এই ঈমানের মোকাবেলায় যদি সমস্ত আসমান-যমীন রাখা হয়, তবুও ঈমানের পাল্লা-ই ভারী হবে। আমাদের একটি কথা ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, ঈমানই হলো আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মানুষ যখন তার ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন থাকে, তখনই তা হাতছাড়া হয়ে যায়। ঈমানের মূল্য না থাকার কারণেই আজ আমাদের ঈমান হারিয়ে যাচ্ছে।

## একটি হৃদয়গ্রাহী ঘটনা

শেখ সাদী (রহ.) তাঁর ছোটবেলার একটি ঘটনা লিখেছেন। তাঁর মা তাঁকে একবার স্বর্ণের আংটি বানিয়ে দিয়েছিলেন। সে আংটি পড়ে তিনি বাইরে গিয়েছিলেন। তখন এক ধান্দাবাজ লোক তাঁকে ডেকে মিষ্টি খেতে দিল। তারপর তাকে বলল, তোমার আংটিটা একটু চেটে দেখতে দিবে। তিনি চেটে দেখতে দিলেন। আংটির তো মিষ্টির মতো স্বাদ নেই। তখন ওই লোকটি বলল, তোমার এই স্বাদহীন বস্তুটি আমাকে দিয়ে দাও আর এই মিষ্টি তুমি নিয়ে নাও। এভাবে চতুর লোকটি তার থেকে দামী আংটিটা নিয়ে গেল।

## ঈমান ও মুশাহাদার পার্থক্য

ধরুন, আমার হাতে একটি কলম আছে আর আমি তা দেখিয়ে আপনাদের জিজ্ঞেস করলাম, আমার হাতে কী কলম আছে? তখন আপনারা

দেখে উত্তর দিবেন। একে বলে মুশাহাদা। কিন্তু যদি আমি বলি, আমার পকেটে কী কলম আছে? এবং আপনারা যদি না দেখে বলতে পারেন, তাহলে তা হবে ঈমান। মুশাহাদার নাম ঈমান নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বাস করা এবং তিনি আল্লাহর কাছ থেকে যে বাণী নিয়ে এসেছেন, সেগুলো কোনো শর্ত ছাড়া মেনে নেওয়ার নামই হচ্ছে ঈমান।

## একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

বাদশা হারুনুর রশিদ-এর যমানায় একজন বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নাম বাহলুল। খলিফা তাঁকে অনেক সম্মান করতেন। খলিফার স্ত্রী যুবায়দাও একজন নেককার মহিলা ছিলেন। তিনি তাঁর মহলে এমন এক হাজার খাদেম রেখেছিলেন, যারা ছিলেন কুরআনের হাফেয। তাঁরা পালাক্রমে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এজন্য তাঁর মহলের চারদিক থেকে সবসময় কুরআনের আওয়াজ শোনা যেত।

একদিন হারুনুর রশিদ স্ত্রীদের নিয়ে নদীর তীরে আমোদ-ভ্রমণে বের হলেন। তখন দেখলেন, বাহলুল এক জায়গায় বসে আছেন। খলিফা তাঁকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বাহলুল! এখানে কী করছেন? বাহলুল বললেন, ঘর বানাচ্ছি। খলিফা জিজ্ঞাসা করলেন, কার জন্য ঘর বানাচ্ছেন? বাহলুল বললেন, যে এটা ক্রয় করবে, আমি দু'আ করব যেন আল্লাহ তাকে জান্নাতে একটি ঘর দান করেন। খলিফা বললেন, এই ঘরের মূল্য কত? বাহলুল বললেন, এক দিনার। খলিফা বুঝতে পারলেন, বাহলুল পাগল। তিনি কিছু না বলে চলে গেলেন। তাঁর পিছু-পিছু যুবায়দা এলেন। বাহলুল তাঁকেও একই কথা বললেন। যুবায়দা তাকে এক দিনার দিয়ে দিলেন।

রাতে হারুনুর রশিদ স্বপ্নে দেখলেন, জান্নাতে খুব সুন্দর উঁচু একটি মহল। তাতে যুবায়দার নাম লেখা। হারুনুর রশীদ ভাবলেন, এ তো আমার স্ত্রীরই মহল; তাই ঘুরে দেখে আসি। তিনি যেই না মহলে প্রবেশ করতে গেলেন, অমনি দারোয়ান তাকে বাধা দিল। হারুনুর রশীদ বললেন, এটা তো আমার স্ত্রীর মহল; আমাকে প্রবেশ করতে দিন। দারোয়ান বলল, এখানকার নিয়ম আলাদা। যার মহল তিনিই শুধু প্রবেশ করতে পারবেন।

একথা বলার পর হারুনুর রশীদের ঘুম ভেঙে গেল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন, আল্লাহ হয়তো বাহলুলের দু'আর বরকতেই এই মহল যুবায়দাকে দান করেছেন। তিনি যদি এক দিনার দিয়ে ক্রয় করে নিতেন, তাহলে হয়তো মহলটি তাঁরই হতো। এই ভেবে তিনি সারা রাত আফসোস করে কাটালেন।

পরদিন তিনি সকালে চিন্তা করলেন, আজও আমি অবশ্যই সাগরের কিনারে যাব। আজকে বাহলুলকে পেলে আমিও একটা ঘর কিনব।

যথারীতি সন্ধ্যায় তিনি স্ত্রীকে নিয়ে সাগরের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি বাহলুলের খোঁজে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, বাহলুল একস্থানে বসে এ রকমই একটি ঘর বানাচ্ছেন। তিনি বাহলুলকে সালাম দিলেন। বাহলুল সালামের উত্তর দিলেন। হারুনুর রশীদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী করছেন? বাহলুল বললেন, ঘর বানাচ্ছি। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ ঘর কার জন্য বানাচ্ছেন? বাহলুল বললেন, যে এই ঘর কিনবে, আমি আল্লাহর কাছে তার জন্য দু'আ করব, আল্লাহ যেন জান্নাতে তাকে একটি ঘর দান করেন। হারুনুর রশীদ জিজ্ঞাসা করলেন, এর দাম কত?

বাহলুল বললেন, এর দাম সারা দুনিয়ার বাদশাহীর সমতুল্য। হারুনুর রশীদ বললেন, এর দাম এতো হলে তো আমি দিতে পারব না। গতকাল এক দীনারের বিনিময়ে দিতে চেয়েছিলেন আর এখন এর বিনিময়ে পুরো দুনিয়ার বাদশাহী দাবি করছেন? বাহলুল বললেন, বাদশাহ নামদার! গতকাল না দেখে লেনদেন করেছি। আজ দেখার পর মুআমালা হচ্ছে। গতকাল না দেখার কারণে দাম সস্তা ছিল। আর আজকে দেখার কারণে মালের দাম এতো বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের উদাহরণ এমন যে, আমরা এখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে না দেখে ঈমান এনেছি। এজন্য জান্নাত অনেক সহজেই অর্জন করা হচ্ছে। কিন্তু যখন মৃত্যুর আগ মুহূর্তে আখেরাতের সব কিছু দৃষ্টিগোচর হয়ে যাবে, তখন হাজার চাইলেও এর মূল্য আদায় করতে পারবে না।

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (١٣) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (١٤)

'হাশরের ময়দানে অপরাধীরা আশা করবে, যদি আযাবের বদলায় স্বীয় পুত্র, স্ত্রী, ভাই এমনকি দুনিয়াতে যা কিছু আছে, এর সবকিছু দিয়ে হলেও আমি যদি জাহান্নাম থেকে বেঁচে যেতে পারতাম!'[১]

তারপর আল্লাহ বলেন, كَلَّا অর্থাৎ, কখনওই এমন হবে না।

---

১. সূরা মাআরিজ : আয়াত ১১-১৪

## বিস্ময়কর ঈমান

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জিহাদ থেকে ফেরার সময় নদীর তীরে তাঁবু স্থাপন করলেন। নবীজি জরুরত থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তায়াম্মুম করলেন। এক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সামনে পানি আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ স্থান থেকে ওই স্থান পযর্ন্ত যাওয়ার সময় আমি জীবিত থাকব কিনা এজন্য সাবধানতার জন্য তায়াম্মুম করছি। তারপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিয়ে ওযু করলেন এবং নামায আদায় করলেন। তারপর সাহাবীগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আশেপাশে বসে পড়লেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আমার সাহাবীরা! বলো তো, সবচেয়ে আশ্চর্য ঈমান কার?

সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সবচেয়ে আশ্চর্য ঈমান ফেরেশতাদের। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফেরেশতা কিভাবে ঈমান আনবে? তারা তো নূরের তৈরী। তারা গুনাহ করতে পারে না। কেননা, আল্লাহ বলেন,

لَا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ.

'যারা অমান্য করে না যা আল্লাহ তাদের আদেশ করেন এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয় তা-ই করে।'[১]

তাদের ঈমান বিস্ময়কর নয়। সাহাবীগণ বললেন, তাহলে নবীগণের ঈমান বিস্ময়কর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না; নবীদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী আসে, তাদের মুজিযা প্রকাশ পায়। যদি নবীরা ঈমান না আনে, তাহলে কে ঈমান আনবে? সাহাবীগণ আশ্চর্য হয়ে বললেন, যদি তাঁদের ঈমান বিস্ময়কর না হয়, তাহলে আমাদের ঈমান বিস্ময়কর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। তোমাদের ঈমানও বিস্ময়কর নয়। তোমরা আমার সাক্ষাৎ লাভ করেছ। তোমরা জিবরীলকে আসতে দেখেছ। তোমরা কুরআন অবতীর্ণ হতে দেখেছ। তোমরা যখন এতো নিদর্শন নিজের চোখে দেখেছ, তখন তোমাদের ঈমান বিস্ময়কর নয়।

তারপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর নবী! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন, কার ঈমান বিস্ময়কর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

১. সূরা তাহরীম : আয়াত ৬

বললেন, আমার পরে আমার উম্মতের কিছু মানুষ আসবে। তারা আমার ওফাতের লাখ বছরের পর জন্ম গ্রহণ করবে। তারা আমার সাক্ষাৎ পাবে না। কুরআন অবতীর্ণ হওয়া দেখবে না। ফেরেশতাদের আসা-যাওয়া দেখবে না। চতুর্দিকে ফেতনা হবে। সন্দেহ সৃষ্টি হবে। কিন্তু আলেমরা আমার কথা তাদের নিকট উপস্থাপন করবে। তারা আমার মহব্বতে সেগুলো মেনে নিবে। তাদের ঈমান আল্লাহর নিকট বড় আশ্চর্যের হবে।

## অবিচল থাকার গুরুত্ব

এটি বড়ই আশ্চর্যের বিষয় যে, আমরা আল্লাহর রাসূলের কথা শুনে মানছি। নবুওতের পর ১৪০০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। বর্তমানে চতুর্দিকে ফেতনা আর যুলুম-ফ্যাসাদ। চতুর্দিক থেকে ঈমানের উপর হামলা আসছে। সঠিক পথ থেকে ফেরানোর মানুষ আছে। এসময় যে ঈমানের উপর দৃঢ় অবস্থানে থাকবে, আল্লাহর নিকট সে বড় প্রতিদান পাবে।

## জীবন অতিবাহিত করার দুটি অবস্থা

জীবন অতিবাহিত করার দুটি অবস্থা। একটি দেখার জীবন অর্থাৎ যা চোখে দেখা যায় তা বিশ্বাস করা। যেমন- চোখে দেখে, ঘুষ নেওয়ায় উপকারিতা আছে। এতে টাকা আসে। চোখে দেখে, ধোঁকা দিয়ে মাল কামাইয়ে লাভ বেশি। চোখে দেখে, ভেজাল মিশ্রিত করো; তাহলে ব্যবসা ভালো হবে। অর্থাৎ চোখ দেখে, এই কাজের মধ্যে লাভ বেশি। যে এ কাজগুলো করবে, সে দেখে জীবন অতিবাহিত করবে।

দ্বিতীয় অবস্থা খবরের জীবন অতিবাহিত করা। যেমন- এক ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমসমূহ দেখছে যে, ভেজাল মেশানো নিষেধ, ঘুষ নেওয়া গুনাহ, কাউকে ধোঁকা দিয়ে মাল অর্জন করা গুনাহ। দেখে সে পিছনে সরে যায়। একে ঈমানওয়ালা জীবনও বলে। খবরের জীবনের উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীন পেয়েছেন, তার উপর চোখ বন্ধ করে আমল করুন। যেব্যক্তি নিজের চোখে দেখে বৈধাবৈধভাবে ফায়দা উঠানোর চেষ্টা করে, সে দেখার জীবন অতিবাহিত করে। স্মরণ রাখা উচিত, আমাদের সফলতা খবরের জীবন অতিবাহিত করার মধ্যে। দেখার জীবনের মধ্যে সফলত নেই। একটি উপমা দ্বারা কথাটি বোঝানোর চেষ্টা করেছি।

## প্রথম উদাহরণ

মুসা আলাইহিস সালামের চতুর্দিকে সাপ। জাদুকরদের বিপরীতে তাঁর হাতে শুধু লাঠি। এ অবস্থায় যদি বিবেককে জিজ্ঞাস করা হয় তখন বিবেক

বলবে, নিজের লাঠিটা শক্ত করে ধরো। সাপ নিকটে এলে লাঠিটা তার মাথায় মারবে, তাকে আহত করে রাখবে। এভাবে আপনি বেঁচে যাবেন। কিন্তু লাঠি হাত থেকে ছাড়তে পারবে না। লাঠি ছাড়লেই কিন্তু সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করুন, এসময় কী করা উচিত। আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ হবে, হে আমার প্রিয় মুসা! নিজের লাঠি যমীনে ছেড়ে দাও। এখন বিবেক আওয়াজ করে, চিৎকার করে এবং বলে, না না, লাঠি যমীনে ছেড়ে দিলে তুমি মরে যাবে। মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী ছিলেন। তিনি আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী কাজ করছেন। তিনি লাঠিটা যমীনে ছেড়ে দিলেন। লাঠি সাপ হয়ে গেল এবং সবগুলো সাপ খেয়ে ফেলল। আল্লাহ হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে সফলতা দান করলেন।

## দ্বিতীয় উদাহরণ

হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সামনে নীলনদ আর পিছনে ফেরাউনের বাহিনী। দেখে মুসা আলাইহিস সালামের সাথীরা বলল–

إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

'এখন আমরা পাকড়াও হয়ে যাব।'[১]

قَالَ كَلَّا

'তিনি বললেন, কক্ষনো নয়।'[২]

একটি বিশ্বাসী আওয়াজ উঠল–

إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

'আমার রব আমার সঙ্গে আছেন; তিনি অবশ্যই আমাকে পথ করে দেবেন।'[৩]

এই সময় বিবেককে জিজ্ঞাসা করো, বান্দার কী করা উচিত। বিবেক বলবে, সামনে নীলনদ, পিছে সৈন্যবাহিনী; তোমরা উভয়ের মাঝখানে। তোমরা লাঠিটা হাতে শক্ত করে ধরো এবং শত্রুকে প্রতিহত করো, যেন তুমি সফল হয়ে যাও। আল্লাহকে প্রশ্ন করো, ওই সময় কী করা উচিত। আল্লাহ বলবেন, হে আমার প্রিয় মুসা!

---

১. সূরা শু'আরা : আয়াত ৬১
২. সূরা শু'আরা : আয়াত ৬২
৩. সূরা শু'আরা : আয়াত ৬২

اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ

'তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করো।'[১]

কিন্তু আকলে ধরে না। সে শোরগোল করে। চেঁচামেচি করে এবং বলে পানিতে লাঠি মারলে কী হবে? যদি মারতে হয় তো ফেরাউনের মাথার উপর মারতে হবে। কিন্তু হযরত মুসা আলাইহিস সালাম সেই কাজ করলেন, যে কাজ করতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছিলেন। মুসা আলাইহিস সালাম লাঠিটা পানির উপরে মারলেন। তখন ১২টি রাস্তা হয়ে গেল। আল্লাহ তাঁকে সফলতা দান করলেন আর ফেরাউনের বাহিনীকে নদীতে ডুবিয়ে মারলেন।

## তৃতীয় উদাহরণ

মুসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলকে নিয়ে নদীর ওপারে চলে গেলেন এবং তীহ ময়দানে পৌঁছলেন। দেখলেন, সেখানে পানি নেই। মুসা আলাইহিস সালামের জাতি পনি না পেয়ে পেরেশান হয়ে গেল। তারা বলল, এস্থানে পানি নেই; কী করব? বিবেক বলে, তোমার নিকট কোনো অস্ত্র নেই। আছে শুধু একটা লাঠি। লাঠির সাহায্যে একটা গর্ত করো, হয়তো এ গর্ত থেকে পানি বের হয়ে আসবে। সাবধানতার সাথে আস্তে-আস্তে গর্ত করবে, যাতে লাঠি না ভাঙে। লাঠি ভেঙে গেলে আশার শেষটুকুও শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহকে যদি বলা হয়, এখন কী করব? আল্লাহ বলবেন, আমার প্রিয় নবী!

اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ

'আপনি পাথরের উপর লাঠি দ্বারা আঘাত করুন।'[২]

বিবেক বলবে, লাঠি মারলে লাঠি ভেঙে যাবে এবং আশা শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর নবী তা-ই করলেন, যা আল্লাহ আদেশ করেছেন। যখন পাথরের উপর লাঠি মারলেন, তখন পাথর থেকে পানির ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করল। আল্লাহ তাঁকে সফলতা দান করলেন। এই উপমা দ্বারা একথা প্রকাশ পেল যে, দেখার রাস্তার উপর চলার পথ ঈমান না। খবরের রাস্তার উপর জীবন চালালে সফলতা পাবে। এটিই ঈমান।

## আল্লাহর হুকুমের ওপর উঠে যাও

কাফের দেখার রাস্তার উপর চলে এবং মুমিন খবরের রাস্তার উপর আমল করে। এজন্য জেহেনে একথাটি ভালোভাবে বসানো উচিত যে, আমরা

---

১. সূরা শুআরা : আয়াত ৬৩

২. সূরা বাকারা : আয়াত ৬০

দুনিয়াতে ফায়দা চাইব না। বরং আমরা আল্লাহর হুকুম মেনে চলব। শত ফায়েদা সত্ত্বেও আমরা আল্লাহর হুকুমের সামনে নতি স্বীকার করব।

## মানুষ ও পরীক্ষা

আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়াতে প্রত্যেক মানুষের উপর পরীক্ষা আসে। কিন্তু আল্লাহর খবরের রাস্তায় চলার জীবনওয়ালাদের সব সময় সফলকাম হবে। আল্লাহ বলেন,

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

'মানুষের এ ধারণা না করা উচিত যে, আমরা ঈমান আনব এবং আমাদের পরীক্ষা করা হবে না।'[১] আল্লাহ বলবেন,

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

'আমি তাদের বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করব।'

যারা পরীক্ষায় পাস করবে, তাদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। আল্লাহ পরীক্ষা ব্যতীত কারো ঈমান কবুল করেন না। আল্লাহ পরীক্ষা করবেন। তিনি ইরশাদ করেন–

فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

'আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দিবেন কারা মিথ্যাবাদী।'[২]

আল্লাহ তা'আলা ভালো-মন্দের পরীক্ষা নেবেনই। সুতরাং মানুষ যেন কখনও এই চিন্তা না করে যে, আমরা যেহেতু ঈমান এনেছি সুতরাং এখন আর আমাদের কোনো পরীক্ষা হবে না। এমনটা কখনও হবে না। বরং আল্লাহ তা'আলা আমাদের পরীক্ষা করবেন। তিনি বলেন–

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝

'আমি ভয়, ক্ষুধা, ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করব। আপনি ধৈর্যশীলদের শুভসংবাদ দিন।'[৩]

---

১. সূরা আনকাবুত : আয়াত ২
২. সূরা আনকাবুত : আয়াত ৩
৩. সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৫

আমি বিভিন্নভাবে তাদের পরীক্ষা করব। যারা এ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, আপনি তাদের সুসংবাদ দিন।

এর দ্বারা প্রতীয়মান হলো, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া কারুর ঈমান গ্রহণযোগ্য হবে না।

## প্রতিটি মুহূর্তই পরীক্ষা

আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে পরীক্ষা করবেন। যার নিকট টাকা-পয়সা আছে, তা তার জন্য পরীক্ষা। যে গরিব, তার জন্য তা পরীক্ষা। যে সুস্থ, তার জন্য সুস্থতা পরীক্ষা। যে অসুস্থ, তার জন্য অসুস্থতা পরীক্ষা। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে পৃথক অবস্থায় পরীক্ষা করেন। যে ভালো অবস্থায় আছে, সে শোকর করবে আর যে খারাপ অবস্থায় আছে, সে ধৈর্যধারণ করবে। শুকরিয়াকারী ও ধৈর্যধারণকারী সবাই জান্নাতে যাবে।

## অবস্থার পরিবর্তন

আল্লাহ সবসময় মানুষকে এক অবস্থায় রাখেন না। বরং মানুষকে তিনি বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত করেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَتِلْكَ الأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

'মানুষের মধ্যে আমি এই দিনগুলো পর্যায়ক্রমে আবর্তন ঘটাই।'[১]

আজকে কোনো এক ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে, তো পরের দিন ওই ঘরেই কান্না-আহাজারি শোনা যায়। যে এখন যৌবনের নেশায় মত্ত রয়েছে, সে পরের দিন অসুস্থতার কারণে বিছানায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে।

خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں

جہاں بجتی ہے شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں

'আনন্দের পাশাপাশি দুনিয়ায় হাজারো বেদনাও আছে। যেখানে বিয়ের শানাই বাজে, সেখানে মৃত্যুর কান্নাও গুঞ্জরিত হয়।'

## পরীক্ষায় ফেলার উদ্দেশ্য

স্মরণ রাখো, যদি আমরা থালা ক্রয় করি, তা টোকা দিয়ে দেখি। এভাবে আল্লাহ ঈমানের ব্যাপারে বান্দাকে টোকা দিয়ে দেখেন এবং বান্দার ঈমানের

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪০

পূর্ণতা বোঝা যায়। যে অন্ধ বিশ্বাসী হয়, সে পিছনে সরে যায়। যার ঈমান দৃঢ় হয়, সে তার সঙ্গে থাকে।

## ঈমানের পরীক্ষা

পরীক্ষা আল্লাহওয়ালাদের উপরও আসে। প্রথম যুগে পরীক্ষা ছিল বর্তমানেও পরীক্ষা আছে, উপর থেকে বৃষ্টি বন্ধ। নিচের থেকে কূপ বন্ধ। গাছে কোনো ফল নেই। এ সময় আল্লাহর উপর কী রকম বিশ্বাস রাখা উচিত। অন্যদিক থেকে সাহায্যের আবেদন আসছে এবং বলা হচ্ছে, আল্লাহর দফতর থেকে নাম কেটে আমাদের দফতরে নাম লেখাও। এখানে ঈমান প্রকাশ করো যে, না আমরা আল্লাহকে আমাদের প্রভু মেনেছি। আমরা ঈমান থেকে এক ইঞ্চি আগে-পিছে যাব না। এটি ঈমানের পরীক্ষা। প্রত্যেক যুগে পরীক্ষা বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। একদিকে ক্ষুধা, পিপাসা দেখা যায়। অন্য দিকে দুনিয়ার মাল দেখা যায় এবং বলা হয়, আসো আমাদের দাওয়াত গ্রহণ করো। আমরা ধনভাণ্ডারের মুখ খুলে দেব।

এখানেই পরীক্ষা হয়, কে আল্লাহর বান্দা, কে দুনিয়ার বান্দা। স্মরণ রাখুন, আমাদের রব যদি মুসা (আ.)-এর উম্মতকে কোনো শ্রম ছাড়া ৪০ বছর মান্না-সালওয়া খাওয়াতে পারেন, তাহলে তিনি আমাদেরও রিযিক দান করতে পারেন। এজন্য আমরা আল্লাহর ভাণ্ডারের উপর বিশ্বাস রাখি যে, তাঁর ভাণ্ডারে কোনো অভাব নেই। বরং আমাদের অপকর্মগুলোই আমাদের রিযিকের দরজা বন্ধ করে দেয়।

## রিযিকের দরজা বন্ধ হওয়ার মূল কারণ

মানুষের খারাপ আমলের কারণে আল্লাহ রিযিকের দরজা বন্ধ করে দেন। আল্লাহ বলেন–

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا.

'যে আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবনযাপন সংকুচিত হয়ে যাবে।'[১]

যদি আমরা গুনাহ করা ছেড়ে দিই, তাহলে দেখব আল্লাহর পক্ষ থেকে কত রিযিক আসে। আল্লাহ বলেন,

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

---

১. সূরা ত্বাহা : আয়াত ১২৪

'যদি জনপদের অধিবাসীরা সকলে ঈমান আনয়ন করত, তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম।'[১]

## পরীক্ষাকে খুশির সাথে গ্রহণ করা চাই

আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি প্রত্যেক বান্দাকে পরীক্ষা করব, যাতে অনুগত ও অবাধ্যকে চেনা যায়। আমাদের উচিত, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া। আমরা দুর্বল; পরীক্ষার উপযুক্ত নই। যদি কখনও আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা আসে, তাহলে হতাশ হওয়ার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ মাথার উপর যে বোঝা রাখেন, তা উঠানোর তাওফীক দান করেন।

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

'আল্লাহ কারো উপর সামর্থ্যের বেশি বোঝা চাপান না।'[২]

আমরা কি ছোট বাচ্চার উপর এক মণ বোঝা চাপিয়ে দেই? কখনও না। কোনো বাচ্চা যদি উঠাতে চায়, তাহলে আগে চিন্তা করি, সে কতটুকু উঠাতে পারবে। আমরা যখন একথা বুঝি যে, এই পরিমাণ ওজনের বোঝা কোনো বাচ্চার মাথায় তুলে দেওয়া ঠিক নয়, তখন আল্লাহও সাহসের চেয়েও অধিক মাত্রার বোঝা দিতে চান না। বরং সত্য কথা হলো, আগে মাথায় বোঝা উঠানোর সাহস দান করেন। তারপর বোঝা তুলে দেন। এজন্য কোনো পরীক্ষা সামনে এসে পড়লে সাহসিকতার সাথে তা মোকাবেলা করতে হবে। আর অন্তরে বলবেন,

تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے

کہ یہ تیری دی ہوئی چیز ہے

'তোমার বেদনাও আমার প্রিয়।

কারণ, এ যে তুমি আমায় দিয়েছ।'

এজন্য পরীক্ষার সম্মুখীন হলে দৃঢ়পদ থাকতে হবে। কারণ, এই পরীক্ষা আগেও এসেছে। পরে আবারো আসবে।

## মূসা নবীর মায়ের ঈমানি ঘটনা

আপনাদের আমি একটি ঈমানদীপ্ত ঘটনা শোনাচ্ছি। মনোযোগ দিয়ে শুনুন।

---

১. সূরা আ'রাফ : আয়াত ৯৬

২. সূরা বাকারা : আয়াত ২৮৬

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ

'আমি মূসার মায়ের নিকট ওহী পাঠালাম, তুমি তোমার বাচ্চাকে দুধ পান করাও।'[১]

فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ

'যদি তার ব্যাপারে তোমার ভয় হয় যে, ফেরাউনের বাহিনী তাকে হত্যা করে ফেলবে, তাহলে তুমি তাকে নদীতে ভাসিয়ে দাও।'[২]

একটু পর বললেন–

يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ

'যে তাকে নিবে, সে আমারও দুশমন এবং তারও দুশমন।'[৩]

এই বলে সাথে-সাথে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন–

وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

'কিন্তু ভয়ের কোনো কারণ নেই। পেরেশানিরও কোনো কারণ নেই। আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেব এবং আমি তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব।'[৪]

হযরত মুসা নবীর মা চিন্তা করতে লাগলেন, আল্লাহ! আপনি একে রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন ঠিক আছে; তবে ফেরাউনের সৈন্য যেন এখানে আসতে না পারে আপনি সেই ব্যবস্থা করুন। আমি এই বাচ্চাকে কোনো গুহার কিংবা ঘরের ছাদের ওপর রেখে দেব, যাতে তাকে কেউ দেখতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ বলছেন, একে পানিতে ছেড়ে দাও। যুক্তি বলে, পানিতে ছেড়ে দিলে বাচ্চাটা ডুবে মারা যাবে। সিন্দুকে ভরে ছেড়ে দিলে এর ভিতর পানি ঢুকে যাবে। আবার চারদিক থেকে সিন্দুক বন্ধ করে দিলে বাতাস না ঢোকার কারণে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে।

কিন্তু মূসা নবীর মা আল্লাহর ওপর ভরসা করে স্বীয় কলিজার টুকরাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিলেন। আল্লাহর শান লক্ষ্য করুন, ফেরাউন স্বীয় স্ত্রীর সাথে

---

১. সূরা কাসাস : আয়াত ৭
২. সূরা কাসাস : আয়াত ৭
৩. সূরা ত্বহা : আয়াত ৩৯
৪. সূরা কাসাস : আয়াত ৭

সমুদ্রপাড়ে টহল দিচ্ছিল। চারশত গোলাম তার সামনে-পিছনে নিয়োজিত থাকত। তারা সমুদ্রে একটি সিন্দুক পেয়ে তা ফেরাউনের সামনে পেশ করল। তারা ওই সিন্দুকে একটা বাচ্চা দেখতে পেল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّيْ

'হে মুসা! আমি আপনার চেহারায় ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছি।'[১]

আল্লাহ মুসা নবীর চেহারায় এমন ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন যে, যে দেখত সে-ই ভালোবাসত। যেমন– ফেরাউনের স্ত্রী দেখে বলতে লাগল–

لَا تَقْتُلُوْهُ عَسٰى اَنْ يَّنْفَعَنَآ اَوْ نَتَّخِذَهٗ وَلَدًا

'তাকে হত্যা করো না। আমরা হয়তবা তার দ্বারা উপকৃত হব অথবা আমরা তাকে আমাদের সন্তান বানিয়ে নেব।'[২]

স্ত্রীর কথা শুনে ফেরাউন ভাবল, আমরা একে ছেলের মতো লালন-পালন করব। সে আমাদের থেকে রাজত্ব নিবে না। আমাদের অনুগত হবে। ফেরাউন বলল, তাকে হত্যা করো না। তার বিবেক তাকে ধোঁকা দিয়েছে। হাজার-হাজার বাচ্চার হত্যাকারী কিভাবে ধোঁকা খেল? কিতাবে লেখা আছে, ফেরাউনের স্ত্রী যখন শুনল, তখন সে খুশি হয়ে গেল এবং বলতে লাগল,

قُرَّةُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ

'এই বাচ্চা আমার ও তোমার চোখ ঠাণ্ডা করে দেব।'[৩]

ফেরাউন বলল,

قُرَّةُ عَيْنٍ لَكَ

'সে তোমার চোখ ঠাণ্ডা করবে।'

আমার কোনো প্রয়োজন নেই। রুহুল মা'আনী গ্রন্থে লিখা আছে, যখন ফেরাউনের স্ত্রী বলল,

قُرَّةُ عَيْنٍ لِّيْ وَلَكَ

'এই বাচ্চা আমার ও তোমার চোখ ঠাণ্ডা করে দেব।'

---

১. সূরা ত্বাহা : আয়াত ৩৯
২. সূরা কাসাস : আয়াত ৯
৩. সূরা কাসাস : আয়াত ৯

ওই সময় ফেরাউন যদি হাঁ উত্তর দিত, তাহলে হাঁ এর বরকতে আল্লাহ তাকে ঈমান আনার তাওফীক দিতেন। কেননা, ফেরাউনের স্ত্রী (আছিয়া) খুশি হয়েছেন। এজন্য ফেরাউন তার সামনে ৪০০ গোলামকে আযাদ করে দিয়েছেন। হযরত মুসা নবী ছোট ছিলেন; কিন্তু ফেরাউনের ঘরে যাওয়ার পর ৪০০ গোলাম আযাদের মূল কারণ হলেন।

এভাবে আল্লাহওয়ালারা যে জনপদে যান, ওই ভূমির জন্য তাঁরা নফস ও শয়তানের গোলামি থেকে আযাদ হওয়ার কারণ হন।

মুসা নবীকে রাজপ্রাসাদে নেওয়ার পর দুধ পান করানোর চিন্তা এল। মহিলারা দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি কারুরই দুধ পান করলেন না। আল্লাহ বলেন,

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ

'আমি তার জন্য অন্য মহিলার দুধকে হারাম করে দিলাম।'[১]

ফেরাউন খুব চিন্তি হলো যে, বাচ্চা দুধ পান করছে না কেন? সে বলল, অন্য মহিলাদের ডাকো। কিছু মহিলাকে ডাকা হলো। কিন্তু বাচ্চা কারো দুধ পান করছে না। ফেরাউন আরো বেশি চিন্তা করতে লাগলেন। এভাবে রাত কেটে গেল। এদিকে মুসা নবীর মা খুব চিন্তিত ছিলেন। দুঃখ-কষ্টে রাত কাটালেন। আল্লাহ বলেন,

إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا

'যাতে সে আস্থাশীল হয় এজন্য আমি তার হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিলে সে তার পরিচয় প্রকাশ করেই দিত।'[২]

তার অন্তরে যদি প্রশান্তি না দিতাম, তাহলে সে কান্নাকাটি করত এবং মানুষ জেনে যেত। আল্লাহ তাকে প্রশান্তি দান করলেন। নিজের মেয়েকে বললেন, যাও, ভাইয়ের খবর নাও। মুসা নবীর বোন বের হলো। সে ফেরাউনের প্রাসাদে গিয়ে দেখল, মুসা একজনের কোলে শুয়ে আছেন। মহিলারা দুধ পান করানোর চেষ্টা করছে। সে দুধ পান করছে না। ফেরাউন চিন্তিত। মুসার বোন ফেরাউনকে বলল,

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

---

১. সূরা কাসাস : আয়াত ১২
২. সূরা কাসাস : আয়াত ১০

'আমি কি তোমাদের এমন মহিলার সংবাদ দেব, যে তাকে দুধ পান করাবে, তার উত্তম লালন-পালন করবে এবং সে তার অনেক হিতাকাঙ্ক্ষী হবে?'[১]

কথাটায় ফেরাউনের মনে খটকা লাগল। বলল, সে কেন এর হিতাকাঙ্ক্ষী হবে? তিনি মুসার বোন ছিলেন। খুব বুঝে-শুনে উত্তর দিলেন, আমরা আপনার অনুগত। আমরা যদি আপনার হিতকামনা না করি, তবে কে করবে? ফেরাউন বলল, যাও যাকে ইচ্ছা নিয়ে আসো। মুসার বোন দৌড়ে এসে মাকে বলল, চলো, ভাই কারও দুধ পান করেনি। মুসার মা এলেন এবং ছেলেকে দুধ পান করাতে শুয়ে পড়লেন। বাচ্চাটি দুধ পান করল এবং ফেরাউনের চিন্তা দূর হলো।

দু-তিন দিন রাজপ্রাসাদে দুধ পান করানোর পর বললেন, আমাকে বাড়ি যেতে হবে। আমি রাজপ্রাসাদে থাকতে পারি না। ফেরাউন বলল, বাচ্চাকে সাথে নিয়ে যাও। নিজের ঘরে গিয়ে তাকে দুধ পান করাও। আমি রাজভাণ্ডার থেকে তোমার বেতন নির্ধারণ করে দেব। প্রতি মাসে তোমার বেতন পাঠিয়ে দেব। আল্লাহ বলেন,

فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

'আমি তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার নয়ন শীতল হয় এবং কোনো পেরেশানি না থাকে। আর মনে রাখবে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।'[২]

## ঈমানের হেফাযত

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, মুসা নবীর মায়ের মতো যে আল্লাহর ওয়াদার প্রতি ভরসা রাখবে, আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ পুরস্কার দান করবেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর নবী! দ্বিগুণ পুরস্কার কী? নবীজি বললেন, মুসা নবীর মাকে দেখো। নিজের বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছে আবার সরকারি ভাণ্ডার থেকে বেতনও পাচ্ছে।

আমাদের আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা রাখা উচিত। আমরা এরকম হয়ে যাব যে রকম আমাদের পায়ের নিচের জুতা। কেউ যদি আমাদের শূলিতে

---

১. সূরা কাসাস : আয়াত ১২

২. সূরা কাসাস : আয়াত ১৩

চড়ায় বা জীবিত অবস্থায় আমাদের শরীর থেকে চামড়া উঠানোর চেষ্টা করে ওই সময় আমরা অন্তরে ঈমান মজবুত, দৃঢ় রাখব। আমরা বলব, তুমি আমাদের শরীর থেকে জান বের করতে পারবে। কিন্তু আমাদের অন্তর থেকে ঈমান বের করতে পারবে না।

## আল্লাহ্ওয়ালাগণের অবিচলতা

হযরত ওমর (রাযি.)-এর খেলাফতের যুগে দুজন মুসলমান কাফিরদের হাতে বন্দী হলো। কাফিররা বাদশাহকে বলল, হত্যা বা শাস্তি না দিয়ে এদের সাথে এমন ব্যবহার করুন, যাতে এরা এদের ধর্ম ছেড়ে আমাদের ধর্ম গ্রহণ করে। কেননা, এদের চেহারায় বাহাদুরির চাপ দেখা যাচ্ছে। এরা আপনার বাহিনীর অফিসার হতে পারবে। তারা চেষ্টা করল কোনোভাবে দুই মুসলমানকে তাদের ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করতে। প্রথমে লোভ দেখাল। দেখল, কাজ হচ্ছে না। তখন ভয় দেখাল এবং বলল, তোমাদের হত্যা করা হবে। তোমরা আমাদের ধর্ম গ্রহণ করো।

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

'সুতরাং তুমি যা করতে চাও করো। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনের উপরই কর্তৃত্ব করতে পারবে।'[১]

তোমাদের যা করার করে নাও। সর্বশেষ না হয় আমাদের মৃত্যু হবে। দুজন মুসলমানের পক্ষ থেকে বিপরীত উত্তর এল। তারা চিন্তা করল, এদের সাথে কী ব্যবহার করা যায়। শেষে তারা ঠিক করল, আমরা তেল গরম করব। একজনকে গরম তেলে ছেড়ে দেব। তাহলে দ্বিতীয়জন ভয় পাবে এবং আমাদের ধর্ম গ্রহণ করবে। তাহলে একজন তো আমাদের হয়ে যাবে। তেল গরম করার পর দুজনকে গরম তেলের নিকট নিয়ে ভয় দেখাল। যদি আমাদের কথা না শোন, তবে তোমাদের গরম তেলে ছেড়ে দেওয়া হবে।

যখন দেখল, তারা নিজেদের ধর্মের প্রতি অত্যন্ত দৃঢ়, তখন একজনকে গরম তেলে ছেড়ে দেওয়া হলো। চিন্তা করল, তেল যখন গরম হয়, তার মধ্যে গোস্ত ঢেলে দিলে তা কাবাব হয়ে যায়। একজন যখন কাবাব হয়ে গেল তখন দ্বিতীয়জনের চেহারা মলিন হয়ে গেল। মানুষ দেখল, তার চোখে পানি দেখা যাচ্ছে। তারা ভাবল, এ ভয় পেয়েছে।

---

১. সূরা তা-হা : আয়াত ৭২

সুতরাং তারা বলতে লাগল, আমরা প্রথমেই বলেছিলাম, যদি আমাদের কথা শোন, তাহলে কিছুই করব না। প্রথমজনের অবস্থা দেখেছ; সে কাবাব হয়ে গেছে। যদি আমাদের কথা শোন, তাহলে তোমাকে গরম তেলে ফেলব না। মুসলমান উত্তর দিল, তোমরা ভুল বুঝেছ। আমি তার অবস্থা দেখে ভয় পাচ্ছি না। তোমরা আমাকেও যদি গরম তেলে ফেলে দাও, তাও আমি তোমাদের ধর্ম গ্রহণ করব না। আমার উদ্দেশ্য হলো আমার একটাই জীবন। তোমরা যখন আমাকে একবার তেলে ঢেলে দিবে, তখন আমার এই জানটা শেষ হয়ে যাবে। আফসোস! যদি শরীরের পশম সমান আমার অগণিত জান থাকত আর তোমরা আমাকে অতবার তেলে ঢালতে আর আমি আমার মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে অতগুলো নজরানা পেশ করতাম! সুবহানাল্লাহ!

## দুর্বল বৃদ্ধার অবিচলতা

এই অধমের ১৯৯৪ সালে সমরকন্দ যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। সমরকন্দের জুমার মসজিদে খুতবা দিয়েছি। জুমার নামাযের পর কিছু যুবক আমার নিকট এল এবং বলতে লাগল, হযরত আমাদের ঘরে চলুন। আমাদের মা আপনার সাথে সাক্ষাতে কথা বলতে চান। আমি তাদের অক্ষমতা প্রকাশ করলাম এবং বললাম, এখানে অনেক মানুষ আছে; তাদের ছেড়ে আমি কিভাবে যাই। সমরকন্দের বড় মুফতী আমার রুমে ছিলেন। তিনি বলতে লাগলেন, হযরত! আপনি তাদের নিষেধ করবেন না। আমিও আপনার সাথে যাব। তাদের ওখানে যাওয়া প্রয়োজন। আমি বললাম, ঠিক আছে; চলুন। আমি দোস্ত-বন্ধুদের সাথে দেখা করে তাদের ঘরে যাওয়ার জন্য চললাম। পথিমধ্যে মুফতীয়ে আযম বললেন, ওই যুবকের মা একজন মুজাহিদা এবং একজন পাক্কা মুমিনা। কমিউনিজমের বিপ্লবের সময় তিনি বিশ বছরের যুবতী ছিলেন। তারপর সত্তর বছর পার হয়ে গেছে। এখন বয়স তার নব্বই হয়ে গেছে।

আল্লাহ কমিউনিজমের সময় এতো মজবুত ঈমান দান করেছিলেন যে, একদিকে নাস্তিকতার সয়লাব চলছে, অন্যদিকে এই নারীরা দীনের উপর টিকে থাকার জন্য তাবলীগ করছে। তাদের সাথে ঘন্টাব্যাপী আলাপ করে ঈমান আনার দাওয়াত দিতেন। আমরা পেরেশান হতাম যে, তাদের প্রাণ ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যাবে। ইতর প্রকৃতির সৈন্যরা তার ইজ্জতহানি করবে এবং তাকে শূলে চড়িয়ে হত্যাও করতে পারে। এজন্য আমরা তাকে বোঝাতাম, দেখো তুমি এখন যুবতী। তোমার ইজ্জত ও প্রাণের উপর আশঙ্কা আছে

এখন এভাবে প্রকাশ্যে তাবলীগ করো না। কিন্তু সে বলল, আমার ইজ্জত, আমার প্রাণ ইসলাম থেকে দামী নয়। আমার জান আল্লাহর রাস্তায় কবুল হয়ে গেলে সমস্যা কী?

সুতরাং সে প্রকাশ্যে নারীদের বোঝাত এবং শত-শত নারী তাওবা করে ইসলামের দিকে আসত। আমরা সমস্ত আলেম এই নারীকে নিয়ে পেরেশান থাকতাম, না জানি কখন কী হয়। যদি সবার সামনে তাকে শূলে চড়ানো হয় এবং উলঙ্গ করে ফেলে, তখন কী অবস্থা হবে। সে দীনের তাবলীগ চালাতে লাগল এবং হাজার-হাজার নারীর ঈমান আনার কারণ হয়ে দাঁড়াল। এখন সে বৃদ্ধা ও অসুস্থ। এই নারীকে আপনার ব্যাপারে তথ্য দিয়েছে যে, পাকিস্তান থেকে বড় আলেম এসেছেন। তিনি আপনার সাথে কথা বলতে চান। আমি তাকে বলেছি, আপনি আপত্তি করবেন না।

এই অধম খুশি হলো যে, এ রকম একজন নেক বান্দীর দ্বারা আমি দু'আ করাব। যখন আমরা তার ঘরে পৌঁছলাম, তখন দেখলাম, তিনি একটা চারপাইর ওপর চাদর বিছিয়ে শুয়ে আছেন। বাচ্চারা তার ওপর চাদর দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। আমরা তার থেকে ১ মিটার দূরে থাকতেই দাঁড়িয়ে গেল। এই অধম গিয়েই সালাম দিল। তারপর আমি বললাম, আম্মা! আমাদের জন্য দু'আ করুন। এজন্যই আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি। তখন বৃদ্ধা চাদরের ওপর থেকে হাত তুলে দু'আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ঈমান হেফাযত করুন। আপনারা বিশ্বাস করুন, আমাদের সকলের চোখে তখন পানি চলে এল। ওইদিন মনে হলো ঈমান কত বড় নেয়ামত। সত্তর বছর পর্যন্ত ঈমানের ওপর মেহনত করা নারী এখনও যখন দু'আ করছেন, তো প্রথমেই বলছেন, আল্লাহ! আমাদের ঈমান হেফাযত করুন।

## সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ

ঈমান কোনো সাধারণ বিষয় নয়। এটি অনেক বড় দৌলত। পরওয়ারদেগার আমাদের এই দৌলত দান করেছেন। এজন্য সবসময় এর হেফাযত করতে হবে। আমাদের আল্লাহর কাছে এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় ও হেফাযত করার তাওফীক চাইতে হবে। আমাদের জান ও ইজ্জতের চেয়ে ঈমানের মূল্য অনেক বেশি। এজন্য আল্লাহ ও তার প্রিয় নবীর কথার ওপর মজবুত ঈমান রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন।

## এক যুবকের অবিচলতা

সমরকন্দের ওই সফরেই এক আলেম এক যুবকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে এলেন। সৌভাগ্যবান এক যুবক, যে রুশ বিপ্লবের সময় প্রকাশ্যে আযান দিয়ে নামায আদায় করেছিল। আমি শুনে হয়রান হয়ে জিজ্ঞাস করলাম, তা কিভাবে সম্ভব হলো? যুবক স্বীয় পিঠ থেকে কাপড় সরিয়ে দিল। তার পিঠে এক ইঞ্চির উপর যখমের চিহ্ন। আমি জিজ্ঞাসা করার পর সে বলা শুরু করল, প্রথমে আযান দেওয়ার পর পুলিশ আমাকে ধরে নিয়ে বেদম প্রহার করে। কয়েকজন মিলে আমাকে মারতে-মারতে ক্লান্ত হয়ে যেত আর আমি আল্লাহর নাম জপতে থাকতাম। আমাকে বৈদুত্যিক শক দেওয়া হতো। আমি তা-ও বরদাশত করি। তারপর আমাকে বরফের ওপর কয়েক ঘন্টা ফেলে প্রহার করত। সারা রাত আমাকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখত। গরম কিছু দিয়ে আমাকে ছ্যাকা দিত। তারা আমার নখ টেনে তুলে নেয়। আমার মনে হতো, আমি যেন পাগল হয়ে যাচ্ছি। এক বছর পিটিয়ে আমাকে পাগলখানায় পাঠিয়ে দেয়। এক বছর ওখানে এভাবেই থাকি। চিকিৎসক রিপোর্ট দেয়, আমি পাগল হয়ে গেছি। এজন্য আমাকে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করার নির্দেশ হয়নি। ওই চিকিৎসকের রিপোর্ট অনুযায়ী আমাকে ছেড়ে দেয়। আমি বাইরে এসে একটা ছোট জায়গায় নামাযের জায়গা বানাই। ওখানে আমি প্রকাশ্যে পাঁচবার আযান দিয়ে নামায পড়তাম। আমি তার কপালে চুমা দিয়ে বললাম,

اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی
ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد

'সেই জাতির তরবারীর প্রয়োজন পড়ে না,
যার তরুণদের মধ্যে থাকবে ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা।'

আমি তাকে বারবার দেখতে লাগলাম এবং তার দৃঢ়তা দেখে ঈর্ষা করতে লাগলাম।

ازل سے رچ گئی ہے سربلندی اپنی فطرت میں
ہمیں کٹنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا

কী করব, সৃষ্টিলগ্ন হতেই চূড়ান্ত হয়ে গেছে, মর্যাদাবোধ স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হবে। আমরা টুকরা-টুকরা হতে পারি; কিন্তু মাথা নোয়াতে পারি না।

## সাহাবীগণের কাছে ঈমানের মূল্য

আল্লাহ সাহাবীদের ঈমান দান করার পর তারা সর্বদা এর হেফাযতের কথা চিন্তা করতেন। তারা বলতেন,

تَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ.

'আমরা আগে ঈমান শিখেছি; তারপর কুরআন শিখেছি।'

আমার বন্ধুগণ!

ওই ঈমান, যা সাহাবীগণ বদরের দিন তরবারীর নিচে পেয়েছিলেন। সেই ঈমানকে আজ আমরা পাখার বাতাসে খোঁজার চেষ্টা করি। এভাবে কি ঈমান পাওয়া যাবে? এর জন্য মেহনত করা জরুরি। ঈমানের খাতিরে জান-মাল কুরবানি করলে ঈমান অর্জিত হয়।

## সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি

মনে রাখবেন, বর্তমান যমানা এতো ফেতনার যমানা যে, যদি কারো এখন উহুদ পাহাড় পরিমাণও ঈমান থাকে, তাহলে সেও মুরতাদ হয়ে যাওয়া থেকে মুক্ত নয়। আশ্চর্যের কথা হলো, যাদের অন্তরে বিন্দুপরিমাণ ঈমান আছে, তারাই এর হেফাযত করা থেকে উদাসীন হয়ে গেছে। তাদের একথা মনেই হচ্ছে না যে, তাদের নিকট কত বড় দৌলত মজুদ রয়েছে। এজন্য এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা এখন খুবই জরুরি।

## সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে

কাফিরদের পক্ষ থেকে ইসলামি রাষ্ট্রে যে পরিকল্পনা করা হয়, তার মধ্যে সর্বপ্রথম হলো মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করা। এই সন্দেহ এতো ভয়ানক বিষয় যে, এটা ঈমানের ভিতকে নড়বড়ে করে দেয়। এজন্য নবীজি আল্লাহর কাছে এভাবে দু'আ করেছেন-

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الشَّكِّ وَالشِّرْكِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْأَخْلَاقِ

'হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই সন্দেহ, শিরক, নেফাক ও মন্দ চরিত্র থেকে।'

এ কারণে আল্লাহ ইরশাদ করেন–

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ

এটি এমন কিতাব, যার মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই।[১]

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২

এখানে চিন্তার বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলা لَا رَيْبَ আগে বলেছেন। هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ বলেছেন পরে। কারণ, সন্দেহ থাকলে হেদায়াত পাওয়া যাবে না। এজন্য দেখা যায়, কুফরের যে আন্দোলন চলছে, তা হলো মুমিনের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টি করা। কারণ, সন্দেহ সৃষ্টি হলেই ঈমান চলে যায়।

## ঈমান প্রকাশ করার মাধ্যম

এজন্য আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি মুমিন? তখন আপনি এভাবে জবাব দিবেন, আমি পাক্কা মুমিন। আল্লাহর রহমত যে তিনি আমাদের ঈমানের কালিমা আঁকড়ে ধরার তাওফীক দান করেছেন। এর মধ্যে সন্দেহ থাকতেই পারে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন,

اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ اِنْشَاءَ اللهُ

তিনি এ বাক্যটি নিজের প্রথম ও শেষের প্রতি লক্ষ রেখেই বলতেন। এটি আলেমগণের শান। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সর্বদা বলতে হবে, নিশ্চয় আমি পাক্কা মুমিন।

## দৃঢ় ঈমানের নিদর্শন

ইমাম রাযী (রহ.) আল্লাহর অস্তিত্বের উপর একশত দলিল জমা করলেন। একবার তাঁর সাথে শয়তানের সাক্ষাত হলো। তখন শয়তান তাঁর সাথে দীর্ঘ সময় বিতর্ক করতে থাকল। একপর্যায়ে তিনি ইবলিসকে বললেন, দেখো ইবলিস! আল্লাহর উপর আমার ঈমান বড়ই পাকা। সুতরাং তুমি আমাকে সন্দেহে ফেলতে পারবে না। উত্তরে ইবলিস বলল, কখনও নয়; বরং তোমার সামনে যে গ্রাম্য লোকটি হাল চাষ করছে, তার ঈমান তোমার চেয়ে বেশি মজবুত। তিনি বললেন, সে আবার কীভাবে? শয়তান বলল, অপেক্ষা করুন; আমি আপনাকে এর বাস্তব প্রমাণ দেখাচ্ছি। শয়তান একজন অপরিচিত লোকের আকৃতিতে ওই গ্রাম্য লোকের সামনে গিয়ে বলল, আল্লাহ কি আছেন? সাথে-সাথে লোকটি তাকে দুটা গালি দিয়ে পা থেকে জুতা বের করল তাকে মারার জন্য। তখন ইবলিস দ্রুতবেগে এসে ইমাম রাযি (রহ.)কে বলল, তার ঈমান কত মজবুত দেখলেন তো? আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারের কথা-ই সে বরদাশত করতে পারেনি। আমাকে পিটানোর জন্য উদ্ধত হলো। আর আমি আপনার সাথে বাহাস আরম্ভ করলে আপনি দলিল দিতে আরম্ভ করলেন। কেমন জানি আপনি একথা শুনে নিলেন যে আল্লাহ

নেই। বাকি থাকল দলিলের বিষয়টি। তো আমি এ ব্যাপারে আপনার থেকে আরো মজবুত দলিল দিতে পারব, যাতে আপনি পিছলে যাবেন এবং এর দ্বারা আপনার অন্তরে সামান্য সন্দেহ সৃষ্টি হলে আপনি ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন।

## ঈমানের পাথর

স্মরণ রাখবেন, যে জিনিষ হালকা হয় সেটা পানির সাথে ভেসে যায়। যেমন– লাকড়ি, ঘাস, কাগজ ইত্যাদি। পাথর কি কখনও পানির স্রোতে ভেসে যায়? কখনও নয়, বরং সে পানির মোড়কে ঘুরিয়ে দেয়।

দোস্ত! আজ গুমরাহি ও বেলেল্লাপনার সয়লাব বয়ে যাচ্ছে। আপনি পাথর বনে যান। আপনি ওসবের সাথে ভেসে যাওয়ার পরিবর্তে রুখে দাঁড়াবেন।

یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو

روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو

'যমানা সেই মানুষগুলোকে স্মরণ করছে,
যারা আগ্রাসী তুফানকেও রুখে দিত।'

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা সবাই মুমিন। এতে আমাদের কোনো কামালিয়াত নেই। বরং এটি আল্লাহরই কামাল যে, তিনি আমাদের এই নেয়ামত দান করেছেন। আমাদের উচিত, এই নেয়ামতের পরিপূর্ণ হক আদায় করা এবং সারাটা জীবন ঈমানের মেহনতের উপর কাটিয়ে দেওয়া। তখনই কেবল দেখতে পাবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আমাদের কত রহমত মদদ আসে।

## কম বেশির চক্কর

ঈমান কম না বেশি তা দেখো না। কেউ বলেছিল, আমরা অনেক ছোট। আরে ভাই! ছোট আবার কী? আল্লাহ ইরশাদ করেন,

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.

'আল্লাহর হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করেছে। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।'[১]

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ২৪৯

আল্লাহর রহমত নেমে এলে তিনি চড়ুই দিয়ে চিল মারতে পারেন। এ কারণে সংখ্যা ও আসবাব দেখার প্রয়োজন নেই। বরং আল্লাহর সাহায্য দেখতে হবে। আল্লাহর সাহায্য পেয়ে গেলে সফলতা অনিবার্য।

## ইসলাম ও ঈমানের মাঝে পার্থক্য

ইসলামের উদ্দেশ্য হলো আনুগত্যের জন্য তৈরি হয়ে যাওয়া। কোনো মুনাফিক প্রকাশ্যে কালিমা পড়লে তাকে মুসলমান বলা যায়। কিন্তু বাস্তবে সে ঈমানহারা হয়। ইসলাম ও ঈমানের মাঝে শুধু অবস্থাগত পার্থক্য। ইসলামের সম্পর্ক বাহ্যিক অবস্থার সাথে আর ঈমানের সম্পর্ক অভ্যন্তরীণ অবস্থার সাথে। কেউ যদি লোকদেখানো কিংবা প্রতারণাবশত কালিমা পড়ে, তাহলে তাকে প্রথমত মুসলিম মনে করা হবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে সে কখনই মুসলমান নয়। যেমন– মুনাফিকরা বলত, আমরা ঈমান এনেছি। কিন্তু

وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.

'যখন গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই আছি; আমরা তো তাদের সাথে শুধু মশকারা করে থাকি।'[১]

## মুনাফিকদের খোটা দেওয়ার ঘটনা

বনু আসাদ নামে এক কবীলা ছিল। ওই কবীলার লোকেরা নবীজির দরবারে এসে কালিমা পড়ে নিজেদের ঈমান আনার কথা বলল এবং খোটা দিতে লাগল। বাস্তবে তারা মুসলমান হয়নি। পার্থিব সুবিধা অর্জনের লোভে তারা এরকম করছিল। এজন্য তারা নবীজিকে বলতে লাগল, অন্যান্য কবীলার লোকেরা আপনার সাথে লড়াই করে পরাজিত হয়ে মুসলমান হয়েছে। আর আমরা আপনার সাথে লড়াই ছাড়াই মুসলমান হতে এসেছি। তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন,

قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'আপনি বলুন, তোমরা ঈমান আননি; বরং তোমরা বল, আমরা আত্মসমর্পন করেছি। কারণ, এখনও তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৪

তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, তবে তোমাদের কর্মফল সামান্য পরিমাণও লাঘব করা হবে না। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'[১]

এই আয়াতের কথা চিন্তা করুন। এ অনেক জরুরি যে, আমরা আমাদের মুখের দাবির সাথে-সাথে কাজের মাধ্যমে তা কতটুকু বাস্তবায়িত করছি। বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। যবান দিয়ে তো আমরা অপরকে নসীহত করছি; কিন্তু আমল দ্বারা আমরা কজনকে দাওয়াত দিচ্ছি।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

১. সূরা হুজরাত : আয়াত ১৪

# ইসলামের প্রহরী

'সাহাবীগণ থেকে এই দীন তাবেয়ীগণ শিখেছেন। তাবেয়ীন থেকে তাবয়ে তাবেয়ীন শিখেছেন। এটি একটি ইল্‌মি সিলসিলা। আমাদের পর্যন্ত এই দীন এভাবেই এসেছে। আমরা রাতের অন্ধকারে কথা বলছি না; বরং দিনের আলোতেই কথা বলছি। আমরা একটি ইল্‌মি বৃক্ষ। এটি এমন একটি ইল্‌মি সম্পর্ক যে, নবী থেকে নিয়ে আমাদের ওস্তাদ পর্যন্ত তা ক্রমধারায় পৌঁছেছে, যার ফলে আমরা দীন শিখতে পারছি।'

# ইসলামের প্রহরী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. وَالرَّبَّانِيُّوْنَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

## সৌভাগ্যের মাপকাঠি

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবীতে দুটি জিনিস নিয়ে এসেছেন। একটি হলো কিতাবের নূর; একটি অন্তরের নূর। একটি হলো আলোকিত অন্তর; আরেকটি সুসজ্জিত আখলাক। একটি হলো পরিপূর্ণ ইল্‌ম; আরেকটি পরিপূর্ণ আমল। সমস্ত জাহানের সকল সৌভাগ্য ইল্‌ম ও আমলের মধ্যে নিহিত।

## অধঃপতনের যুগ

এখন ইল্‌ম ও আমলের ঘাটতির যমানা। আমাদের বর্তমান প্রজন্ম ইল্‌ম ও আমলের বেলায় অনেক পিছিয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক দিন এ বিষয়ে চিন্তিত হতে হচ্ছে।

## সাহাবীগণের সাক্ষ্য

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীন নিয়ে এসেছেন, তা সাহাবা পর্যন্ত সঠিকভাবে পৌছিয়ে দিয়েছেন। এমনকি বিদায় হজের সময় সমস্ত সাহাবী থেকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য চেয়েছেন। তখন প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার সাহাবী নবীজিকে সত্যায়ন করেছেন। তারপর নবীজি আসমানের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। আপনি সাক্ষী থাকুন।

## নবীজির ইল্‌ম ও আমলের প্রহরী

সাহাবীগণ নবীজি থেকে দীন শিখে আমল করে দেখিয়েছেন। তাঁরা নবীজির ইল্‌ম ও আমল উভয়টিরই প্রহরী। তাঁরা এই দীনকে স্বীয় মস্তিষ্ক ও

শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ দিয়ে হেফাযত করেছেন। তাঁরা আল্লাহকর্তৃক বাছাইকরা জামাত ছিলেন। তাঁরা নবীকে যা-ই করতে দেখতেন, নিজেরা তা-ই করতেন। তাঁরা নবীর সুন্নতের এতো পাগল ছিলেন যে, তাঁদের প্রত্যেক নড়চড়, ওঠাবসা, সবকিছুই সুন্নত অনুযায়ী হতো। ভিনদেশ থেকে বিভিন্ন লোক নবীজির দরবারে আসত। কিন্তু সাহাবীগণ ও নবীজির আকৃতি, পোশাক ও ভাব-ভঙ্গিতে এত মিল থাকত যে, তাদের জিজ্ঞাসা করতে হতো, তোমাদের মধ্যে নবী কে? বাস্তব ছিল এমন যে, অনুসারী ও অনুসৃত ব্যক্তির মধ্যে এত মিল ছিল যে, বাইরের লোকেরা তা পৃথক করতে হিমশিম খেত।

## মনিব ও গোলামের মাঝে অভূতপূর্ব সাদৃশ্য

হিজরতের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবুবকর (রাযি.) মদীনায় যাচ্ছিলেন। তখন সেখানকার অভিজ্ঞ লোকেরা তাঁদের দুজনের মাঝে পার্থক্য করতে পারছিল না যে, মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আর আবুবকর (রাযি.) কে? তারা তো বাহ্যিকভাবে একে অপরের সামঞ্জস্যশীল ছিলেন। মদীনার কাছাকাছি আসার পর মদীনাবাসীরা প্রথমে আবুবকরের সাথে মুসাফাহা করতে শুরু করল। তিনিও মুসাফাহা করতে লাগলেন। তিনি মনে করেছিলেন, নবীজি এখন ক্লান্ত। একটু পর সূর্যের আলো প্রখর হওয়ার পর যখন আবুবকর (রাযি.) একখানা চাদর নবীজির মাথার ওপর মেলে ধরলেন, তখন সবাই হতবাক হয়ে গেল যে, যার সাথে নবী মনে করে এতক্ষণ মুসাফাহা করছি, তিনি নবী নন; তিনি হচ্ছেন আবুবকর (রাযি.) আর তাঁর সাথে যিনি বসে আছেন, তিনি হচ্ছেন সবার কাঙ্ক্ষিত নবী।

## হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাযি.) ও সুন্নাতের অনুসরণ

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) হজে গমন করছিলেন। পথিমধ্যে তিনি তাঁর সওয়ারী থামিয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে এমনভাবে গেলেন, যেন মনে হচ্ছিল, তিনি প্রয়োজন সারার জন্য সেখানে গেছেন। সেখানে একস্থানে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। একটু পর ফিরে এলেন। উটের ওপর উঠে পুনরায় পথ চলতে শুরু করলেন। সাথীরা তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবে ঘটনা হলো, আমি একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর জীবদ্দশায় এই রাস্তা দিয়ে সফর করেছি। তখন এস্থানে তিনি তাঁর প্রয়োজন সেরেছেন। আজ পথ চলতে আমার মন চাইল, তাঁর অনুকরণে এই জায়গায় বসি।

তাঁরা নবীজির প্রতিটি কাজ-কর্মের অনুসরণ কীভাবে করতেন চিন্তা করে দেখুন। নবীজির মুখ থেকে যা কিছু শুনতেন অথবা যা কিছু করতে দেখতেন, তাঁরা তা-ই করতেন।

## নবীজির ফরমানের প্রতি গুরুত্ব

মসজিদে নববীর একটি দরজা দিয়ে অধিকাংশ সময় নারীরা আসা-যাওয়া করত। কখনও-কখনও পুরুষরাও সেই দরজা দিয়ে গমন করত। একবার নবীজি বললেন, এই দরজাটি নারীদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হলে কত ভালো হতো! একথা শুনে সমস্ত পুরুষ সাহাবী সেই দরজা দিয়ে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) তার পর থেকে সারাজীবনে কখনওই ওই দরজা দিয়ে আসা-যাওয়া করেননি। তাঁদের প্রত্যেকটি কাজ নবীজির চিন্তা ও কর্মের বহিঃপ্রকাশ ছিল। আল্লাহ তাঁদেরকে নবীজির প্রতি এত মহব্বত দিয়েছিলেন যে, তাঁরা নবীজির প্রত্যেকটি কথা মনে রাখতেন। তাঁরা নিজ দেমাগে নবীজির কথা হেফাযত করতেন এবং শরীরে অঙ্গ-প্রতঙ্গ দ্বারা তা আমল করে সেই স্মৃতিকে আরো জীবন্ত করে তুলতেন।

## এক হাবশী সাহাবী ও সুন্নাতের অনুসরণ

এক সাহাবী হাবশায় থাকতেন। গোসল করে বের হওয়ার সময় তাঁর মনে হতো, নবীজি যেভাবে মাথার মধ্যখান থেকে সিঁথি করতেন, আমিও সেভাবে সিঁথি কাটব। কিন্তু হাবশী হওয়ার কারণে তার চুল শক্ত, কোঁকড়ানো ও ছোট ছিল। ফলে তা সম্ভব হতো না। তাই তিনি একথা মনে করে অনেক দুঃখ করতেন যে, হায়! আমার চুলের সাথে নবীজির চুলের কোনো মিল নেই। একদিন তিনি চুলার আগুনে শলা গরম করে তা মাথায় ঝুলিয়ে দিলেন। ফলে তার মাথা ও মাথার চামড়া জ্বলে গেল। মাথা জখম হয়ে গেল। জখম ভালো হওয়ার পর মাঝখানে একটি দাগ দেখতে পেলেন। সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এত কষ্ট করতে গেলে কেন? তিনি বললেন, কষ্ট হয়েছে ঠিক; কিন্তু আমার খুশি লাগছে এজন্য যে, নবীজির চুলের সাথে আমার চুলের ধরন মিলে গেছে।

## আমাদের ইল্‌মি সাজারা

সাহাবীগণ থেকে এই দীন তাবেয়ীগণ শিখেছেন। তাবেয়ীন থেকে তাবয়ে তাবেয়ীন শিখেছেন। এটি একটি ইল্‌মি সিলসিলা। আমাদের পর্যন্ত এই দীন এভাবেই এসেছে। আমরা রাতের অন্ধকারে কথা বলছি না; বরং দিনের

আলোতেই কথা বলছি। আমরা একটি ইল্‌মি বৃক্ষ। এটি এমন একটি ইল্‌মি সম্পর্ক যে, নবী থেকে নিয়ে আমাদের ওস্তাদ পর্যন্ত তা ক্রমধারায় পৌঁছেছে, যার ফলে আমরা দীন শিখতে পারছি।

## আলেমগণের মূল দায়িত্ব

আল্লাহ এই দীনের হেফাযতের দায়িত্ব এই উম্মতের আলেমগণের ওপর অর্পণ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন,

وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ

'রাব্বানি ও বিদ্বানরা।'[১]

حِبْرٌ এর বহুবচন, যার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের আলেম। তাদের মূল দায়িত্ব কী?

بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ.

'তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা এর সাক্ষী ছিল।'[২]

তাঁরা আল্লাহর কিতাব হেফাযত করবেন। যেভাবে সমুদ্রের ব্রীজের ওপর চৌকি বানিয়ে নিরাপত্তারক্ষী তা পাহারা দেয়, ঠিক তেমনি আলেমগণ কুরআনের প্রত্যেক আয়াত জানবাজি লাগিয়ে হেফাযত করেন। আলেমগণ কাউকে কোনো আয়াতের বাহ্যিক অবস্থা পরিবর্তন করার এজাযত তো দেন না। আবার কাউকে কোনো অর্থ ভুল করে উপস্থাপনেরও অনুমতি দেন না। যদি কেউ এমন দুঃসাহস দেখায়, তাহলে তারা হক ও বাতিলকে পাথর্ক্য করে দেখিয়ে দিবেন। তাদের কর্তব্য হলো, উপরওয়ালা থেকে ইল্‌ম শিখে আগতদের তা শিক্ষা দিবেন। এভাবেই এই দীন উম্মতের মাঝে অব্যাহত আছে।

## তরুণ প্রজন্ম

মাদরাসায় যা পড়ানো হয়, তা বর্তমান যমানার নতুন আবিস্কৃত কোনো কিছু নয়। বরং এটি পূর্বসূরীদের শিখিয়ে দেওয়া সেই বিষয়, যা পরবর্তীদের শিখানো হচ্ছে। এ কারণে প্রত্যেক মুমিনের ওপর দুটি দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। প্রথমত, নিজে দীন শিখবে। দ্বিতীয়ত, অন্যকে তা শেখাবে। কিন্তু

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৪

২. সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৪

আজ প্রজন্মকে ফিরিঙ্গি সংস্কৃতির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সকালে শত-শত বাচ্চা সুন্দর করে সেজে-গুজে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে। এদের মধ্যে কজন এমন আছে, যারা তাফসীর, হাদীছ বা ইল্‌ম শিক্ষার জন্য যাচ্ছে? এগুলোর সাথে তাদের কোনো সম্পর্কই গড়ে উঠছে না।

আমরা আমাদের সন্তানদের ইংরেজি কেন শেখাই? এজন্য যে, এটি জীবনের জন্য প্রয়োজন। আর আমরা তাদেরকে দীনের ইল্‌ম কেন শিখাই? এজন্য যে, এটি হচ্ছে জীবনের মূল উদ্দেশ্য। কেমন আশ্চর্যজনক কথা যে, জীবনের প্রয়োজন শিক্ষা দেওয়ার জন্য সারা জীবন নিয়মাতান্ত্রিকভাবে প্রতিদিন তাদের বাইরে পাঠাচ্ছি। কিন্তু জীবনের মূল উদ্দেশ্য শেখানোর প্রতি কোনো মনোযোগই দিচ্ছি না। স্কুল-কলেজের শিক্ষার মতো দীন শিক্ষার কোনো ব্যবস্থাই হচ্ছে না। আমাদের বর্তমান প্রজন্ম দীন শুনে-শুনে শিখছে। মনে রাখবেন, এর দ্বারা দীনের শিকড় মজবুত হয় না। এ কারণেই তারা ক্রমে ভিনদেশি সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

انہوں نے دیں کہاں سیکھا بھلا جا جا کے مکتب میں
پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں

'তারা আবার অফিসে গিয়ে-গিয়ে দীন কী করে শিখে ফেলল?
বড় হলো কলেজে পড়ে-পড়ে, মারা গেল বসের অফিসে!'

সবাই দীন ও দুনিয়া সমান হওয়ার স্লোগান দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে তারা পুরো সময়টা দুনিয়ার শিক্ষার জন্য ব্যয় করছে। বাচ্চাদের ছোট বেলায় কিছু দিন কুরআন শরীফ পড়ানোকে দীন শিক্ষার জন্য যথেষ্ট বলে মনে করছে। এর দ্বারা সফলতা লাভ হবে না।

## বি.এ পাশ যুবতীর করুণ অবস্থা

আমাদের জামেয়াতে ২২ বছরের বি.এ পাশ করা এক তরুণী এল। সে জামেয়ার প্রিন্সিপালকে বলল, আমার মা আমাকে বিবাহ দিতে চাচ্ছেন। আমি আপনার কাছে ফরজ গোসল শিখার জন্য এসেছি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কি নয় বছরের বালেগা হননি? সে বলল, হাঁ, হয়েছি। পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এতোদিন আপনি কিভাবে গোসল করেছেন? তরুণী বলল, সবাই যেভাবে করে, আমি সেভাবেই করেছি। ফরজ গোসলের নিয়ম মেনে কোনো গোসল করিনি।

এখন আপনারা বলুন, দীর্ঘ বছর পযর্ন্ত সে বালেগা হওয়ার পর থেকে ফরজ গোসল করেনি। এখন এই দীর্ঘ সময় তার নাপাকি অবস্থায় যে সময়গুলো কেটেছে, তার দায়ভার কে নিবে? অথচ সে নামাযও পড়ে। তেলাওয়াতও করে। কিন্তু তার গোসলই ঠিক হয়নি। এখন এই গোনাহ কার হবে? অবশ্যই তার মাতাপিতার হবে।

## মা-বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ

আমাদের কর্তব্য হলো, আমরা আমাদের সন্তানদের সামনে তাদের জন্য আমলী নমুনা হয়ে যাই এবং তাদেরও দীন শেখাই। তাদেরকে এখন দীন না শেখালে কেয়ামতের দিন তারা আমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে মকদ্দমা পেশ করবে। কুরআনে এ বিষয়ে প্রমাণ পাওয়া যায়। ইরশাদ হয়েছে-

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ

'তারা আরো বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং তারা-ই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে।'[১]

মুফাসসারিগণ লিখেছেন, এই আয়াতে মাতাপিতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মেয়ে আল্লাহকে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! মা-বাবা আমাকে বলেছিলেন, কম্পিউটার কোর্স করে ফেলো। ডাক্তার হও, এম.এ পাশ করো। তারা তো দীনের কথা বলেননি। তারা আমাকে যদি এর সাথে-সাথে বলতেন, কুরআন শেখো, নবীর সুন্নত ও হাদীছের ইল্‌ম অর্জন করো, তাহলে আমরা তা-ই করতাম। তারাই তো এই রাস্তা থেকে আমাকে সরিয়ে দিয়েছে।

رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

'হে আল্লাহ! আপনি তাদের আজ ডাবল শাস্তি দিন এবং তাদের উপর আপনার লা'নত বর্ষণ করুন।'[২]

এখন বলুন, যখন আমাদের সন্তানরাই আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে, দ্বিগুণ আযাব দেওয়ার সুপারিশ করবে এবং লানত বর্ষণ করার আবেদন জানাবে, তখন আমাদের নামায কোন কাজে আসবে? এজন্য তাদের দীন শেখানো আমাদেরই দায়িত্ব।

---

১. সূরা আহযাব : আয়াত ৬৭

২. সূরা আহযাব : আয়াত ৬৮

## দীন হেফাযতের মূল কারণ

প্রত্যেক যমানাতেই দীনের ওপর হামলা হয়েছে। কখনও কাফিরদের পক্ষ থেকে আবার কখনও ভিতেরর মুনাফিকদের পক্ষ থেকে। কিন্তু আলেমগণই সেসব হামলা প্রতিহত করেছেন। তারা স্বীয় জান-মাল কুরবানি করে দীনের হেফাযত করেছেন। এ কারণেই আজ দীর্ঘ ১৪০০ বছর পরও দীন তার মূল বুনিয়াদের ওপর টিকে আছে। এই দীন আমাদের পর্যন্ত শুধু হালুয়া-রুটি ভক্ষণের মাধ্যমে আসেনি বরং কুরবানির বদৌলতে এসেছে।

## নবীজির দরদ ও ব্যথা

সাহাবীগণের কাছে দীন পৌঁছাতে গিয়ে নবীজিকে কত কষ্ট করতে হয়েছে! একটু কিতাব খুলে দেখুন, আমাদের নবীজির এ কারণে রাতে ঘুমও আসত না। বুক ধড়ফড় করত। স্বয়ং আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন। আল্লাহ বলেন–

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

'হে রাসূল! আপনি রবের হুকুমের উপর ধৈর্য ধারণ করুন। আপনি আমার সামনেই আছেন।'[১]

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

'আর আপনি আপনার রবের জন্য ধৈর্যধারণ করুন।'[২]

وَ اصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّ الَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ ۝

'আপনি ধৈর্যধারণ করুন। আপনার ধৈর্য আল্লাহরই সাহায্যে। আপনি তাদের দরুন দুঃখ করবেন না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সৎকর্মপরায়ণ।'[৩]

কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা তো এ রকম হতো যে, রাতে তিনি কেঁদে-কেঁদে বুক ভাসাতেন এবং লম্বা-লম্বা সেদজা করতেন। অনেক দিন এমন হয়েছে যে, ক্রমাগত রাতে নিদ্রাহীন থাকতেন

---

১. সূরা তূর : আয়াত ৪৮

২. সূরা মুদ্দাছছির : আয়াত ৭

৩. সূরা নাহল : আয়াত ১২৭, ১২৮

আর তাঁর চোখ মোবারক থেকে মুক্তার ন্যায় জ্বলজ্বল করে অশ্রু ঝরত। আবার তিনি লম্বা-লম্বা সিজদা করেও রাত কাটিয়ে দিতেন।

## আবুজাহ্‌লের প্রতি ইসলামের দাওয়াত

কিতাবে লেখা হয়েছে, নবীজি আবুজাহ্‌লের ঘরে তিন হাজারবার তাশরীফ নিয়েছেন। একবার প্রবল ঝড় ও বৃষ্টির সময় আবুজাহ্‌লের ঘরের দরজায় করাঘাত পড়ল। আবুজাহ্‌ল ঘর থেকে স্বীয় স্ত্রীকে বলল, মনে হয় আজ এ ঝড়ের সময় কোনো চরম অভাবগ্রস্ত লোক এসে হাজির হয়েছে। আচ্ছা, দেখো তো, সে কোথা থেকে এসেছে? আমি তাকে সাহায্য করব। আবুজাহ্‌ল বাইরে এসে দেখলেন, নবীজি দাঁড়িয়ে আছেন। আবুজাহ্‌ল বলল, আপনি এ সময়ে এসেছেন? নবীজি বললেন, আমার মনে হয়েছে, আল্লাহ এই মুহূর্তে আপনার অন্তরকে দীনের জন্য বিগলিত করে দিবেন।

## সবরের শেষ সীমা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার বাজার দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। কিছু যবুক তাঁকে দেখে বলল, আচ্ছা, এই সেই ব্যক্তি, যিনি আমাদের মাবুদকে মন্দ বলে। তখন তারা নবীজিকে ঘেরাও করল। তাদের মধ্যে এক পাপিষ্ঠ নবীজির পাগড়ি ধরে টান দিল। কেউ তাঁর চাদর মুবারক টেনে ধরল। কেউ কাপড় ধরে টানা-হেঁচড়া করতে লাগল। তারা নবীজিকে খুব কষ্ট দিল। তাদের একজন নবীজির চেহারা মুবারকে থুতু মারল। তাকে দেখে অন্য আরেকজনও থুতু মারল। এমনকি সবাই তাকে থুতু মারতে শুরু করল। এখানেই তারা ক্ষান্ত হলো না। তাদের একজন মাটি তুলে নবীজির চেহারা মুবারকে ছুড়ে মারল। ফলে নবীজির নূরানী চেহারায় দাগ পড়ে গেল।

তারপর তারা নবীজিকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, আমরা আপনাকে আবারো বলছি, আপনি কিভাবে আমাদের মাবুদকে মন্দ বলেন? একথা জিজ্ঞাসা করে এসব অসভ্য ছেলেরা চলে গেল। নবীজির বড় কন্যা যয়নব (রাযি.) এ খবর জানতে পেরে দ্রুত পানি নিয়ে এলেন। নবীজির চেহারায় জখম দেখতে পেয়ে তাঁর চোখে পানি চলে এল। নবীজি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বেটি! তুমি কেঁদো না। যে দীন নিয়ে তোমার পিতা আগমন করেছেন, এমন একটি দিন আসবে, যেদিন এই দীন কাঁচা-পাকা প্রতিটি ঘরে পৌঁছে যাবে।

## মেয়ে হবে তো এমনই হওয়া চাই!

নবীজি অনেক সময় অনাহারে কাটিয়ে দিতেন। একবার ফাতেমা (রাযি.) ঘরে খাবার খাচ্ছিলেন। নবীজির কথা মনে পড়তেই অর্ধেক রুটি পেঁচিয়ে নবীজির কাছে নিয়ে গেলেন। নবীজি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আব্বাজান! সবার জন্য রুটি বানিয়েছিলাম। আমি খাওয়া শুরু করলে হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়ল। আপনি কী অবস্থায় আছেন, খেয়েছেন কিনা একথা চিন্তা করে আপনার জন্য রুটি নিয়ে এসেছি। আমি অর্ধেক খেয়ে বাকি অর্ধেক রুটি আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। এটি আপনার জন্য হাদিয়া।

আল্লাহ এরকম কন্যা সবাইকে দান করুন। নবীজি রুটির একটি টুকরা মুখে দিয়ে বললেন, যাঁর হাতে আমার জান, তাঁর কসম করে বলছি, আজ তিন দিন হলো আমার মুখে কোনো খাবার ঢোকেনি। আল্লাহর নবী কত কষ্ট করেছেন এই দীনের জন্য!

## হযরত বিলাল (রাযি.)-এর ওপর যুলুম

সাহাবীগণকেও এই দীনের জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। বিলাল (রাযি.)কে কেমন নির্যাতন করা হয়েছিল! প্রখর রোদের তাপে বালুর ওপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর বুকের ওপর ভারী পাথর রাখা হতো। তারপরও তিনি আহাদ আহাদ বলে চিৎকার করতেন।

## হযরত যানীরা (রাযি.)-এর ওপর যুলুম

সাইয়্যেদা হযরত যানীরা (রাযি.)-এর উপর এত অত্যাচার করা হয়েছে যে, তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। আবুজাহ্‌ল তাঁকে বলতে লাগল, দেখো, লাত-ওজ্জা তোমার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে। সাইয়্যেদা হযরত যানীরা (রাযি.) এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু আবুজাহ্‌লের উপরোক্ত কথা শুনে তিনি বিলাপ করে কেঁদে ফেললেন। তিনি কাঁদতে-কাঁদতে স্বীয় ঘরে গিয়ে সিজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন, হে পরওয়ারদেগার! তারা মেরে আমার চোখদুটি নষ্ট করে দিয়েছে। আমি আপনার জন্য সব কষ্ট সহ্য করে নিয়েছি। এখন তারা আমাকে এই বলে খোঁচা দিচ্ছে যে, লাত-ওজ্জা আমার চোখ নষ্ট করে দিয়েছে। হে মালিক! দৃষ্টিশক্তি দেওয়া ও ছিনিয়ে নেওয়া যখন তোমারই হাতে, তুমি আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দাও। তারপর তিনি সিজদা থেকে উঠতে-না-উঠতেই দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান। সুবহানাল্লাহ!

## দীনের দুশমনের সামনে সিসার প্রাচীর

এই দীন নবীজি থেকে সাহাবী হয়ে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই ক্রমধারা প্রত্যেক যমানাতেই একইভাবে চলে আসছে। বিভিন্ন সময়ের দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা এর ওপর হস্তক্ষেপ করতে চেয়েছে। তারা এই দীনকে তাদের মর্জিমতো চালানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু আল্লাহ প্রাচীরের ন্যায় দৃঢ়পদ আলেমগণকে এর মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, কখনওই এমন হতে পারে না। তোমরা কখনওই এই দীনের মধ্যে রদবদল করতে পারবে না। এজন্য অসংখ্য আলেমকে কুরবানি দিতে হয়েছে।

## সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রাযি.)-এর দৃঢ়তা

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সামনে সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) দাঁড়িয়ে আছেন। হাজ্জাজ তাঁকে বলছেন, আমি তোমাকে এখন আগুনে ফেলব। কিন্তু দৃঢ়তার পাহাড় সাঈদ ইবনে যুবায়ের (রাযি.) বললেন, আমি তোমাকে জাহান্নামের মালিক মনে করি না। হাঁ, তিনি এমনি সাহসী ছিলেন। যালিম শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি হক কথা বলেছিলেন।

## ইমাম আবুহানিফা (রহ.)-এর ওপর যুলুম

ইমাম আবুহানিফা (রহ.)-এর মরদেহ জেল থেকে বের করা হয়েছিল। তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল। শাসকগোষ্ঠী জনতার ক্ষোভ ও রুদ্ররোষের ভয়ে তাঁকে সামান্য বিষ খাইয়ে দিয়েছিল। বেশি মাত্রায় বিষ দেওয়ার সাহস পায়নি।

## ইমাম মালিক (রহ.)-এর সাহস

ইমাম মালিক (রহ.) তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর মনমতো ফতোয়া না দেওয়ায় তাঁকে গাধার ওপর বসিয়ে চেহারায় মল মেখে পুরো শহর প্রদক্ষিণ করানো হয়। মদীনা মুনাওয়ার ইমাম ও ফকীহকে এভাবেই অপমান করে চেহারায় ময়লা মেখে মদীনার রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরানো হয়। তখন ইমাম মালিক (রহ.) বলেছিলেন, হে লোকসকল! তোমাদের মধ্যে যে আমাকে মালিক বলে চিনে, সে তো আমাকে চিনেছেই। আর যে আমাকে চিনেনি, সে যেন চিনে রাখে। আমি আনাসের ছেলে মালিক।

দীনের ব্যাপারে তাঁরা কখনওই তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করতেন না।

## ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)-এর ওপর যুলুম

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহ.)কে খলকে কুরআনের মাসআলার জন্য এত শক্ত বেত্রাঘাত করা হয় যে, ওই বেত্রাঘাত হাতিকে করা হলে হাতি মরে যেত। তাঁর শরীরে যেখানে বেত্রাঘাত করা হয়, সেখানের গোশত মরে গিয়েছিল। সেই গোশত কাঁচি দিয়ে কেটে মলম লাগানো হয়েছিল।

## ঈমানের চেরাগের প্রজ্বলন

দীনকে মিটানোর জন্য কাফিররা যতই চেষ্টা করেছে, আল্লাহ তারপরও ঈমানের চেরাগকে প্রজ্বালিত করে রেখেছেন।

شکستہ دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا

در قفس جو دانہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا

'ভগ্নহৃদয় থেকে 'আহ' বের হয়। তাতে শুধু যমীন নয়; আরশও কেঁপে ওঠে। খাঁচায় যদি প্রশস্ততা না থাকে, তবে একদিন তা ভেঙে ফেলা হবে।'

کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جواب رکے گا

چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا کرے گا

'কারো বাধার কারণে সত্যের আহ্বান কখনও প্রতিহত হয়নি; আজও হবে না। ঈমানের প্রদীপ ঝঞ্ঝায়ও জ্বলেছে এবং জ্বলতেই থাকবে।'

ইংরেজদের শাসনামলে মুসলমানদের সাধারণ কোনো আসবাব-উপকরণও ছিল না। আলেমগণ চাটাইয়ে বসে দিন কাটিয়ে দিতেন। মানুষ নিজের অভাবকে বরদাশত করতে পারে; কিন্তু স্বীয় সন্তানের অভাবকে বরদাশত করতে পারে না। কিন্তু তখনকার আলেমগণ নিজেরা চাটাইয়ে বসে দিনাতিপাত করে গেছেন আবার নিজের সন্তানদেরও এভাবে জীবন কাটানোর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে গেছেন, যেন তাঁরা এই চাটাইকেই পছন্দ করেছেন। এটি সাধারণ কোনো কুরবানি নয়। তারা প্রতি কদমে সাধারণ মানুষকেও দেখিয়ে দিয়েছেন, আমরা এই দীনকে বুকে ধারণ করে রেখেছি।

## ভারত উপহাদেশে ফিরিঙ্গিদের যুলুম

১৮৫৭ সনের আযাদীর লড়াইয়ে ইংরেজরা বিজয় অর্জন করার পর মুসলমানদের শিকড় কেটে দেয়। তাঁরা বলল, তিনটি কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের আন্দোলন শেষ করে দেওয়া যাবে।

১. মুসলমানদের থেকে কুরআন ছিনিয়ে নিতে হবে।

২. আলেমগণকে শেষ করে দিতে হবে।

৩. সাধারণ মানুষকে ইংরেজি শিক্ষা এমনভাবে দিতে হবে যে, যাতে তারা মন-মানসিকতা ও চিন্তাধারায় ইংরেজ হয়।

তারপর যথারীতি ইংজেরা কুরআন মাজীদের লক্ষ-লক্ষ কপি বাজেয়াপ্ত করে। তারপর আলেমগণের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৪ হাজার আলেমকে ফাঁসি দেয়। 'ইংরেজ কে বাগী মুসলমান' নামক কিতাবে লিখা আছে, দিল্লী থেকে পেশাওয়ার পর্যন্ত জি.টি. রোডে এবং বড়-বড় গাছে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়। ওগুলোর মধ্যে হাজার-হাজার আলেমকে ফাঁসি দিয়ে লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়। কয়েকদিন যাবত লাশগুলো এভাবেই ঝুলিয়ে রাখা হয়, যাতে সাধারণ মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়। তারা যাতে কাউকে আলেম না বানায়।

বাদশাহী মসজিদের দরজায় ফাঁসির কাষ্ঠ ঝুলিয়ে দায়িত্ব বদল করে একের-পর-এক আলেমকে ফাঁসি দেওয়া হতো। এক আলেম ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা হতো। তাঁর দেহ নিথর হয়ে গেলে অন্য আলেমকে ধরে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। আযাদ কাশ্মিরের বাগানে মাঙ্গ এলাকায় একটা গাছ এখনও আছে, যে গাছে দুজন বড় আলেম হযরত সবয আলী এবং রামালীকে ঝুলিয়ে জীবিত অবস্থায় তাদের শরীর থেকে চামড়া তুলে নেওয়া হয়েছিল। আমি ওই গাছটি দেখেছি।

## একটি বেদনাদায়ক সফর

মাওলানা জাফর থানেশ্বরী (রহ.) স্বীয় কিতাব 'তারিখে কালাপানী' তে লিখেছেন, আমাদের আলেমগণের একটি কাফেলা ছিল। ইংরেজরা এই কাফেলাকে দিল্লী থেকে লাহোর পাঠায়। ওই ইংরেজরা উক্ত কাফেলার আলেমগণের হাতে শুধু হাতকড়া পরিয়ে দেয়, যার ফলে তাঁরা স্থিরভাবে লাহোর গিয়ে পৌছান। কিন্তু লাহোররের জেলখানায় ইনচার্জ বড় কঠোর প্রকৃতির লোক ছিল। সে বলল, এ মৌলবীরা এতো আরাম করে এখানে এসে পড়ল! এখন আমি এদের বোঝাব, এরা আমাদের সাথে কেমন গাদ্দারি করছে। তারপর সে রেলগাড়ির ভিতরের কেবিনে চারপাশে পেরেক লাগায় এবং সেখানে ওই আলেমগণকে বসিয়ে দেয়। এক-দু ইঞ্চি ফাঁকা করে পেরেক লাগানো হয়েছিল। রেলগাড়ি চলার সময় ঝাঁকুনি দিলে ওই পেরেকগুলো আমাদের শরীরে গেঁথে যেত। চলার সময় আমরা টের পেতাম

না, গাড়ি ব্রেক করছে কিনা। তবে ব্রেক করার সময় ওই একই জায়গায় তা বারবার বিঁধে যেত। ফলে শরীর থেকে ঘামও বের হতো আবার রক্তও বের হতে লাগল। আমাদেরকে লাহোর থেকে মুলতান পাঠানো হচ্ছিল। আমরা ওই সফর পুরোটা রাত-দিন বসে-বসেই কাটাতাম। আমাদের পেশাব-পায়খানা সব সেখানেই হতো। কিন্তু আমাদের পানিও দেয়া হতো না, যার য়লে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল।

এই কঠিন শাস্তি আমাদের এজন্যই দেওয়া হয়েছে, আমরা যাতে ওই ফিরিঙ্গিদের কথা মেনে নেই। কিন্তু আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে, কুরবানি দিতে হয়েছে; তারপরও তাদের কথা মেনে নিতে পারিনি। তিনি বলেন, এক মাসের দীর্ঘ সফরের পর যখন আমরা মুলতান পৌঁছলাম, তখন সেখানকার হাকিম বলল, এদের আগামীকালেই ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। আমরা ফাঁসির কথা শুনে আনন্দিত হয়ে যাই। পরের দিন আমাদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য এল। তখন আমাদের চেহারা উজ্জ্বল ছিল। কেননা, আমাদের কষ্ট-ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। আমাদের সজীব চেহারা দেখে তারা বলতে লাগল, তোমাদের চেহারা এতো ফ্রেশ কেন? আমাদের একজন জবাব দিল, আপনি আমাদের ফাঁসি দিবেন, তাই আমাদের চেহারা এমন ঝলমল করছে। আমাদের ফাঁসি দিলে আমরা শাহাদাত অর্জন করব।

সে ভিতরে গিয়ে তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাল। সে বলল, এরা সবাই ফাঁসি দেওয়ার খবর শুনে খুশী। তারপর সে ফিরে এসে ঘোষণা দিল, তোমরা খুশি হয়ে মৃত্যু কামনা করছ; কিন্তু আমরা তোমাদের মৃত্যুদণ্ড দেব না। আমাদের সিদ্ধান্ত হলো, আগামীকাল তোমাদেরকে কালাপানি পাঠিয়ে দেব। সেখানে পৌঁছে মাওলানা জাফর থানেশ্বরী (রহ.) একটি কবিতা লিখেন–

مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا
کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی

'বাড়ি ফেরার যোগ্যকে বন্দীর আদেশ দেয়া হয়েছে।
কী-ইবা বলব, মুক্তি পেতে-পেতে আর মুক্তি হলো না।'

## সবরের কঠিন মুহূর্ত

তিনি বলেন, তারা আমাদেরকে কালাপানি পাঠিয়ে দেওয়ার পর আমরা আরো বেশি পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম। সেখানে তারা আমাদের হাতে-পায়ে

বেড়ি পরিয়ে আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের আমাদের সামনে ডেকে এনে তাদের বলল, তোমরা এদের সবাইকে বলে দাও, যদি এরা আমাদের মেনে নেয়, তাহলে তোমাদের সাথে পাঠিয়ে দেব।

এখন আমাদের স্ত্রী, কন্যা ও পুত্র সবাই কাঁদতে লাগল। আমার এক শিশুপুত্র আমার বুকে লেগে বলতে লাগল, আব্বু! তুমি একথা কেন তাদের বলে দাও না? তুমি আমাদের সাথে ঘরে যেতে পারবে। তিনি বলেন, এই পরীক্ষার চেয়ে বড় পরীক্ষা আমার জন্য আর কিছু ছিল না। আমি আমার স্ত্রীকে ইশারা দিয়ে ডেকে বললাম, এই পুত্রকে বলে দাও, তোমার পিতার জীবন বাকি থাকলে এমনিতেই মুক্তি পাবে। অন্যথায় কেয়ামতের দিন হাউজে কাওছারের প্রাঙ্গণে আবার দেখা হবে। আমি সালাম করি ওই আলেমগণের প্রতি, আমি শ্রদ্ধা জানাই তাঁদের ইসতিকামাতের প্রতি, যাঁরা অসহনীয় কুরবানির মাধ্যমে দীনের হেফাযতে ভূমিকা রেখেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! এই দীন এখন আমাদের কাছে সংরক্ষিত অবস্থায় আছে।

## নারী শিক্ষার গুরুত্ব

বর্তমান প্রজন্মের কাছে দীন পৌঁছানোর সর্বোত্তম পন্থা হলো নিজেদের মেয়েদের দীনের শিক্ষা দেওয়া। এই অধম দায়িত্ব নিয়ে বলেছে, যদি কারো এক ছেলে ও এক মেয়ে এবং তার শুধু এক সন্তানকে পড়াশোনা করানোর সামর্থ্য থাকে, তাহলে আমি বলছি, আগে আপনি মেয়ে সন্তানকে দীনের শিক্ষা দিন। কেননা–

مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا

'পুরুষ পড়েছে তো ব্যক্তি পড়েছে, নারী পড়েছে তো বংশ পড়েছে।'

কারণ, কোনো মেয়ে দীনের শিক্ষা অর্জন করলে পুরো ঘরে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে।

## সন্তানের বিগড়ে যাওয়ার কারণ

বর্তমানে যেহেতু ঘরে মেয়েদের খুব কম দীনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, এ কারণেই সন্তানরা বিগড়ে যাচ্ছে। আজকালের পিতারা চোখ পাকিয়ে মেয়েদের ঘরের পাবন্দ বানিয়ে ফেলেন। কিন্তু ছেলেদের ওপর পিতার কোনো হুকুম চলে না। যে ঘরেই দেখবেন, আপনি সন্তানকে পিতার অবাধ্য দেখতে পাবেন। তখন পিতা কেঁদে-কেঁদে বলে, না সে পড়ালেখা করছে, না ঘরের কাজ-কর্ম করছে, না আমার কথা শুনছে। এর কারণ কী? এর মূল কারণ হলো, তাকে দীনের শিক্ষা দেওয়া হয়নি।

## নারী শিক্ষার বড় বাধা

মেয়ে মাদরাসায় পড়ার জন্য রাজী হলে মা-বাবা তাকে নিষেধ করে। অবাক লাগে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসে মেয়ে একা থাকে, অথচ সেখানে নিরাপত্তার কোনো গ্যারান্টি নেই। অপরদিকে দীনি পরিবেশে থেকে মেয়ে পড়ালেখা করতে চাইলে তাকে নিষেধ করা হয়। তাকে বলা হয়, মানুষ মেয়েকে মাদরাসায় দিয়েছেন? এ রকম আরো অনেক কথা। এটা একমাত্র ভিতরের ব্যাধি। শয়তান কখনও এ কাজ করতে দেয় না।

## নবীর উত্তরাধিকারের হেফাযত

আমাদের এখন নিয়ত করা উচিত, সন্তানদের যথাযথভাবে দীন শেখাব। এর মাধ্যমে আমরা নবীর আনীত ওই দীনের হেফাযতের অংশীদার হব, যার কারণে তিনি চোখের অশ্রু ফেলেছেন, যার কারণে তাঁর দেহ মুবারক থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে। এই দীনের হেফাযতের কারণে আমরা কেয়ামতের দিন রক্ষা পাব।

## মুসলমানের দুর্বলতা

আমরা শুধু সন্তানদের দীনের শিক্ষা-ই দেব না; বরং তাদেরকে আগে দীন পৌঁছানোও শিক্ষা দেব। নবীজি ইরশাদ করেন,

بَدَأَ الإِسْلَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُوْدُ كَمَا بَدَأَ

মানুষ এই হাদীছের অর্থ এভাবে বুঝেছে যে, ইসলাম দুর্বল হয়ে যাবে। না, না। ইসলাম কখনওই দুর্বল নয়। বরং আজও ইসলাম শক্তিশালী। কিন্তু মুসলমান জাতি দুর্বল। ইসলাম এখনও সাহাবাদের যমানার মতো শক্তিশালী রয়েছে। আজ আমাদের কাছে কুরআন, হাদীছ, সুন্নত সব কিছুই আছে। কিন্তু এগুলো আমাদের কোনো কাজে আসছে না। এর কারণ হলো, ইংরেজদের শিক্ষার অনুকরণের জন্য নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত সবাই প্রস্তুত। কিন্তু মাদরাসার জন্য কেউ এগিয়ে আসে না। এখন বলুন, এই দীন বেকার হলো কিনা? মুসলমানদের ঘরেই নবীজির সুন্নত যবেহ করা হচ্ছে। অথচ এ বিষয় নিয়ে দুঃখ করার কেউ নেই। পুত্র কোনো বিষয়ে ফেল করলে পিতা তাকে ঘর থেকে বের করে দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়; অথচ ওই সন্তানই সুন্নত না মানলে, ফরজ নামায না পড়লে এবং জুমুার নামাযে মসজিদে না গেলে পিতা তাকে ঘর থেকে বের করে দেয় না।

যে সন্তান হালাল-হারাম বাছাই না করে বেশি-বেশি উর্পাজন করতে পারবে, সে মা-বাবার কাছে চোখের মণি হয়ে থাকে। আজ আমাদের এই অবস্থা বিরাজ করছে। এজন্য আমরা দায়িত্ববোধ নিয়ে নিজেরাও দীন শিখি এবং অন্যকেও শিখতে উৎসাহিত করি।

## দীন হেফাযতের দূর্গ

এই জামিয়া বর্তমানে দীন হেফাযতের একটি দুর্গ। আপনাদের ছেলেমেয়ে সবাইকে এখানে দীন শিক্ষা করার জন্য পাঠাবেন। এই জামেয়ার সহযোগিতা করবেন। কারণ, আল্লাহ বলেন,

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ.

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যে এগিয়ে আস; আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে দৃঢ়পদ করে দিবেন।'[১]

এর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? আল্লাহ মাফ করুন। আল্লাহর খাযানা কি চোর বা ডাকাতের কবলে পড়েছে যে, তাকে রক্ষা করতে হবে? না বরং এর অর্থ হলো, তোমরা আল্লাহর দীনের সাহায্য করলে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের তিনি দৃঢ়পদ রাখবেন। আজ সবাই আল্লাহর সাহায্য অনুভব করতে পারছে না। কেন? এ কারণে যে, আমরা তাঁর দীনের সাহায্যকারী হইনি। আল্লাহর সাহায্য বুঝতে হলে আগে আমাদেরকে তার দীনের সাহায্যকারী হতে হবে। আমাদের সন্তানদেরও দীনদার বানাতে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমাপ্রাপ্ত লোকদের কাতারে শামিল করে নিন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

১. সূরা মুহাম্মদ : আয়াত ৭

# দৃঢ়তার ফযীলত

'কিছু বস্তু হালকা হয় এবং প্রবহমান স্রোতে পানির সাথে ভেসে যায়। যেমন- কাগজ, লাকড়ি, ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদি। কিন্তু কিছু বস্তু আছে, যেগুলো পানির স্রোতে ভেসে যায় না; তারা-ই বরং পানির মোড়কে ঘুরিয়ে দেয়। আমরা মুমিন। তাই আমাদেরকে ঘাস, লতা-পাতার মতো হালকা হলে চলবে না; বরং দ্বিতীয় ভারী বস্তুর মতো হতে হবে। আমাদেরকে পানির দিক পরিবর্তন করে দিতে হবে।'

# দৃঢ়তার ফযীলত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. نُزُلًا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ.

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

## শরীয়তের ওপর চলতে গিয়ে তিন রকমের বাধা

শরীয়ত ও সুন্নতের ওপর চলতে গিয়ে মানুষ তিন রকমের বাধার সম্মুখীন হয়। প্রথম বাধা হলো নফসের পক্ষ থেকে। নফস চায়, তার ইচ্ছা পূরণ হোক যেমন বাচ্চারা ইচ্ছা পূরণের জন্য জিদ করে।

দ্বিতীয় বাধা হলো শয়তানের পক্ষ থেকে। সে মানুষকে নেকী থেকে হটিয়ে মন্দ কাজের দিকে আহ্বান করে। মানুষের সামনে শয়তান গোনাহকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে পেশ করে। যথা- সে সুদগ্রহণকারীকে এই বলে ধোঁকা দেয় যে, তোমার এই সুদ দরকার নেই বটে; কিন্তু বউ-বাচ্চার পেট পালা তো ফরজ। তাই এই সুদ তাদের কাজে লাগবে। যেন শয়তান সুদের গোনাহকে তাদের সামনে হালকা করে পেশ করে। মানুষ মিথ্যা বলে আর শয়তান বোঝায়, কোনো সময় অসুবিধা দূর করতে মিথ্যা বলা জায়েয। এভাবে আস্তে-আস্তে মানুষের মিথ্যা বলার অভ্যাস হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তার নাম মিথ্যাবাদীদের তালিকাভুক্ত করে দেন। শয়তান মানুষকে যার-যার অবস্থান অনুযায়ী ধোঁকা দেয়। দুনিয়াদারকে দুনিয়ার মতো করে এবং দীনদারকে তার অবস্থানের ওপর ভিত্তি করে ধোঁকা দেয়। ইমাম গাযযালি (রহ.) বলেন, শয়তান এমন এক দুশমন, যে না সুদ গ্রহণ করে, না কোনো সুপারিশ গ্রহণ করে। এমন কখনও হয় না যে, আপনি শয়তানকে ঘুষ

দিচ্ছেন বা তার কথামতো কাজ করে তার থেকে পানাহ চাইবেন আর সে আপনাকে ভবিষ্যতে কখনও ধোঁকা দিবে না।

তৃতীয় বাধাটা আসে মানুষের পক্ষ থেকে। কখনও আত্মীয়-স্বজন ঢনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কারো ব্যক্তিত্ব বা আকৃতি ভালো লেগেছে, তো তা অন্তরে গেঁথে যায়। এখন সারাদিন তার কথা অন্তরে জাগতে থাকে। কখনও ঘরওয়ালাও ঢনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কেউ চায়, আমার চেহারা সুন্নত অনুযায়ী রাখব, তো তার স্ত্রী তাকে বাধা দেয়। কোনো ঘরে মা-বাবা চান, ঘরে টিভি থাকবে না। কিন্তু সন্তান টিভি বের করতে দেয় না।

এরা বাহ্যিকভাবে অনেক কাছের হয়, কলিজার টুকরা হয়, চোখের শীতলতার কারণ হয়; কিন্তু বাস্তবে এরা তার সাথে দুশমনি করছে। এরা তাকে শরীয়তের বিপরীত কাজে উদ্বুদ্ধ করতে চাচ্ছে। এই তিন বাধা দূর করে শরীয়তের ওপর চলাকে মুজাহাদা বলা হয়। এই মুজাহাদা মুমিন লোকের সারা জীবনই করতে হয়।

## ইসতিকামাতের অর্থ

ইসতিকামাতের অর্থ হলো, কোনো কিছুর ওপর দৃঢ়ভাবে টিকে থাকা। আল্লাহ ইসতিকামাতকে অনেক পছন্দ করেন। কেউ ইসতিকামাতের সাথে মসজিদে তাওবা করল। তারপর বের হয়ে বাজারে যেতেই কোনো নারীর আকৃতি সামনে পড়তে শুরু করল। তখন সে চিন্তা করল আমার দৃষ্টি অপাত্রে পড়তে পারে না। ঠিক কেউ মিথ্যা না বলার প্রতিজ্ঞা করল। এখন সব সুবিধা এক জায়গায় রেখে মিথ্যা বলা ছেড়ে দিল। শয়তান বলে, মিথ্যা বললে লাভ হবে। অপরদিকে রহমানের ওয়াদা হলো, সত্য বললে উপকৃত হবে।

## শায়খের সাথে নেসবতের বরকত

আজ ইসতিকামাত খুবই কম পাওয়া যায়। অধিকাংশ সালিক বলে, আমি তাওবা করি; কিন্তু তাওবা বেশি দিন টিকে না; বারবার ভেঙে যায়। এটিও ভালো একটি আলামত। মাশায়েখদের সাথে নেসবতের বরকতেই বারবার তাওবার তাওফীক হয়। কেননা, অঙ্গার ভিতরে-ভিতরেই জ্বলতে থাকে। গোনাহ করার পর তার শান্তি থাকে না। তার ভিতরটা তাকে তিরস্কার করে আর বলে, আমি যা করছি, খারাপ করছি। ইসতিকামাতের সাথে জীবন অতিবাহিত করলে আল্লাহর সাহায্য পাওয়া যায়। যার মধ্যে কাজের ইসতিকামাত নেই, সে আল্লাহর দৃষ্টি থেকে সরে যায়।

## গাছের সাথে বিস্ময়কর আলোচনা

একবার দুপুরে হযরত সিররি সাকতি (রহ.) কোথাও যাওয়ার সময় তার ঘুম এসে গেল। তিনি একটি গাছের নিচে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর যখন তাঁর ঘুম ভেঙে গেল, তখন তিনি একটি আওয়াজ শুনতে পান। তিনি বুঝতে পারলেন, এই আওয়াজ গাছ থেকে আসছে।

গাছ তাকে বলছে–

يَاسِرِّيُ! كُنْ مِثْلِيْ

'হে সিররি! তুমি আমার মতো হয়ে যাও।'

তিনি বললেন,

كَيْفَ اَكُوْنُ مِثْلَكَ

'আমি কিভাবে তোমার মতো হব?'

গাছ বলল,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَنِيْ بِالْاَحْجَارِ فَاَرْمِيْهِمْ بِالْاَثْمَارِ

'যারা আমার দিকে পাথর মারে, আমি তাদের ফল দেই।'

তুমি আমার মতো হয়ে যাও। একথা শুনে সিররি হয়রান হয়ে গেলেন। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন। যদি গাছ এতোই ভালো হয় যে, তাকে কেউ পাথর মারলে সে উল্টো তাকে ফল দেয়, তাহলে তারপরও আল্লাহ কেন গাছের লাকড়িকে আগুনের খাদ্য বানালেন? তখন তিনি গাছকে জিজ্ঞাসা করলেন,

فَكَيْفَ مَصِيْرُكَ اِلَى النَّارِ

'তোমার এই গুণ থাকা সত্ত্বেও কেন আল্লাহ তোমাকে আগুনের মধ্যে জ্বালান?'

গাছ উত্তর দিল, আমার ভিতর এই গুণ আছে ঠিক; কিন্তু একটা দোষও আছে, যে কারণে আল্লাহ আমাকে আগুনে দিয়েছেন। তা হলো,

فَاَمِيْلُ بِالْهَوَا هٰكَذَا هٰكَذَا

'আমি বাতাস যেদিকে চলে, সেদিকে ঝুঁকে যাই।'

অর্থাৎ– আমার মধ্যে ইসতিকামাত নেই।

## নবীজিকে ইসতিকামাতের আদেশ

কিছু লোকের ভিতর নিম্নোক্ত পঙ্‌তিটির নমুনা পাওয়া যায়–

چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی

'বাতাসের গতি যেদিকে, তুমি সেদিকে চলো।'

ওই বেচারা রুসম-রেওয়াজ অনুসারে চলতে চায়। অপরদিকে আল্লাহ বান্দার ভিতর ইসতিকামাত চান। শরীয়ত আমাদের এরই হুকুম দেয়। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

'যারা বলে, আমাদের বর আল্লাহ, তারপর দৃঢ় থাকে।'[১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ স্বীয় নবীকে এভাবে হুকুম করেন–

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ

'তুমি অবিচল থাকো যেমন তোমাকে আদেশ করা হয়েছে আর সেও, যে তোমার সাথে তাওবা করেছে।'

## কুরআন ও সম্মান

যে বান্দা ইসতিকামাতের সাথে কোনো কাজে লেগে যায়, আল্লাহ তার সহায় হয়ে যান। আল্লাহ কুরআনকে আমাদের ইজ্জত ও বিজয়ের জন্য দান করেছেন। সুতরাং যে কেউ বা কোনো দল কুরআনের উপর আমল করবে, আল্লাহ তাদের বিজয় দান করবেন।

## সাহাবীগণ ও আসবাব

সাহাবীদের কাছে উপায়-উপকরণ খুব কমই ছিল। কিন্তু কেমন আশ্চর্যের কথা যে, আবার তাঁরাই দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন। পুরো বাহিনীর মধ্যে শুধু দুটা তলোয়ার ছিল। সাহাবীগণ বলেন, বদরের ময়দানে কাফিরদের যখন লৌহবর্ম দ্বারা পুরো শরীর আচ্ছাদিত দেখতে পেলাম, তখন মনে হতে লাগল, আমাদের তো মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইরশাদ হয়েছে–

كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ

---

১. সূরা সাজদাহ : আয়াত ২৯

'মনে হচ্ছিল, তাদের মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হচ্ছিল আর তারা তা স্বচখে দেখছিল।'[১]

কিন্তু আল্লাহ তাঁদের ইসতিকামাতের সাথে লড়াই করার তাওফীক দিলেন।

## সাহাবায়ে কেরামের পরীক্ষা

আল্লাহ সাহাবীদের অনেক পরীক্ষা করেছেন। আলেমগণ লিখেছেন, সাহাবীদের পরীক্ষা আগের যমানার উম্মতের পরীক্ষার চেয়ে আরো কঠিন ছিল। এ কারণে প্রথম উম্মতের চেয়ে তাঁরা অধিক পুরস্কার পেয়েছেন। সাহাবীদের ওপর পরীক্ষা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ

'সংকট ও দুঃখ-কষ্ট তাদের স্পর্শ করেছে এবং তারা ভীত-প্রকম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারীরা বলে উঠল, আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে?'[২]

জবাবে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

'অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য নিকটে।'[৩]

তাঁদের এমন পরীক্ষা করা হয়েছে যে তাঁদের সম্পর্কে زلزلوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সাহাবীদের ওপর পরীক্ষা আসার কথা আলোচনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেন,

وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا

এ আয়াত দ্বারা বোঝা গেল, প্রথমে উম্মতের তুলনায় সাহাবাদের ওপর পরীক্ষা বেশি কঠিন ছিল। যেহেতু তাঁদের ওপর পরীক্ষার চাপ বেশি ছিল, তাই তাঁরা অধিক মাত্রায় এর পুরস্কার লাভ করেছেন।

## পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলে আল্লাহই রক্ষাকারী

ইসতিকামাতের সাথে শরীয়তের ওপর আমলকারীদের আল্লাহ কিভাবে সাহায্য করেন একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝি। এক পিতা তার ছোট শিশুকে দাঁড়

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ৬
২. সূরা বাকারা : আয়াত ২১৪
৩. সূরা বাকারা : আয়াত ২১৪

করিয়ে নিজের দিকে আসতে বললেন। অথচ পিতা জানেন, বাচ্চার বয়স কম এবং সে পুরোপুরি একা হাঁটতে পারে না। এদিকে বাচ্চাও বুঝে যায়, আমি হাঁটতে গিয়ে পড়ে যেতে পারি। পিতা মনে-মনে ভাবেন, বাচ্চা হেঁটে-হেঁটে আমার দিকে আসতে গিয়ে যদি পড়ে যায়, তাহলে আমি তাকে পড়তে দেব না। তাই বাচ্চা পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলেই পিতা তাকে উঠিয়ে হাঁটা শিখিয়ে দেন। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ স্বীয় বান্দাকে শরীয়তের ওপর চলার আহ্বান করে ডাকতে থাকেন। আল্লাহ জানেন, এই রাস্তা চলার পথে তিন ধরনের বাধা আছে। এই তিন ধরনের বাধার কারণে বান্দা হোঁচট খেতে পারে। কিন্তু বান্দা তারপরও শরীয়ত অনুযায়ী চলার নিয়ত করলে যদি সে হোঁচট খাওয়ার উপক্রম হয়, তাহলে আমি তাকে হোঁচট খেতে দেব না। বরং এর আগেই তাকে আমার নৈকট্য দান করব।

## ইসতাকামাতের সামনে পাহাড়ের মর্যাদা

আমাদের কাজ হলো নেক নিয়তের সাথে শরীয়তের রাস্তায় কদম উঠানো। আমাদের চলার পথে বাধা যদিও এসে পড়ে, তারপরও আল্লাহ সেগুলো দূর করে দিবেন। একলোক স্বপ্নে দেখল, কেউ তাকে বলছে, তুমি যদি আল্লাহর রাস্তায় বের হও, তাহলে তোমার সর্বপ্রথম যে বস্তুটি চোখে পড়বে যদি তা খেয়ে নাও, তাহলে তুমি অনেক বিনিময় পাবে। লোকটি চোখ খোলার সাথে-সাথে তার নিয়ত করে ফেলল।

সকালে সে বাইরে বের হওয়ার পর সর্বপ্রথম পাহাড়ের ওপর তার চোখ পড়ল। সে স্বপ্নের কথা চিন্তা করে পাহাড়ের দিকে এগুতে লাগল। একবার তার মনে হলো, পাহাড় দিয়ে কী হবে? আবার সে মনে করল, থাক; আমার কাজ হলো যাওয়া। আমি যাই। আল্লাহ সহজ করে দিবেন। যথারীতি সে চলতে লাগল। সে যতই পাহাড়ের দিকে এগুতে লাগল, ঠিক ততই পাহাড় তার কাছে ছোট হয়ে আসতে থাকল। যখন সে পাহাড়ের নিকটবর্তী হলো, দেখল, গুড়ের ছোট একটা চাকা ওখানে পড়ে আছে। সে চাকাটা তুলে খেয়ে ফেলল। তো সে ইসতিকামাতের সাথে কদম উঠানোর ফলে আল্লাহ পাহাড়কে তার সামনে গুড়ের চাকা বানিয়ে দিয়েছেন।

## সাহাবীগণের বিজয়ের মূল রহস্য

সাহাবীগণ মনে করছিলেন, বাধা দূরকারী সত্তা আমাদের সাথে আছেন। তাই তাঁরা বাধাকে বাধা-ই মনে করেননি। তাঁদের কাজ ছিল, আল্লাহর রাস্তায় কদম উঠানো। এর ফলেই তারা কামিয়াব হন।

بات کیا تھی کہ نہ قیصر و کسری سے دبے

چند وہ لوگ کہ اونٹوں کو چرانے والے

'কী রহস্য ছিল যে, কায়সার-কিসরা হাতেও পরাভূত হলো না সেই গুটিকতক লোক, যারা ছিল উটের রাখাল?'

جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا

بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے

'যারা কর্পূরকে লবণ ভেবে ধোঁকা খেত, তারা-ই হয়ে গেল বিশ্ববাসীর ভাগ্যর্মিাতা!'

যেহেতু আল্লাহর ওয়াদার উপর তাদের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস ছিল, তাই–

ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے

پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے

'যদি তারা রণাঙ্গনে উড়ে যেত, তাহলে তাদের কেউ টলাতে পারত না। বাঘের পা টলানো সম্ভব ছিল, কিন্তু তাদের টলানো সম্ভব ছিল না।'

এই ইসতিকামাতের কারণেই তাঁদের কাছে বিজয়ের দরজা খুলে যায় এবং আল্লাহ তাঁদের বিজয় দান করেন।

## আল্লাহ তা'আলার সাহায্য আসার নিদর্শন

আমার বন্ধুগণ!

আজো আল্লাহর ওই কুরআন এবং ওই ফরমান বিদ্যমান আছে। যদি আমরা ইসতিকামাতের সাথে শরীয়তের নির্দেশনা অনুয়ায়ী চলি, তাহলে আল্লাহ আমদেরও কামিয়াব করবেন। কাফিররা আমাদের চুলও ধরতে পারবে না। আল্লাহর সাহায্য এসে পড়লে নৌকাকে তিনি উত্তাল ঢেউয়ের সাগরের দয়ার ওপর ছেড়ে দেন না; বরং নৌকাকে তিনি কিনারায় এনে দেন।

এজন্য আমাদের উচিত, শরীয়তের হুকুমের ওপর জমে যাওয়া। দাঁত দ্বারা একে শক্ত করে ধরা। লোকেরা বলবে, না খেয়ে মরে যাও। আপনি বলবেন, কখনও নয়; আল্লাহ আমাদের রিযিক দেন আবার সাহায্যও করেন। সারা দুনিয়ার কাফিররা এক হয়ে গেলেও তারা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। কেননা, রক্ষাকারী সত্তা তাদের চেয়েও অনেক বড়।

## আহযাবের যুদ্ধে কাফিরদের পরাজয়

নবীজির যমানায় আহযাবের যুদ্ধে এমনি ঘটনা ঘটেছিল। কাফিররা মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য আসতে লাগল আর রাস্তায় যে কবিলাকেই পেত তাকেই সাথে নিয়ে যেত। তাদের বলত, আমাদের সাথে চলো। না গেলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ হবে। এজন্য তারা ভয়ে তাদের সাথে যোগ দিত। এদিকে মদীনার ইহুদীরা এই তথ্য শুনে খামাখা মুসলমানদের লক্ষ্য করে বলতে লাগল,

إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

'তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোকজন একত্রিত হচ্ছে। কাজেই তাদের ভয় করো।'[১]

তোমরা ভেবে-চিন্তে দেখো। অন্যথায় তোমাদের নাম-নিশানাও থাকবে না। পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে যাবে। এ খবর শুনে সাহাবাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেতে লাগল।

কুরআন এর সাক্ষ্য এভাবে দিয়েছে–

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا.

'তাতে কেবল তাদের ঈমান-আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।'[২]

কাফিররা এসে মদীনা মুনাওয়ারা ঘেরাও করল। এক মাস অবরোধ করে রাখল। তাদের হাবভাব এমন ছিল যে, আমরা মুসলমানদের চিবিয়ে খাব। কিন্তু কী হলো? আল্লাহ কুরআনে অনেক সুন্দর করে বর্ণনা করে দিয়েছেন–

وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا

'আল্লাহ কাফিরদের ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন; তারা কোনো কল্যাণ লাভ করেনি।'[৩]

## ঈমান যাচাইয়ের সময়

একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, আমরা আমাদের দুশমনকে চিনি না। কিন্তু আল্লাহ জানেন। তিনি ইরশাদ করেন,

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৭৩
২. সূরা আহযাব : আয়াত ২২
৩. সূরা আহযাব : আয়াত ২৫

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ

'আল্লাহ তোমাদের দুশমনদের চিনেন।'[১]

আমরা কিভাবে জানব, কারা ওপরে-ওপরে আমাদের সাথে বন্ধুত্বের ভান করছে আর ভিতরে-ভিতরে আমাদের শিকড় কাটছে? আমাদের চারদিক থেকে ঘেরাও করেছে? এই আয়াতের সাথেই তিনি আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি ফরমান–

وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

'এবং আল্লাহ কখনও কাফিরদের জন্য ঈমানদারদের পর্যন্ত পৌঁছার পথ রাখেননি।'[২]

যথা– কেউ কোনো শিশুকে প্রহার করছে। বাচ্চার পিতা আসতেই সে বলল, আগে আমার সাথে কথা বলো, পরে তাকে মারো। ঠিক তদ্রূপ আল্লাহ এখানে তা-ই বলছেন। হে ঈমানদারগণ! তোমাদের দুশমন প্রথমে আমার সাথে কথা বলবে। আজকাল লোকেরা বলে, তোমরা এদিক দিয়ে গেলে আমার লাশের ওপর দিয়ে যাবে। এর উদ্দেশ্য হলো, প্রথমে আমি তোমার মোকাবেলা করব, তারপর তোমরা আগে কদম উঠাতে পারবে। আল্লাহও একথা-ই বলছেন। অর্থাৎ– কাফির তোমাদের দিকে আসতে চাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ কখনওই তাদের মুসলমানের দিকে আসতে দিবেন না।

তো যেখানে আল্লাহ আমাদেরকে সমর্থন দিচ্ছেন, সেখানে আমাদের ভয় পাওয়ার কী আছে? এখানেই ঈমান পরীক্ষা করার সুযোগ। দুর্বল ঈমানদাররা কাফিরদের দেখে ভড়কে যায় আর শক্ত ঈমানদাররা তাদের সামনে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো হয়ে যায়।

## খালিদ ইবনে ওলীদ (রাযি.)-এর বীরত্ব

সাহাবীদের যিন্দেগি অধ্যয়ন করে আমি হয়রান হয়ে যাই। একবার পরামর্শ হচ্ছিল এ বিষয়ে যে, অমুক স্থানে এতো কাফিরের সাথে মোকাবেলা করার জন্য কজন মুসলমান যাবে? কেউ বলল, সত্তরজন গেলে হবে। কেউ বলল, চল্লিশ। আবার অনেকে দশজন বলে মতামত দিল। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.) সেখানে বসা ছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমাকে একাই পাঠিয়ে দিন। কেউ একজন তাঁর কথা শুনে বলল,

---

১. সূরা নিসা : আয়াত ৪৫

২. সূরা নিসা : আয়াত ১৪৪

খালিদ! এটা অহংকারসুলভ কথা। তিনি বললেন, তা কখনওই নয়। আমার উদাহরণ বাজপাখির মতো আর কাফিরের উদাহরণ জালের মধ্যে ফেঁসে যাওয়া পাখির মতো। তিনি আরো বললেন, কাফির মুর্দা আর মুমিন জিন্দা। লক্ষ-লক্ষ মুর্দা একজন যিন্দাকে কিছুই করতে পারে না। অবশেষে আল্লাহ ওই অভিযানে সাহাবীদের বিজয় দান করেন।

## 'ফুতুহুশ শাম' কিতাবের অবস্থান

আল্লামা ওয়াকেদীর একটি কিতাবের নাম 'ফুতুহুশ শাম'। উর্দূতে এই কিতাবের অনুবাদ হয়েছে। এই কিতাব প্রত্যেক যুবকের পড়া উচিত। এই কিতাবে সাহাবাদের এমন বিস্ময়কর ঘটনাবলি বর্ণিত হয়েছে যে, এগুলো পড়লে অন্তর ভরে যায়। বোঝা যায়, ঈমান কাকে বলে? মনে রাখবেন, আল্লাহর ওয়াদার কথা পড়লে মুমিনের ঈমান বৃদ্ধি পায়। হয়রান হতে হয় একথা ভেবে যে, আল্লাহ তাঁদের কিভাবে সাহায্য করেছেন।

## আলেমদের দায়িত্ব

আমার বন্ধুগণ!

এই রাস্তায় অনেক বাধা আসবে। কিন্তু এই বাধাগুলোকে ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং আমাদের কদম আগে বাড়াতে হবে। ঈমানদারদের রাস্তা কেউ ঠেকাতে পারে না। আমাদের কাজ হলো সাহসের সাথে কদম উঠানো আর আল্লাহর ওয়াদার উপর ভরসা রাখা। ফলে একদিকে দুনিয়ার খাযানা খুলে যাবে অপরদিকে আল্লাহর সাহায্য নেমে আসবে। আমাদের উচিত, দুনিয়ার পিছনে না ছুটে পরওয়ারদেগারকে খুশি করার চেষ্টায় লেগে যাওয়া।

আলেমগণের উচিত হলো, নিজে শরীয়তের ওপর জমে থাকবে এবং অন্যদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবে। কেননা, আলেমগণের ভিতর ইসকিামাত এলে সাধারণ মানুষের ভিতরও ইসতিকামাত আসবে। আগের যমানায় উম্মত কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার পর প্রথমে তাদের আলেমগণই কদম উঠিয়েছেন। ফলে আল্লাহ তাদের পরীক্ষা থেকে উদ্ধার করেছেন। এখন যে পরিস্থিতি সামনে আসছে, এগুলো দূর করার জন্য আল্লাহ আলেমগণকেই কারণ বানাবেন। এজন্য আলেমগণের উচিত, তাঁরা আগে কুরআন-সুন্নাহকে সামনে রাখবেন। কেননা, কুরআনের মাধ্যমেই তাঁদের ওপর এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

وَالرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتٰبِ اللّٰهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ

'রাব্বানি ও বিদ্বানগণকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা-ই এর সাক্ষী ছিল।'[১]

এবং আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কেরামকে কিতাব হেফাজতের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

وَكَاَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَآ اَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ

'আর বহু নবী ছিলেন, যাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আলেম ও নেককারগণ লড়াই করেছে। কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা যে কষ্ট পেয়েছে, তার জন্য হীনবল হয়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আল্লাহ সবরকারীদের ভালোবাসেন।'[২]

আলেমগণের দায়িত্ব হলো, তাঁরা ইসতিকামাতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন আর এর সাথে-সাথে রাতে আল্লাহর কাছে মাফ চাইবেন। আল্লাহ পরের আয়াতে একথা-ই বলেন,

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّآ اَنْ قَالُوْا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْٓ اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ

'তারা আর কিছুই বলেনি; শুধু বলেছে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের পাপগুলো এবং যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে আমাদের কাজে সব মাফ করে দিন আর আমাদের দৃঢ় রাখুন এবং কাফিরদের উপর আমাদের সাহায্য করুন।'[৩]

আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বদা এভাবে মাফ চাইবে যে, হে আল্লাহ! আমাদের গোনাহের কারণে আমাদের উপর থেকে আপনার সাহায্য উঠিয়ে নিবেন না। কেমন যেন দিনে সকল ওলামায়ে কেরাম মুজাহিদ বনে যাবেন আর রাতে দু'আয় মশগুল থাকবেন, যাতে করে কাফেররা টের পায়, আমরা মুসলমানদের পাল্লায় পড়েছি! এসব স্থানে কখনো যেন কাপুরুষতা প্রকাশ না পায়।

---

১. সূরা মায়েদা : আয়াত ৪৪
২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪৭
৩. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪৮

আল্লাহ বলেন, ঈমানদাররা যখন আল্লাহর নিকট চাইবে, তো–

فَاٰتٰهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ.

'আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দুনিয়ার অংশ দিয়েছেন এবং আখেরাতের অংশও দিয়েছেন এবং আল্লাহ নেককারদের মহব্বত করেন।'[১]

আলেমদের জামাত সম্মানিত জামাত। এমতাবস্থায় তাদের আল্লাহর জাতের উপর দৃষ্টি রাখা দরকার।

## লোহার ছোলা

কুরআনের শেষ আয়াত নাযিল হওয়ার দিন এ আয়াতটিও নাযিল হয়েছিল,

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

'আজ কাফিররা নিরাশ হয়ে গেল।'[২]

যেন আল্লাহ বলতে চাচ্ছেন, মুসলমানরা লোহার ছোলার মতো; তাদের চিবিয়ে খাওয়া এত সহজ নয়।

## আল্লাহর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা

আল্লাহ ইরশাদ করেন,

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِيْ

'তোমরা কাফিরদের ভয় না করে আমাকে ভয় করো।'[৩]

সুতরাং আমরা এক আল্লাহকে ভয় করলে তিনি আমাদের অন্তর থেকে অন্য সবার ভীতি দূর করে দিবেন। যে লোকের অন্তরে আল্লাহর ভয় নেই, সে নিজের ছায়া দেখেও ভয় পায়। রাতে গাছের পাতার শব্দ শুনেও ভয় পায়। আমাদের একমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করা উচিত। তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন। আমরা ঈমানদার। যে ঈমানদারের দিকে চোখ তুলে তাকাবে, তার আল্লাহর সাথে মোকাবেলা করতে হবে। হাদীছে কুদসীতে একথাই আল্লাহ বলেছেন–

مَنْ عَادَ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهُ لِلْحَرْبِ

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪৯
২. সূরা মায়েদা : আয়াত ৩
৩. সূরা মায়েদা : আয়াত ৩

'যে আমার ওলিদের সাথে শত্রুতা রাখবে, তার সাথে আমি যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম।'

এখন যদি কেউ ঈমানদারদের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে দেখে, আল্লাহ তার চোখ খুলে নিবেন আর যে তাদের দিকে আঙুল উঠাবে তিনি তার আঙুল গুড়িয়ে দিবেন।

## সাহাবী জিরার ইবনে আযওয়ার (রাযি.)-এর জিহাদ

'ফুতুহুশ শাম' নামক কিতাবে সাহাবী জিরার ইবনে আযওয়ার (রাযি.) সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একবার এক জিহাদে তিনি লাগাতার আট ঘন্টা লড়াই করেন। পরে তিনি কাফিরদের ঘেরাওয়ে পড়ে যান। টানা আট ঘন্টা লড়াই করার ফলে তার ঘোড়াও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তিনি ঘোড়াকে সামনের দিকে আগাতে চেষ্টা করছেন; কিন্তু ঘোড়া আগায় না। যখন তিনি বুঝতে পারলেন, ঘোড়া ক্লান্ত হয়ে গেছে, তখন তিনি ভাবলেন, এখন তো আমি পাকড়াও হয়ে যাব। তখন তিনি ঘোড়ার দিকে ঝুঁকে ঘোড়ার কপালে হাত বুলিয়ে মহব্বতের সাথে বলতে লাগলেন, হে ঘোড়া! তুমি অল্প সময়ের জন্য আমার কথা রাখো, অন্যথায় আমি তোমার বিরুদ্ধে নবীজির রওজায় গিয়ে অভিযোগ করব। একথা বলতেই ঘোড়া উত্তেজিত হয়ে তীব্র গতিতে দৌড়াতে শুরু করল। ঘোড়া তাকে কাফিরদের ঘেরাও থেকে বাইরে নিয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ পর তিনি কাফিরদের হাতে বন্দি হলেন। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.) তাঁকে বন্দি দেখতে পেয়ে চিন্তিত হলেন। তখন কিছু অশ্বারোহী তাঁর কাছে এসে বলল, আমাদেরকে জিরারের পিছনে যেতে হবে, যাতে তাঁকে উদ্ধার করে আনতে পারি।

## হযরত খাওলার বীরত্ব

তাঁরা এই নিয়তে চলতে লাগলেন। হঠাৎ তাঁরা ঘোড়ার উপর একজন মুখোশপরিহিত সওয়ারকে রণাঙ্গনে দেখতে পেলেন। তার কাছে তরবারী-বর্শা সবকিছুই ছিল। সে কখনও এদিকে আবার ওদিকে ছুটতে লাগল। তাঁর বীরত্ব দেখে অন্য মুজাহিদরা হতবাক হয়ে গেল। তাঁরা দুশমনের কাছাকাছি পৌঁছার পর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.) দ্বিতীয়বার হামলা করলেন। কিন্তু তাঁরা জিরার (রাযি.)-এর কোনো খোঁজ পেলেন না। খালিদ (রাযি.) বলেন, আমি দেখলাম, আমি কয়েকবার কাফিরদের নাগালে পড়ে গিয়েছিলাম। যতবারই এ অবস্থা হয়েছে, ততবারই ওই মুখোশপরিহিত সওয়ার তীব্রবেগে আক্রমণ চালিয়ে আমাকে কাফিরদের ঘেরাও থেকে বের করে দিচ্ছে। আমি

হয়রান হয়ে গেলাম, আমার বাহিনীতে এ আবার কোন মুজাহিদ এমন বীরত্বের সাথে লড়ছে! কিছুক্ষণ পর আমরা যখন পিছু হটলাম, তখন দেখলাম, ওই সাওয়ার মুজাহিদের ঘোড়া রক্তাক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার তরবারী রক্তে রঞ্জিত। আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কে? তোমার বাহাদুরি দেখে আমার অবাক লাগছে। কিন্তু সে কোনো জবাব দিল না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু সে জবাব দিল না। তৃতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দিতে শুরু করল। তখন আমি বুঝলাম, সে পুরুষ নয়; বরং একজন নারীর সাথে আমি কথা বলছি। সে বলল, আমি খাওলা। জিরারের বোন। আমি আমার ভাইয়ের খবর জানতে পেরে রণাঙ্গনে এসে পড়েছি। আপনি যদি অনুমতি না দেন এ ভয়ে আপনার কাছে অনুমতি চাইনি। ভাই কোনো বিপদে পড়লে বোন তার উপকার করে। আমি এজন্য যুদ্ধ করতে এসেছি। এখন আমি আপনার কাছে অনুমিত চাচ্ছি, যাতে আপনি আমাকে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করেন।

আমার বন্ধুগণ! যে জাতির পর্দার ভিতর এমন নারী থাকে, সে জাতির পুরুষদের কী অবস্থা হতে পারে আপনারাই বলুন। বাস্তব কথা হলো, ঈমান অনেক বড় নেয়ামত। যখন কেউ ঈমানকে সামনে রেখে কদম উঠায়, তখন আল্লাহই তাকে সাহায্য করেন।

## ঘোড়ার ইসতিকামাত

যদি কোনো মুজাহিদ তাঁর ঘোড়াকে এই নিয়তে পালন করে যে, এই ঘোড়া দিয়ে আমি জিহাদ করব, তাহলে ওই ঘোড়া বিষয়টি বুঝতে পারে। এজন্য যখন ওই মুজাহিদ উক্ত ঘোড়ার ওপর সাওয়ার হয়ে হাতে তরবারী উঁচিয়ে রণাঙ্গনে যায়, তখন ওই ঘোড়াও জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। ঘোড়া তার সামনে অস্ত্র দেখেও ভয় পায় না। তখন ঘোড়া তার মালিকের নির্দেশনা অনুযায়ী সব কিছু করে। ঘোড়া দুশমনের আঘাতে আহত হয়েও রণাঙ্গনে এগিয়ে চলতে থাকে। ঘোড়া স্বীয় মালিকের মান-সম্মান নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে হলেও রক্ষা করে। ঘোড়ার এই ইসতিকামাত আল্লাহ এত পছন্দ করেন যে, ঘোড়ার পায়ের মাটির কসম খেয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً . فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً . فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً

'শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির, যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করে, যারা অভিযান করে প্রভাতকালে।'[১]

---

১. সূরা আদিয়াত : আয়াত ১-৩

ঘোড়ার ইসতিকামাতে আল্লাহ এ পরিমাণ খুশি হলে কোনো মুমিন বান্দার বীরত্ব ও ইসতিকামাতে আল্লাহ তাঁর প্রতি কেমন খুশি হতে পারেন!

## আল্লাহর সাহায্যের ওয়াদা

আমার বন্ধুগণ!

আমাদের একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ওপর ভরসা করে কদম বাড়ানো উচিত। আপনারা কি দেখতে পান না, দীনের সাহায্যকারীদের প্রতি আল্লাহ কী ওয়াদা করেছেন? তিনি ইরশাদ করেছেন–

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

'তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করলে আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং পাগুলোকে অবিচল রাখবেন।'[১]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

'আমি আমার রাসূল ও ইমানদার পার্থিব জীবনেও সাহায করি।'[২]

অন্য এক জায়গায় আল্লাহ ইরশাদ করেন–

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا

'আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে?'[৩]

আমার বন্ধুগণ! আল্লাহর ওয়াদা পুরোপুরি সত্য। তিনি অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন।

## মজবুত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

'কিছু বস্তু হালকা হয় এবং প্রবহমান স্রোতে পানির সাথে ভেসে যায়। যেমন- কাগজ, লাকড়ি, ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদি। কিন্ত কিছু বস্তু আছে, যেগুলো পানির স্রোতে ভেসে যায় না; তারা-ই বরং পানির মোড়কে ঘুরিয়ে দেয়। আমরা মুমিন। তাই আমাদেরকে ঘাস, লতা-পাতার মতো হালকা হলে চলবে না; বরং দ্বিতীয় ভারী বস্তুর মতো হতে হবে। আমাদেরকে পানির দিক পরিবর্তন করে দিতে হবে।'

---

১. সূরা মুহাম্মদ : আয়াত ৬
২. সূরা গাফির : আয়াত ৫১
৩. সূরা নিসা : আয়াত ১২২

یاد کرتا ہے زمانہ ان انسانوں کو
روک دیتے ہیں جو بڑھتے ہوئے طوفانوں کو

'সময় সেই মানুষগুলোকে স্মরণ করছে, যারা অগ্রসরমান তুফানকে থামিয়ে দিতেন।'

আজ কুফুর ও বেহায়াপনার সয়লাব চলছে। তাই আমাদের ইসতিকামাতের সাথে শরীয়ত ও সুন্নতের ওপর থাকা উচিত।

## হযরত মুশাতা (রাযি.)-এর ইসতিকামাত

ফেরাউনের রাজপ্রাসাদে মুশাতা নাম্নী এক মহিলা ফেরাউনের মেয়েদের চুল বিলি করে দিত। একবার এক মেয়ের চুল আঁচড়িয়ে দেওয়ার সময় তার হাত থেকে চিরুনিটা নিচে পড়ে যায়। তখন সে মূসা নবীর রবের নামে তা উঠিয়ে নেয়। তখন ফেরাউনের মেয়ে বুঝল, এই মেয়ে আমার পিতাকে মাবুদ বলে মানে না। বরং সে মূসা নবীর রবের ওপর ঈমান এনেছে। ফেরাউনের মেয়ে মুশাতাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, কখনওই আমি ফেরাউনকে রব মানি না। আমি ঈমান এনেছি মূসা নবীর রবের উপর। তখন ফেরাউনের মেয়ে পিতার কাছে গিয়ে বলল, আপনার মহলে আপনার ছায়ায় থেকে ওই মহিলা আপনাকে খোদা বলে মানে না। একথা শুনে ফেরাউন ক্রোধে ফেটে পড়ল। ফেরাউন বলল, আমি দরবারে গিয়ে তাকে এমন শাস্তি দেব যে, হয় সে মূসা নবীর রবের ওপর ঈমান ছেড়ে দিবে, নয় প্রাণ হারাবে।

ফেরাউন দরবারে গিয়ে ওই মহিলাকে ডেকে মূসা নবীর রবের উপর থেকে ঈমান ছাড়তে নির্দেশ দিল। সে বলল, কখনওই পারব না। ফেরাউন মুশাতাকে ধমক দিতে লাগল। মুশাতা বলল, এখন আপনি আমাকে যা খুশি করতে পারেন। আমি আল্লাহর ওপর ঈমান ছাড়তে পারব না। এই সাহসিকতাপূর্ণ কথা শোনার পর ফেরাউন তাকে মাটিতে শুইয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল। যথারীতি তা-ই করা হলো। তার উভয় হাত ও পায়ে বেড়ি লাগানো হলো। তখন এক উজির এসে ফেরাউনকে বলল, তার একটা ছোট শিশু রয়েছে। যদি ওই শিশুকে তার সামনে হত্যা করেন, তাহলে মাতৃত্বের মমতায় অপারগ হয়ে সে আপনার কথা মেনে নিবে। তখন ফেরাউন তার শিশুকে এনে তার বুকের ওপর রেখে দেওয়ার হুকুম দিল। ওই শিশু মায়ের বুকের দুধ খেতে শুরু করল।

ফেরাউন মুশাতাকে বলল, এখন তোমার এই শিশু বাচ্চাকে তোমার সামনে হত্যা করব। তখন মুশাতা বলল, এখন আমার ঈমান এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, আমি এই মুহূর্তে আমার এই শিশু বাচ্চাকে রক্তের মাঝে গড়াগড়ি খেতে দেখলেও আমি আমার ঈমান ছাড়তে পারব না। তখন মুশাতার বুকের ওপরই তার বাচ্চার গর্দান কেটে দেওয়া হয়। যে মায়ের বুকের ওপর নিজ সন্তানের রক্ত বেয়ে পড়ে, সেই মায়ের অবস্থা কেমন হয়? তারপর ফেরাউন বলল, এখন আমি তোমাকে হত্যা করব। মুশাতা বলল, তোমার যা খুশি করো। আমি ঈমান ছাড়তে পারব না। অবশেষে এই মহিলাকেও শহীদ করে দেওয়া হলো।

## হযরত আসিয়ার দৃঢ়তা

ফেরাউন মুশাতাকে শহীদ করে দেওয়ার পর ঘরে গিয়ে নিজ স্ত্রী হযরত আসিয়াকে বলতে লাগল, আজ এমন একটি ঘটনা ঘটল যে, এক মহিলাকে চূড়ান্ত শিক্ষা দিয়েছি। বিবি আসিয়া বললেন, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি এক নিষ্পাপ বাচ্চাকেও শহীদ করে দিয়েছ আর এক নিরপরাধ মহিলাকেও হত্যা করেছ। ফেরাউন বলল, আমি তাকে এই শাস্তি দিয়েছি এ কারণে যে, সে আমাকে খোদা মানে না। তখন আসিয়া বললেন, আমিও তোমাকে খোদা মানি না। তুমি তো একজন সাধারণ মানুষমাত্র।

আসিয়ার মুখে একথা শুনে ফেরাউন হতবাক হয়ে গেল। কারণ, ফেরাউন আসিয়াকে অনেক ভালোবাসত। আসিয়া অনেক সুন্দরী ও চরিত্রবতী মহিলা ছিলেন। ফেরাউন তাকে পুরো কওম থেকে বাছাই করে এনে তাকে নিজের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছে। ফেরাউন তাকে বলল, তুমি এ কী বলছ? আসিয়া বললেন, আমি সম্পূর্ণ ঠিক বলছি। তুমি মিথ্যাবাদী।

রব একমাত্র তিনি, যার পয়গাম নিয়ে মূসা নবী আগমন করেছেন। তখন ফেরাউন রাগে-ক্ষোভে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল। বলল, মুশাতার যে পরিণতি হয়েছে, তোমারও সেই পরিণতি ভোগ করতে হবে। আসিয়া বলল, তুমি যা খুশি করো। আমার সাথে আমার রব আছেন। আমি কখনওই তাঁকে ছাড়তে পারব না। একথা শুনে ফেরাউন পুনরায় দরবারে এসে সবাইকে ডেকে এনে বলতে লাগল, দেখো, এ কত বড় জঘন্য ব্যাপার যে, মূসা আমার স্ত্রীকেও দলে নিয়ে গেছে! আজ আমি তাঁকে মেরে ফেলব নতুবা সে তাঁর কথা থেকে ফিরে আসবে।

ফেরাউন আসিয়াকে গ্রেফতার করে দরবারে নিয়ে আসার হুকুম দিল। আসিয়া ছিল ফেরাউনের প্রাসাদের রানী। তার অঙ্গুলিহেলনে চাকর-বাকর

ভয়ে কাজ করত। অধিক সম্মানের কারণে কেউ তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারত না। আর আজ তিনি ফেরাউনের দরবারে আসামি হয়ে হাজির হয়েছেন। ফেরাউন তাঁকে বলল, আমি তোমাকে এতো দামী মহলে স্থান দিয়েছি, এতো নেয়ামত তোমাকে দান করেছি। তোমাকে আমার প্রিয় বানিয়েছি। তোমাকে এগুলো সব ছেড়ে দিতে হবে। এখনও সময় আছে, তুমি আমাকে ইলাহ মেনে নাও। কিন্তু আসিয়া (রাযি.) তাঁর কথায় অটল রইলেন। তখন ফেরাউন আসিয়াকেও চূড়ান্ত শাস্তি দিতে মনস্থির করল।

প্রথমে ফেরাউন তাকে অপমানিত করার ইচ্ছা করল। সবার সামনে তাকে উলঙ্গ করার নির্দেশ দিল। এখন আপনারই বলুন, কোনো পুরুষকে সবার সামনে উলঙ্গ করার কথা বললে তার কেমন লজ্জাবোধ হয়? অপরদিকে আসিয়া একজন নারী। আর নারীকে আল্লাহ অধিকতর লজ্জাশীলা করে সৃষ্টি করেছেন। ফেরাউন তাকে উলঙ্গ করে ফেলল। এখন বুঝুন, আসিয়া কোন পরিস্থিতির শিকার। একদিকে ঈমান আর অন্য দিকে পরীক্ষা। তারপর ফেরাউন আসিয়াকে বলল, তারপরও না মানলে তোমাকে আরো কঠিন শাস্তি দেব। ফেরাউন নির্দেশ দিল, তার মুখটা আমার প্রাসাদের দিকে ঘুরিয়ে দাও, যাতে তাঁর আরাম-আয়েশ ও আমার পক্ষ থেকে পাওয়া বিলাসি যিন্দেগির কথা স্মরণ হয়। ফেরাউনের হুকুম অনুযায়ী তা-ই করা হলো। তখন আসিয়া (রাযি.)-এর হাত-পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হলো।

তারপরও কাজ না হওয়ায় ফেরাউন আসিয়া (রাযি.)-এর শরীর থেকে চামড়া তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। চিন্তা করুন, আসিয়া ছিলেন জীবিত মহিলা। এখন তাঁর শরীর থেকে চামড়া তুলে ফেলা হবে। এক তো নারীর দেহ, অপরদিকে নারীদেহ পুরুষের দেহের তুলনায় বেশি স্পর্শকাতর। কিন্তু আসিয়া (রাযি.) বরদাশত করে চলেছেন। আল্লাহর কারণেই তাঁকে এই শাস্তি দেওয়া হলো। আল্লাহর শান দেখুন, চামড়া তুলে নেওয়ার পরও আসিয়া (রাযি.) জীবিত ছিলেন। কিন্তু তার শরীর জখমে ঝাঁজরা হয়ে গিয়েছিল। এখানেই শেষ নয়। তারপর ফেরাউনের নির্দেশ আসিয়া (রাযি.)-এর সমস্ত শরীরে মরিচের গুড়া ছিটিয়ে দেওয়া হলো। আহত মাছের মতো তিনি ছটফট করতে লাগলেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছিলেন–

رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

'হে আল্লাহ! এই প্রাসাদের পরিবর্তে জান্নাতে আপনার সন্নিকটে আমার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করুন।'[১]

---

১. সূরা তাহরীম : আয়াত ১১

وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ.

'আমাকে ফিরাউন ও তার দুষ্কর্ম থেকে উদ্ধার করুন এবং আমাকে যালেম সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিন।'[১]

ওই অবস্থায়ই আল্লাহ তাঁকে শাহাদতের মর্তবা দান করেন।

## হযরত মুশাতা (রাযি.)-এর পুরস্কার

আল্লাহ কেমন পুরস্কারদাতা! ওই দুই নারী তাঁর নামে স্বীয় জীবন বিসর্জন দিয়ে দিলেন। আর আল্লাহ তাদের কিভাবে ঈর্ষণীয় বদলা দিলেন। হাদীছে আছে, মেরাজের রাতে বাইতুল মাকদাস সফরের সময় নবীজি এক উপত্যকায় বিরল এক সুঘ্রাণ অনুভব করলেন। জিবরীলকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ফেরাউনের দরবারে মুশাতা নামের এক চাকরানী ছিল। এখানে তার কবর রয়েছে। তার কবর থেকেই সুগন্ধি আসছে।

## হযরত আসিয়া (রাযি.)-এর পুরস্কার

হযরত আসিয়া কী পুরস্কার পেলেন? হাদীছে এসেছে, যখন খাদিজা (রাযি.) অন্তিম শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন নবীজি তাঁকে বললেন, খাদীজা! তুমি তো আল্লাহর কাছে চলে যাচ্ছ। জান্নাতে গিয়ে আমার বিবিকে সালাম দিয়ো। খাদীজা (রাযি.) একথা শুনে হয়রান হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার তো আগে কোনো স্ত্রী ছিল না। তাহলে জান্নাতে আমার আগে আপনার কোন স্ত্রী? নবীজি বললেন, তুমি পৃথিবীতে আমার প্রথম বিবি। কিন্তু মরিয়ম ও আসিয়া তোমার আগে জান্নাতে চলে গেছে। আল্লাহ তাঁদের আমার স্ত্রী করে দিয়েছেন।

দেখুন, ফেরাউনের প্রাসাদ ও নায-নেয়ামতে লাথি মারার কারণে আল্লাহ তাঁকে প্রিয়নবীর স্ত্রী করে দিয়েছেন। আল্লাহ! আপনি কত বড় বদলা দানকারী। যে বান্দা আপনার রাস্তায় কুরবানি করে, আপনি তাকে এর চেয়েও উত্তম বদলা দান করেন। কোথায় আসিয়া ফেরাউনের স্ত্রী ছিলেন আর জান্নাতের আল্লাহ তাঁকে প্রিয় নবীর স্ত্রী বানিয়ে দিলেন!

## আল্লাহর রহমতের আশা

আমদেরও উচিত, আমরা দীন ইসলামের হেফাজতের জন্য দৃঢ়তার সাথে সামনে অগ্রসর হব; তাহলে আল্লাহর সাহায্য আমাদের সাথেও থাকবে।

---

১. সূরা তাহরীম : আয়াত ১১

আমরা সব সময় দু'আ করব, আল্লাহ যেন আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে হেফাজত করেন। কেননা, আমরা দুর্বল, অসহায়। আমাদের অবস্থাদৃষ্টে আসলেই ভয় হয়। হে আল্লাহ! আমাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। আপনার রহমতই আমাদের একমাত্র ভরসা। আমরা শুধু মুখে কালিমা উচ্চারণ করছি। হে পরওয়ারদেগার! আপনি আমাদেরকে তার সম্মান রক্ষা করার তাওফীক দিন। হে আল্লাহ! তোমার যেসব বান্দা দুনিয়াতে তোমার দীন প্রতিষ্ঠা করছে, আজকে পুরা দুনিয়া মিলে সেই নিঃস্ব-অসহায়দের হুমকি দিচ্ছে, তারা এই জমিন থেকে তোমার নাম-নিশানা মিটিয়ে দেবে। হে আল্লাহ! আপনি ছাড়া তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। হে আল্লাহ! আপনি তাদের পৃষ্ঠপোষক, আশ্রয়দাতা। আপনি তাদের দৃঢ় থাকার তাওফীক দান করুন। হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরও দীনের জন্য কবুল করুন। আজীবন আমাদেরকে দীনের উপর জমে থাকার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে শাহাদাতের মৃত্যু নসিব করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

# ছিলেন তিনি মনের ওষুধবিক্রেতা

'আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। তাঁর দু'আ আমাদের জন্য পাহারার কাজ দিত। যেমনিভাবে ভেড়া-বকরির জন্য একজন রাখাল থাকে এবং তার উপস্থিতিতে বন-জঙ্গলের হিংস্র কোনো প্রাণী বকরির পালে ক্ষতি করতে না পারে, ঠিক তেমনি শায়খের উপস্থিতিতে মুরীদদের অন্তরে আল্লাহর রহমতের পাহারা বসে।'

# ছিলেন তিনি মনের ওষুধবিক্রেতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. وَيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ مَقَامٍ اٰخَرَ : اَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ . اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ .لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ مَقَامٍ اٰخَرَ : يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ . وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُوْنَ . وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ . اَلَّذِيْنَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيْبَةٌ قَالُوْا إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ . أُوْلٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ .

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ.

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

## বড় একটা ব্যথা

আজ আমরা সবাই এখানে একত্রিত হয়েছি। সবার অন্তরে একটা ব্যথা আছে। এ এমন ব্যথা যে, মনে হয় এর চেয়ে ভারী বা কষ্টকর আর কিছু হতে পারে না। আমাদের অন্তরে এমন এক বেদনা যে, যদি তা পাহাড়ের ওপর চেপে দেওয়া হয়, তাহলে সম্ভবত পাহাড়ও তা সামাল দিতে পারবে না।

## আল্লাহর রহমতের পাহারা

আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। তাঁর দু'আ আমাদের জন্য পাহারার কাজ দিত। যেমনিভাবে ভেড়া-বকরির জন্য একজন রাখাল থাকে এবং তার উপস্থিতিতে বন-জঙ্গলের হিংস্র কোনো প্রাণী বকরির পালের ক্ষতি করতে

পারে না, ঠিক তেমনি শায়খের উপস্থিতিতে মুরীদদের অন্তরে আল্লাহর রহমতের পাহারা বসে। এজন্য বলা হয়–

سایہ مرشد بہتر است از ذکر حق

'তথা মুরশিদের ছায়া আল্লাহর স্মরণ থেকে উত্তম।'

## হেফাযতের জন্য একটি মাসনুন দু'আ

শায়খ অনেক দয়াবান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। সবাই মনে করত, তাঁর সাথে আমারই সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি ভালো। তাঁর গুণাবলি এক মজলিসে বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব হবে না। শুধু এতটুকুই বলছি যে, আমাদের অন্তরে বড় ব্যথা।

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُفْتِنَّا بَعْدَهُ

এই দু'আর বরকতে আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন।

## শায়খের বিরহের কষ্ট

শায়খের সাথে মুরীদের যতটুকু সম্পর্ক হয়, তাকে হারালে ব্যথা ততটুকু হয়। এ বিষয়ে সবার অবস্থা এক রকম হয় না। পূর্বসূরীরা এই পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর তাদের ভক্তদেরও এই অবস্থা হয়েছিল। ইতিহাসের পাতায় এ রকম অনেক ঘটনা রয়েছে।

## মহব্বত তো এমনই হয়!

সাহাবী ওমর (রাযি.)-এর ওফাতের পর সুহাইব রুমি (রাযি.) বিরহের ব্যথায় আওয়াজ করে বলেছিলেন,

وَاعُمَرَاهُ! وَاحَبِيْبَاهُ! وَاأَخَاهُ!

'আহ ওমর! আহ দোস্ত! আহ আমার ভাই!'

অন্য এক সাহাবী তাঁকে তালকীন করছিলেন, ধৈর্য ধরো। এমন করো না। ওই সাহাবী বললেন, আমি ওমরের মৃত্যু নিয়ে কাঁদছি না। বরং ইসলাম তাঁর মৃত্যুর ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে; এজন্য কাঁদছি।

## ঈমান বাকি থাকার মাধ্যম

কোনো-কোনো বুযুর্গের অস্তিত্ব লক্ষ-লক্ষ মানুষের ঈমান টিকে থাকার ওসিলা হয়। এ রকম ব্যক্তিবর্গের পৃথিবী থেকে উঠে যাওয়া কোনো সাধারণ বিষয় নয়। তাঁরা তো পৃথিবীতে বিপ্লবের মতো হয়ে থাকেন। কিন্তু

جو بادہ خواہ تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں

'পুরাতন (প্রেমসুধা) পানকারী যারা ছিলেন, তারা একে-একে চলে যাচ্ছেন।'

তারা চলে যাওয়ার পর যমীনের ওই অংশ কাঁদে, যেখানে বসে তারা ইবাদাত করতেন। আসমানের ওই দরজা কাঁদে, যেখান থেকে তাঁদের রিযিক আসত। তাঁদের বিচ্ছেদ অন্তরে এমন জখম সৃষ্টি করে, যার কোনো মলম নেই। খাজা নিযামুদ্দীন আওলিয়ার ইন্তিকালের পর আমীর খসরু হিন্দী ভাষায় একটি কবিতা লিখেন, যার একটি পঙ্‌ক্তি নিমরূপ-

چل خسرو گھر آپنے سانج پئی سب دیس

'হে খসরু! পুরো পৃথিবীকে অন্ধকাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। কাজেই তুমি তোমার ঘরের দিকে চলো।'

## পীর ও মুরীদের চিরস্থায়ী মহব্বত

আমীর খসরু খাজা নিযামুদ্দীনের মুরীদ ছিলেন। খাজা নিযামুদ্দীন আমীর খসরুকে এত মহব্বত করতেন যে, তিনি বলতেন, শরীয়তে অনুমিত থাকলে আমি ওসিয়ত করে যেতাম, যেন আমাকে ও আমীর খসরুকে একই কবরে দাফন করা হয়। অপরদিকে আমীর খসরুর অবস্থা ছিল, খাজা নিযামুদ্দীনের কাছে একবার এক ভিক্ষুক এল। তখন খাজা নিযামুদ্দীনের কাছে কিছু ছিল না। তাই তিনি স্বীয় জুতাজোড়া খুলে ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন। ওই ভিক্ষুক জুতা নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় আমীর খসরু তাকে দেখতে পেলেন। তিনি পীরের দরবারে যাচ্ছিলেন। তিনি ভিক্ষুকের কাছে জুতা দেখে চিনে ফেললেন।

আমীর খসরু ভিক্ষুককে বললেন, তুমি কি আমার সাথে এই সওদা করতে রাজী আছ যে, এই জুতা আমাকে দিয়ে দিবে আর আমি তোমাকে কিছু পয়সা দেব? ভিক্ষুক ব্যাপারটি বুঝতে পেরে বলল, না; আমি এর বিনিময়ে আপনার থেকে অনেক বেশি বিনিময় নেব। আমীর খসরু ভিক্ষুককে তার চাহিদামতো দাম দিয়ে জুতাজোড়া মাথায় নিয়ে খাজা নিযামুদ্দীনের দরবারে হাজির হলেন। আমীর খসরু বলতে লাগলেন–

من تو شدم تو من شدی من تن شدن تو جاں شدی

تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

আমি তুমি হয়ে যাব তুমি আমি হয়ে যাবে, আমি শরীর হয়ে যাব তুমি রূহ হয়ে যাবে। পাছে কেউ না বলে তুমি আমি ভিন্ন কিছু।

## হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের চিন্তা

শায়খের পক্ষ থেকে কেউ সারা জীবন বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়ে বলেছিল-

حال من در ہجر حضرت کم تر از یعقوب نیست

اوں پسر گم کردہ بود و من پدر گم کردہ ام

'আমার অবস্থা হযরত ইয়াকুব (আ.) থেকে ব্যতিক্রম নয়। কেননা, তাঁর থেকে তাঁর ছেলে আলাদা হয়ে গেছে আর আমার থেকে আমার বাপ আলাদা হয়ে গেছেন।'

চিন্তা করে দেখুন, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের দুশ্চিন্তা কোন পর্যায়ে হয়েছিল, তা কুরআন বর্ণনা করেছে-

وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ

'ছেলের বিরহে কাঁদতে-কাঁদতে তার চোখদুটি সাদা হয়ে গেছে।'[১]

কেউ বলল, ছেলের বিরহে যদি তিনি এত কাঁদেন, তাহলে পিতার বিরহে কী করবেন?

## শায়খের ওফাতে রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহ.)-এর প্রতিক্রিয়া

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর ওফাতের পর হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহির অবস্থা এমন হয়েছিল যে, পনেরো দিন পর্যন্ত তাঁর রক্তের দাস্ত হয়েছিল। কেমন কষ্ট তিনি পেয়েছিলেন! এ বাস্তব যে, সম্পর্ক যত বেশি হবে, বিরহবেদনাও সেই পরিমাণ হবে।

## সময়ের দুর্লভ ব্যক্তিত্ব

হযরত শায়খের মতো মহৎ ব্যক্তিত্ব ও উত্তম আখলাকের নমুনা হয়তোবা হাজারো বছরে আর জন্মাবে না। তাঁর তাকওয়া, দুনিয়াবিমুখতা, ইল্‌ম ও প্রভাবের ব্যাপারে বড়-বড় আলেমগণও স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁকে আল্লাহ পুরো পৃথিবীতে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা দান করেছেন। এমন ব্যক্তিত্ব সব সময় পৃথিবীতে আসে না।

---

১. সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৪

سرود رفتہ باز آید کہ ناید • نسیم از حجاز آید کہ ناید

প্রেমিকের বীনার সুর ফিরে আসুক বা না আসুক,

হেজায হতে মৃদুমন্দ হাওয়া আসুক আর না আসুক;

سر آمد روزگارآں حیئے • دگر دانائے راز آید کہ ناید

যুগের নেতা স্বয়ং তার নামে তাসবীহ জপছে,

অন্যান্য রহস্যজ্ঞানীরা আসুক বা না আসুক;

জানা নেই এমন যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জন্ম আর হবে কিনা।

কোনো কবি বলেন,

ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا

সহস্র বছর পর্যন্ত নারগিস ফুল তার দ্যোতি হারিয়েছে, কাঁদছে,

পুষ্পকাননে এমন জ্যোতির্ময় ফুল খুব সামান্যই জন্মায়।

## হযরত শায়খের দিবারাত্রির একটি ঝলক

আমার শায়খ তাঁদের একজন ছিলেন, যাঁরা কুরআনের আয়াত

إني دعوت قومي ليلا ونهارا

(আমি আমার জাতিকে ডেকেছি রাতে ও দিনে।[১])

এর নমুনায় সারাটা জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাদের সারা জীবনের উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। তাঁরা প্রত্যেকের উপর নজর রাখতেন। তারা তরবিয়তও করতেন আবার সতর্কও করতেন। আবার ভুল-ভ্রান্তিও ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতেন। তাদের চেহারা দেখে আমাদের ভিতরে সজীবতা ফিরে আসে।

## নবীজির ওফাতে সাহাবায়ে কেরামের উপর প্রতিক্রিয়া

মুহাতারাম হাযিরীন! এ ব্যথা শুধু আমাদের নয়; বরং বড়দেরও এ ব্যথা হয়েছে। আনাস (রাযি.) বলেন,

---

১. সূরা নূহ : আয়াত ৫

كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ دَخَلَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلَّ شَيْئٍ وَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِيْ مَاتَ فِيْهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلَّ شَيْئٍ

'যেদিন নবীজি মদীনা মুনাওয়ারায় আগমন করেছিলেন, সেদিন সবকিছু আলোকিত হয়ে গিয়েছিল। অপরদিকে যেদিন তিনি ইনতিকাল করলেন, সেদিন সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল।'

এর আগে তিনি বলেন,

وما تقضانا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه حتي أنكرنا قلوبنا

'নবীজির ওফাতের পর তাঁর দাফন থেকে অবসর হওয়ার আগেই আমাদের অন্তরে পরিবর্তন আসতে শুরু করল।'

অর্থাৎ– তাঁর ওফাতের পর আমাদের সবকিছুর মধ্যে পরিবর্তন এসে গিয়েছে। আজ আমাদেরও সেই অবস্থা হয়েছে। এটা নিতান্তই স্বাভাবিক বিষয়।

## নবীজির আদর্শের তালকীন

কোনো ফকীহ বা কোনো মুহাদ্দিছের মৃত্যু হলে তাঁদের শিষ্যরা একত্রিত হয়ে একে অপরের সাথে সাক্ষাতের সময় বলতেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে সুন্দর আদর্শ।'

এ বিষয়ে এক কবি লিখেন-

اصبر لكل مصيبة وتجلد • واعلم بأن المرء غير مخلد

واصبر كما صبر الكرام فانها • نوب تنوب اليوم تكشف فى غد

فاذا اتتك مصيبة يشجى بها • وذاكر مصابك بالنبى محمد

'কোনো বিপদে আক্রান্ত হলে তুমি সবর করো। মনে রেখো, কোনো কিছুই মানুষের ওপর স্থায়ী হয় না। বুযুর্গ ব্যক্তিদের মতো তুমিও সবর করো। আজ বিপদ এলে কাল তা দূর হয়ে যাবে। মনে রেখো, তোমার ওপর যদি এমন মুসিবত আসে, যার ফলে চেহারা বিমর্ষ হয়ে যায়, তাহলে এই মুসিবত সাহাবীদের ওপরও এসেছিল নবীজির ওফাতের পর।'

## বিপ্লবী লোকের করণীয়

এখন প্রশ্ন হতে পারে, এখন কি আমরা শুধু কেঁদে সময় পার করব, দুঃখ করেই যেতে থাকব? না, বরং আমরা দেখব, এমতাবস্থায় আমাদের শায়খের শিক্ষা কী ছিল। আমাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে। দুনিয়ায় যে বুর্যুগই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা কেবল তার ব্যক্তিগত কাজেই লাগেনি। বরং তা দুনিয়ার বিপ্লব সৃষ্টি করে গেছে। তাঁর ওফাতের পর তাঁর অনুসারীরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

## আবুবকর (রাযি.)-এর শিক্ষণীয় বক্তৃতা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে এমনভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, তাঁর ইনতিকালের পর তাঁদের হুঁশ হারিয়ে যাচ্ছিল। হযরত ওমরের মতো মহান সাহাবীও তরবারী হাতে নিয়ে বলতে লাগলেন, যে বলবে, নবীজি নেই, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেব। নবীজি তো আল্লাহর সাথে দেখা করার জন্য গেছেন। কিন্তু নবীজির শিক্ষাও তাঁর সামনে ছিল। তিনি একটি রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন, যার মূল অনেক গভীরে ছিল। এজন্য তখন সাহাবী আবুবকর (রাযি.) দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন–

'শোনো হে লোকেরা! যদি তোমরা মুহাম্মদের ইবাদাত করে থাক, তাহলে তিনি ইনতিকাল করেছেন। অপরদিকে তোমার যদি আল্লাহর ইবাদাত করে থাক, তাহলে মনে রাখো, আল্লাহ চিরঞ্জীব। ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْقُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰى اَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ.

'মুহাম্মদ একজন রাসূলমাত্র। তার পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছে। সুতরাং যদি সে মারা যায় অথবা নিহত হয়, তাহলে কি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে? কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনও আল্লাহর ক্ষতি করবে না, বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।'[১]

সাহাবীগণ বলেন, এই আয়াত আমরা আগে থেকেই পড়তাম। কিন্তু ওইদিন আবুবকর (রাযি.)-এর মুখে এই আয়াত শুনে মনে হচ্ছিল, যেন আয়াতটি আজই নাযিল হয়েছে।

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৪৪

گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف
ترے وجود پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب

'ইমাম রাযী বল আর সাহেবে কাশ্‌শাফ বল, কেউ বিপদমুক্ত করতে পারবে না, যতক্ষণ-না তোমার অস্তিত্বে কুরআনের অবতরণ না হবে।'

আবুবকর (রাযি.) দাঁড়িয়ে নবীজির স্থলাভিষিক্ত হওয়ার দায়িত্ব পালন করলেন। তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করার পর ওমর (রাযি.)-এর হুঁশ ফিরে এল।

## আমাদের দায়িত্ব

এখন আমাদের সামনে করণীয় দুটি। প্রথমত, শায়খের বিরহে আমরা আশাহত হয়ে বসে থাকব। দ্বিতীয়ত, আমরা আমাদের শায়খের পক্ষ থেকে জীবনে যে শিক্ষা পেয়েছি এবং যে নির্দেশনা তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন, তা অনুসরণ করে নতুন করে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে সামনের দিকে পা বাড়াই। আমাদেরকে নতুনভাবে প্রতিজ্ঞা নিয়ে শুরু করতে হবে। আল্লাহ আমাদের এই দুঃখ ও বেদনার কথা সম্পর্কে অবগত আছেন। এর বিনিময়ে মুমিন বদলা পায়। যদি আমরা এতে ধৈর্য ধারণ করে ঈমান ও তাকওয়ার সাথে চলি, তাহলে আমরা দুনিয়াতেই কামিয়াব হব। আখেরাতেও আল্লাহর সন্তুষ্ট হবেন। কেননা, হাদীছ শরীফে এসেছে–

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

'মানুষের হাশর তার সাথে হবে, যাকে সে ভালবাসে।'

আমার বন্ধুগণ!

আমাদের শায়খের প্রতি অত্যন্ত মহব্বত ছিল। এখনও যদি তা ওই রকমই থাকে, তাহলে তা কাজে আসবে। তাঁর প্রতিটি কথা ও কাজের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমল করতে থাকলে মহব্বত আরো বাড়বে। যেমন আল্লাহ পাক দুনিয়াতেই তাঁর জীবদ্দশায় দান করেছিলেন। হাউজে কাওছারে আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে পারব। আমরা এমনই আশা রাখি। আমাদের প্রতিও তাঁর এমনই আশা ছিল যে, আমরা যাতে ভালোভাবে মেহনত করে আল্লাহর পরিচয় লাভ করি। কেননা, মালী বাগানে কোনো চারা লাগালে সে চায়, তা ফল ও ফুলে ভরে উঠুক।

সুতরাং আল্লাহর হুকুম ও সুন্নতের অনুসরণ করে আমরা যিন্দেগি অতিবাহিত করলে আমাদের শায়খের আত্মা শান্তি লাভ করবে। আমরা আজ

প্রতিজ্ঞা করি যে, হযরতের দেওয়া নির্দেশনা ও আমল অনুযায়ী আমরা যিন্দেগি অতিবাহিত করব; তাহলে আল্লাহ আমাদের প্রতি রহম করবেন এবং আমাদের কামিয়াব করবেন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

'আল্লাহর জন্য কোনো কাজই কঠিন নয়।'

চেষ্টা করা বান্দার দায়িত্ব। কেউ একজন বলেছিল, দুনিয়ার লম্বা সফর এক পা উঠানোর দ্বারাই শুরু হয়। আমরা অন্তরে এ নিয়ত করে কদম উঠাব, তো আল্লাহ অবশ্যই আমাদের কামিয়াব করে দিবেন। তথা গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দিবেন।

আল্লাহর রহমত নাযিল হওয়ার পরিচয় হলো, যখন সে আসে, বান্দার নৌকাকে কিনারায় লাগিয়ে দেয়। আমাদের আগের-পিছের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তির ওপর আফসোস করে নফসের ধোঁকায় না পড়ে বরং গন্তব্যের দিকে আগে বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। যেমন- দুই পাহলোয়ান কুস্তিতে লড়ার সময় উভয়ই একে অপরকে পরাজিত করার চেষ্টা করে। যদি একজন নিচে পড়ে যায়, তারপরও সে দম ছাড়ে না, চেষ্টা চালিয়ে যায় যে, আমি উপরওয়ালাকে নিচে নিয়ে আসব এবং সব সময় সুযোগের সন্ধানে থাকে, আকল খাটায়। বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। যদ্দরুন সে জয়ী হয়ে যায়। যদিও আমরা কোনো সময় হোঁচট খেয়ে যাই, তারপরও তাওবা করে গন্তব্যকে সামনে রেখে কদম উঠাতে থাকি। এক বুযুর্গ বলেন,

نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو

تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے

'নফসের পাহলোয়ানকে কেউ চিত করতে পারেনি,

তাই বলে হাত-পা এভাবে ঢিলা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়।'

ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی

کبھی وہ گرالے کبھی تو گرالے

'আরে! তার কাছে তো জীবনের তরী আছে,

কখনও সে উল্টে দেয় তরী; কখনও তুমি উল্টে দাও।'

যদি কোনো সময় নফস আমাদের দাবাতে চায়, তাহলে সময় সুযোগমতো আমরাও নফসকে দাবাই। নফসের সাথে লড়াইয়ের সময়

আমরাও সর্বাত্মক চেষ্টার পাশাপাশি এই আশা রাখি যে, আমাদের হযরত শায়খ যেভাবে কামিয়াব হয়েছেন, আমরাও তাঁর ফয়য ও বরকতে নফসের সাথে লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হব। এর অর্থ হলো কালেমার ওপর আমাদের রূহ বের হবে। এটিই আমাদের প্রকৃত বিজয়।

## হযরত শায়খের শেষ মুহূর্তের একটি ঝলক

হযরত শায়খের মৃত্যু কত সুন্দর ছিল! তিনি কুরআনের এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ.

'হে মুমিনরা! তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।'[১]

এই আয়াত পড়া অবস্থায় হযরতের চেহারায় মুচকি হাসি ফুটে উঠল। তারপর তাঁর আত্মা বের হয়ে গেল।

نشان مرد مومن با تو گویم

چوں مرگ آید تبسم برلب اوست

'আমি তোমাদের মুমিনের নিদর্শন বলব। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, তখন তাঁর চেহারায় হাসির ঝলক ফুটে ওঠে।'

গতকাল আমরা দেখেছি, কিভাবে হযরত মুচকি হেসে বিদায় নিলেন। চেহারায় কেমন আলোর ঝলকানি ছিল। গোসল দেওয়ার সময় শরীর নরম অনুভূত হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, তিনি কিছুক্ষণের জন্য আরাম করছেন।

আমার বন্ধুগণ!

আমাদের একটিই পথ খোলা আছে। আমরা এখন নিয়ত করি, যে চারা তিনি লাগিয়ে গেছেন, তা আমরা ফলে-ফুলে ভরে তুলব।

## কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ুন

হযরত শেষ মুহূর্তে কুরআন শুনতে-শুনতে বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে। সারাটা জীবন তিনি কুরআন নিয়ে কাটিয়েছেন। কথাবার্তার সময় বিভিন্ন স্থানে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করতেন। মনে হতো, তিনি ইল্‌মের দরিয়া, যা তিনি প্রবাহিত করে চলেছেন। তিনি সর্বদা স্বীয় মুরীদ ও ভক্তবৃন্দকে

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৫৩

কুরআনের সাথে সম্পর্ক মজবুত করার কথা বলতেন। এতেই আমাদের জন্য মুক্তি রয়েছে। তিনি বলতেন,

ہمیں کہتا ہے یہ قرآن

او میرے ماننے والے مسلمان

تیرے ہاتھ میں ہو قرآن پھر تو دینا میں رہے پریشان

تیرے ہاتھ میں ہو قرآن پھر تو دنیا میں ہو ناکام

تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں بنے غلام

غلامی نفس کی ہو شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، ناں ناں ناں

ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، او میرے ماننے والے مسلمان!

اِقْرَاء وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ تو پڑھ قرآن تیرا رب کرے گا تیرا اکرام

تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا

আমাদেরকে বলে এই কুরআন

ও আমার অনুসরণকারী মুসলমান!

তোমার হাতে কুরআন; অথচ তুমি দুনিয়ায় থাকবে পেরেশান!

তোমার হাতে কুরআন; অথচ তুমি থাকবে ব্যর্থ!

তোমার হাতে কুরআন; অথচ তুমি থাকবে অন্যের গোলাম!

গোলামি চাই নফসের হোক অথবা শয়তানের কিংবা মানুষের!

না, না, না!

আমাদের বলে এই কুরআন।

ও আমার অনুসরণকারী মুসলমান!

তুমি 'ইকরা বিসমি রাব্বিকাল আকরাম' পড়ো।

তুমি কুরআন পড়ো,

তোমার প্রভু তোমার মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন,

তোমার প্রভু তোমার প্রতাপ-প্রতিপত্তি সমৃদ্ধ করবেন

তোমার প্রভু তোমার ভিতর-বাহির সব আলোকিত করবেন।

## হযরত শায়খের শিক্ষার সারসংক্ষেপ

আমি এখানে তিনটি আয়াত তেলাওয়াত করছি, যা হযরত অধিকাংশ সময় তেলাওয়াত করতেন। হযরত এই আয়াতগুলো আমাদেরকে তার পক্ষ থেকে শিক্ষা ও নির্দেশনার সারসংক্ষেপ বলে উল্লেখ করতেন। কিন্তু তখন কথাগুলো বুঝে আসত না। হায়! এখন যদি আল্লাহ বুঝবার তাওফীক দিতেন!

প্রথম আয়াত :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوْا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا.

'হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদের ন্যায়-অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য করার শক্তি দান করবেন।'[১]

প্রথম আয়াত আমাদের জন্য অনেক বড় ভরসা এবং মানসিক শক্তির উৎস। আয়াতের অর্থ হলো, হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল ইয্যাত তোমাদেরকে পার্থক্য নির্ণয়কারী শক্তি দান করবেন, যদ্দরুন তোমাদের হক বাতিলের পরিচয় জানা হয়ে যাবে। এজন্য আমরা পরহেযগারী অবলম্বন করার পাশাপাশি মাথা থেকে পা পর্যন্ত যদি তাকওয়ার সাথে চলি, তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে কুরআনের এ আয়াত অনুযায়ী এই শক্তি দান করবেন।

দ্বিতীয় আয়াত :

فَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوْا بِاللهِ هُوَ مَوْلٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

'সুতরাং তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ করো। তিনি তোমাদের মালিক। তিনি তোমাদের কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।'[২]

হযরত স্বীয় মজলিস শেষ করার সময় প্রায়ই এই আয়াত তেলাওয়াত করতেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا

আমি হুবহু হযরতের বক্তব্যের অনুকরণে বলার চেষ্টা করছি। হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় ফরজ দায়িত্বের উপর থাকো।

---

১. সূরা আনফাল : আয়াত ২৯

২. সূরা হজ : আয়াত ৭৮

وَصَابِرُوْا

অন্যকে এর ওপর থাকার তালকীন করো।

وَرَابِطُوْا

শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এর উপর অটল থাকো।

وَاتَّقُوْاللهَ

আর পরহেযগারী অবলম্বন করো।

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

তাহলে সফলতা তোমাদের পদচুম্বন করবে।[১]

## আত্মার জখমের মলম

আল্লাহ আমাদের পরহেযগারী অবলম্বন করার পাশাপাশি হযরতের নির্দেশনা অনুযায়ী চলা ও তাঁকে মহব্বত করার তাওফীক দান করুন। আল্লাহ তাঁর সন্তানদেরকে দীর্ঘায়ু দান করুন। এরাই আমাদের জন্য হযরতের স্মৃতিবাহক। আল্লাহ তাঁদের মনকে হালকা করে দিন। আজ আমাদের সামনে মাওলানা আব্দুর রহমান কাসেমী উপস্থিত আছেন। পিতার তিরোধনের পর ছোট ভাই বড় ভাইকে দেখে মনকে সান্ত্বনা দেয়। তিনি আমাদের বড় ভাইয়ের মতো। তিনি যেন আমাদের পিতার স্থলাভিষিক্ত। তাঁকে দেখে আমাদের সান্ত্বনা হচ্ছে। আল্লাহ তাঁর ছায়াকে আমাদের ওপর প্রলম্বিত করুন।

আমাদের ঈমানকে আল্লাহ হেফাযত করুন। আমরা তাঁর কাছেই রহমত ও বরকত কামনা করি। আমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনার এক নেক বান্দার মকবুল দু'আ সব সময় আমাদের সঙ্গে থাকত। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পরীক্ষায় ফেলবেন না। আপনি পরীক্ষায় ফেলে দিলে আমরা পার পাব না। আমাদের ওপর আপনি রহম ও দয়া করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

---

১. সূরা আলে ইমরান : ২০০

# উত্তম চরিত্র

'উত্তম আখলাকের অপর নাম হচ্ছে 'চরিত্রের বিজয়'। মনে রাখা উচিত যে, এটা দেখতে বেশি ভালো দেখায় না, কিন্তু মানুষ এর দ্বারা অনেক বেশি বস্তু কিনে নিতে পারে। দুনিয়া তরবারীর মুকাবেলা করতে পারে, কিন্তু ভালো ব্যবহারের মোকাবেলা করতে পারে না। সব সময় ভালো ব্যবহারের বিজয় অর্জিত হয়।'

# উত্তম চরিত্র

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى. اَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ.

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

## উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তির মর্যাদা

একটি কথা প্রচলিত আছে যে, ফল দেখে গাছ চেনা যায়। এমনিভাবে মানুষকে তার চরিত্র দেখে চেনা যায়। যে গাছের ফল মিষ্টি হয়, সুন্দর ও সুস্বাদু হয়, মানুষ সেই গাছের যত্ন বেশি করে। তদ্রূপ যে মানুষের আখলাক সুন্দর হয়, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, তাকে সবাই পছন্দ করে। এজন্য আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

'যারা মানুষের উপকার করে, আল্লাহ তাদের পৃথিবীতে জমিয়ে দেন।'[১]

ইসলাম যেহেতু স্বভাবজাত ধর্ম, তাই এ ধর্মে আখলাককে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। নবীজি ইরশাদ করেন, ঈমানের পর সর্বাধিক উত্তম আমল হলো আখলাক। হাদীছে আরো বলা হয়েছে–

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

'উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানের অধিকারী।'

যেন আল্লাহর কাছে বান্দাকে মাপার মাপকাঠি হচ্ছে আখলাক। এই মাপকাঠি দ্বারা মানুষ নিজেই অনুধাবন করতে পারে, সে কোন পর্যায়ে আছে। উত্তম আখলাকের অধিকারীকে আল্লাহ ও মানুষ সকলেই পছন্দ করে। এজন্য

---

১. সূরা র'দ : আয়াত ১৭

যাকে উত্তম আখলাক দান করা হয়েছে, তাকে সমস্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে। উত্তম আখলাককে মানুষের চরিত্র বলা হয়।

যেভাবে সুন্দর মানুষকে দেখলে চোখ খুশি হয়, ঠিক তেমনিভাবে উত্তম আখলাকের অধিকারী কাউকে দেখলে অন্তর খুশি হয়, তার সাথে মহব্বত পয়দা হয়। সবাই তার কল্যাণ কামনা করে। এজন্য নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করতেন–

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ

'হে আল্লাহ! আপনি আমার সূরতকে যেরকম সুন্দর বানিয়েছেন, তেমনি আমার আখলাককেও সুন্দর করে দিন।'

## উত্তম আখলাক ঈমানের মাপকাঠি

যেকোনো মুমিনের ঈমান তার আখলাকের ওপর প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ– তার ঈমান যত মজবুত হবে, আখলাকও সেই অনুযায়ী দুরস্ত হবে। কেননা, আল্লাহর ভয় তাকে সব ধরনের মন্দ থেকে দূরে রাখবে। সে সর্বদা অন্যের হকের প্রতি খেয়াল রাখবে। অন্যের শান্তির জন্য চেষ্টা করবে। এজন্য নবীজি বলেন, 'যার আখলাক উত্তম, তার ঈমান পরিপূর্ণ।' কেমন মাপকাঠি তিনি বলে দিয়েছেন। ঈমানের আধিক্য ইবাদতের ওপর নয়; বরং আখলাক অনুযায়ী হবে। অন্য হাদীছে আছে,

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ

'নিশ্চয় মুমিন ব্যক্তি উত্তম ব্যবহারের ফলে সারা রাত নফল নামায ও সারা দিন রোযা রাখার সাওয়াব লাভ করে।'

## সর্বোত্তম বস্তু

একবার এক লোক নবীজিকে জিজ্ঞাসা করল, সর্বাধিক উত্তম বস্তু কোনটি, যা মানুষকে দান করা হয়েছে? নবীজি বললেন, উত্তম আখলাক। অর্থাৎ– যে এই নেয়ামত লাভ করেছে, সে সমস্ত কল্যাণ লাভ করেছে।

## চরিত্রের জয়

উত্তম আখলাকের অপর নাম হচ্ছে 'ভালো চরিত্র'। মনে রাখা উচিত, এটি দেখতে বেশি ভালো দেখায় না, কিন্তু মানুষ এর দ্বারা অনেক বেশি বস্তু কিনে নিতে পারে। দুনিয়া তরবারীর মোকাবেলা করতে পারে; কিন্তু ভালো

ব্যবহারের মোকাবেলা করতে পারে না। সব সময় ভালো ব্যবহারে বিজয় অর্জিত হয়। আয়েশা (রাযি.) বলেন,

فُتِحَتِ الْمَدِيْنَةُ بِالْأَخْلَاقِ

'মদীনা আখলাকের দ্বারা বিজিত হয়েছে।'

## আখলাকের স্তর

আখলাকের তিনটি স্তর আছে। যথা–

১. আখলাকের প্রথম স্তর হলো, যা ইয়াহুদিরা পেয়েছিল। একে আখলাকে হামীদাহ বলে। তাহলো, তোমরা মানুষের সাথে সমতার মুআমালা করো। অর্থাৎ– তুমি যে পরিমাণ কষ্ট পেয়েছ, সেই পরিমাণ বদলা তার কাছ থেকে আদায় করে নাও।

২. আখলাকের এই স্তর খ্রিষ্টানরা লাভ করেছিল। একে আখলাকে কারীমা বলে। এর অর্থ হলো, তোমাকে যে কষ্ট দিয়েছে, তাকে মাফ করে দাও। এজন্য খ্রিস্টানরা তাদের ভাষায় বলে বেড়াত, কেউ যদি তোমার এক গালে একটা চড় মারে, তাহলে তুমি তোমার অপর গালটা তার সামনে এগিয়ে দাও। তারা একে অনেক উত্তম আমল মনে করে।

৩. আখলাকের এই স্তর মুসলমানকে দান করা হয়েছে। একে আখলাকে আযীমা বলে। আল্লাহ ইরশাদ করেন,

وَإِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

'আপনি মহান চরিত্রের অধিকারী।'[১]

আখলাকে আযীমা হলো,

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْأَمْرِ.

'স্বীয় ভাইয়ের ভুলকে শুধু মাফ করা নয়; বরং তার জন্য আল্লাহর কাছে ইসতিগফার করে আগের ন্যায় সম্পর্ক বজায় রাখো। তাকে স্বীয় মশওয়ারায় অন্তর্ভুক্ত করো।'[২]

আল্লাহ ঈমানদার লোকদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন,

وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

---

১. সূরা নূন : আয়াত ৪

২. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৫৯

'তারা রাগকে দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ এহসানকারীদের পছন্দ করেন।'[১]

এজন্য আল্লাহ অন্য স্থানে বলেন,

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ . فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ.

'ভালো ও মন্দ কখনওই সমান নয়। তোমরা উত্তম পন্থায় দমন করো। ফলে শত্রুতা বন্ধুত্বে পরিণত হবে। ঘৃণার পরিবর্তে মহব্বত সৃষ্টি হবে।'[২]

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَاَمَّا مَايَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ

'যে মানুষের উপকার করে, আল্লাহ তার কদমকে দৃঢ় করে দেন।'

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তার কদমকে দৃঢ় রাখবেন। যে অন্যের উপকারে স্বীয় জীবন অতিবাহিত করে, আল্লাহ তাঁর কদমকে পৃথিবীর বুকে দৃঢ় করে দিবেন। এটি আল্লাহর নীতি যে, যেলোক মানুষের উপকারে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করবে, আল্লাহ তাকে দৃঢ়পদ করে দিবেন।

## ইসলামের সৌন্দর্য

আমাদের উচিত, আমরা আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর জন্য মহব্বত করি। এক রেওয়ায়াতে এসেছে–

اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللهِ

'সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারের আওতাভুক্ত।'

স্মরণ রাখা দরকার, যে আল্লাহর পরিবারের সাথে ভালোবাসা রাখে, আল্লাহ তাকে ভালবাসেন, মহব্বত করেন। হাদীছ শরীফে ইরশাদ হয়েছে–

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ

'তোমরা পৃথিবীবাসীদের উপর রহম করো; তাহলে আসমানওয়ালা তোমাদের উপর রহম করবেন।'

সুতরাং আমরা যদি চাই, আল্লাহ আমাদের উপর রহম করুন, তাহলে আমরা যেন আল্লাহর বান্দাদের উপর রহম করি। আমরা আল্লাহর বান্দাদের

---

১. সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৩৪

২. সূরা সাজদাহ : আয়াত ৩৪

আল্লাহরই জন্য ভালোসব। ইসলামের সৌন্দর্য দেখুন, এক তো হলো মুমিনকে মহব্বত করা। এটি তো হওয়াই চাই। কিন্তু সাধারণ মানুষকেও ভালবাসতে বলা হয়েছে।

## পৃথিবীতে ভাইয়ের গুরুত্ব

ঈমানদারগণকে এজন্য মহব্বত করা উচিত যে, কুরআনে বলা হয়েছে-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

'নিশ্চয়ই মুমিনরা ভাই-ভাই।'[১]

মনে রাখুন, দুনিয়া ও আখেরাতে ভাই-ই কাজে আসবে। কুরআনেরই একটি ঘটনা শুনুন। আল্লাহ মূসা আলাইহিস সালামকে নবী করার পর ফেরাউনের কাছে যাওয়ার হুকুম করলেন। ইরশাদ হয়েছে-

اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ

'তুমি ফেরাউনের কাছে যাও; সে সীমালংঘন করেছে।'[২]

ফেরাউন একজন বড় বাদশাহ ছিল। তার সৈন্য-সামন্তের অভাব ছিল না। মূসা আলাইহিস সালাম এ কারণে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করলেন। তখন তিনি নিজের সাহায্যের জন্য কাউকে খুঁজতে লাগলেন। তাঁর দৃষ্টি তাঁর ভাইয়ের উপর পড়ল। কুরআনে বিষয়টি বলা হয়েছে এভাবে-

اجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي. هَارُونَ أَخِي. اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي

'আমার পরিবার থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন– আমার ভাই হারুনকে। তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করে দিন।'[৩]

অর্থাৎ– দুনিয়াতেও যখন মাথার উপর কোনো বোঝা আসে, তখনও ভাইয়ের প্রয়োজন পড়ে। এটি দুনিয়ার হিসাব। এখন বোঝা উচিত, আখেরাতের মতো ভয়ানক পরিস্থিতিতে ভাইয়ের প্রয়োজন কেমন হবে!

## আখেরাতে ভাইয়ের গুরুত্ব

কেয়ামতের দিন আযাব দেখে যখন মানুষের সামনে সেদিনের বাস্তবতা প্রকাশ পেয়ে যাবে, তখন অপরাধীরা তা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ভাইকে খুঁজবে।

---

১. সূরা হুজরাত : আয়াত ১০
২. সূরা নাযিআত : আয়াত ১৭
৩. সূরা তোয়াহা : আয়াত ২৯-৩১

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيْهِ.

'সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভাই থেকে।'[১]

মোটকথা, দুনিয়া ও আখেরাতের সব জায়গায় ভাই-ই কাজে আসবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, আজ আমরা কারো ওপর ছুরি চালালে সর্বপ্রথম ভাইয়ের ওপর ছুরি চালাই। মুসলমানদের ঘরেই এই অবস্থা শুরু হয়ে গেছে। সাধারণ বিষয় নিয়েই সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলছে।

## বিবাদের অবসান

একটি হাদীছের ওপর আমল করা হলেই পৃথিবীর সমস্ত ঝগড়া খতম হয়ে যাবে। হাদীছটি হলো,

নবীজি ইরশাদ করেন–

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ

'শপথ ওই সত্তার, যার হাতে আমার জান, তোমরা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ-না তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ওই বিষয় পছন্দ করবে, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর।

এখন আপনারাই বলুন, যখন প্রত্যেক বান্দা তার অপর ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে, তখন পারস্পরিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগ থাকতে পারে কি? কখনওই নয়। আজকাল দুই ভাই ও বন্ধুর মাঝে বিদ্বেষ ও ঘৃণার যে প্রাচীর দেখা যায়, এর মূল কারণ হলো, না অপরের মান-সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখা হয়, না অপরের হকের প্রতি খেয়াল রাখা হয়।

## সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ

ইসলাম আমাদের সম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা দিয়েছে। নবীজি বলেন,

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَأَحْسِنْ إِلٰى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ

'যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক গড়ো। যে তোমার ওপর যুলুম করে, তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও। যে তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করে, তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করো।'

---

১. সূরা আবাসা : আয়াত ৩৪

এই তিনটি কথার দ্বারা নবীজি সমুদ্রকে বদনার মধ্যে আটকে দিয়েছেন। যে এই তিন কথার ওপর আমল করবে, তার জীবন সজ্জিত হয়ে যাবে। অল্প কথায় আমাদের নবীজিকে কত সুন্দর বিষয় দান করা হয়েছে। কেউ এই তিনটির যেকোনো একটির ওপর আমল করলে মানুষের হেদায়াতের জন্য যথেষ্ট হবে।

## সম্পর্ক ছিন্ন করার পরিণাম

যে সম্পর্ক ছিন্ন করে, আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, আল্লাহ শবে কদরে বড়-বড় অপরাধীকে মাফ করে দেন; কিন্তু কিছু বান্দাকে আল্লাহ ওই দিনও মাফ করেন না। এদের মধ্যে একজন হলো সম্পর্ক ছিন্নকারী। অথচ আজ অবস্থা হলো, বোনের সাথে বোনের আর ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক নেই। সন্তান মা-বাবার প্রতি নাখোশ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আল্লাহ যে সম্পর্ক গড়ার হুকুম করেছেন, তা নষ্ট করে মানুষ খুশি হচ্ছে। এটি কেয়ামতের আলামত। নবীজি বলেন, মানুষ বন্ধু-বান্ধবকে কাছে টানবে আর মা-বাবা থেকে দূরে সরে যাবে। মা-বাবার কথা জিজ্ঞাসা করলে যুবক ছেলেরা বলে, আম্মা বলেন, রাত দশটার আগে ঘরে ফিরতে হবে। আব্বা বলেন, ভোরে নামাযের সময় উঠতে হবে। তারা শুধু সময়ের পাবন্দি শেখান। অপরদিকে বন্ধুরা তাদের স্বাধীনতা শেখায়। এজন্য তারা ওখানেই বেশি যায়। তারা মনে করে, ঘরের পাবন্দির মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি আর বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে পারছি।

এর উদাহরণ হলো, আমাদের হাতের বাহু মনে করল, আমি তো শরীরের সাথে বাঁধা আছি; কিছু করতে পারছি না। এজন্য আমি শরীর থেকে আলাদা হয়ে গেলেই আমি কামিয়াব হয়ে যাব। যদি বাহু শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়, তাহলে এর মধ্যে পচন ধরবে, রাস্তার কুকুর একে চিবিয়ে খাবে। কারণ, এটা প্রাণহীন হয়ে গেছে। এই বাহু শরীরের সাথে লেগে থাকলে তা কাজে আসবে। ঠিক তেমনিভাবে সন্তান তার মা-বাবার সাথে মিলে থাকলে তার জীবন কাজে লাগবে।

নবীজি বলেন,

اَلْبَرَكَةُ مَعَ اَكَابِرِكُمْ

'তোমাদের বড়দের সাথে মিলেমিশে থাকার মধ্যে তোমাদের জন্য বরকত রয়েছে।'

## অতুলনীয় কীর্তি

উত্তম আখলাক বানাতে চেষ্টা করতে হয়। মুখ দিয়ে কথা বলা অনেক সহজ। কিন্তু আখলাককে বাস্তবে প্রকাশ করে দেখানো অনেক কঠিন। আগের নবীদের কওমের লোকেরা নবীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি যে সত্য নবী এর প্রমাণ কী? তখন প্রত্যেক নবী নিজ-নিজ মু'জিযা কওমের সামনে প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের নবীকে তাঁর নবুওয়তের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি বলেছিলেন, আমি কি তোমাদের সাথে জীবন কাটাইনি? আশ্চর্যের বিষয় হলো, নবীজির দুশমনরা তাকে পাগল ও জাদুকর বলেছে। কিন্তু তাঁকে মিথ্যাবাদী বলার সাহস কারো হয়নি। নবীজির আখলাক এতো সুন্দর যে, তাঁর প্রাণের দুশমনও তাঁর আখলাক নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস করেনি।

## কল্যাণকামিতার প্রশংসা

ঈমানদারগণের সর্বদা মজবুত চিন্তাশক্তির অধিকারী হওয়া উচিত। অন্যের পক্ষ থেকে মন্দের আশঙ্কা হলেও নিজে সর্বদা ভালো আচরণ করবে। এমন বান্দাকে আল্লাহ অনেক পছন্দ করেন। নবীজি বলেন,

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ

'দীন হলো কল্যাণকামিতা।'

নবীজি এ দুটি শব্দে পুরো দীন বুঝিয়ে দিয়েছেন।

## দীন ও কল্যাণকামিতার সম্পর্ক

আরবি ব্যাকরণে এক হয় মুবতাদা, এক হয় খবর। সাধারণত দুয়ের একটি মারেফা হয়, অপরটি নাকেরা। কিন্তু এই হাদীছে দীন ও নসীহত উভয় শব্দই মারেফা হয়েছে। আলেমগণের মতে মুবতাদা ও খবর উভয়টিই মারিফা হলে লাযেম ও মালযুমের সম্পর্ক হয়। এর অর্থ হবে, যা দীন, তাই কল্যাণকামিতা আবার যা কল্যাণকামিতা, তা-ই দীন। যেখানে কোনো মুসলমানের অপর মুসলমানের মন্দ বিষয় সামনে আসবে, সেখানে বুঝতে হবে, দীন উঠে গেছে।

## মুমিন ও কল্যাণকামিতা

মুমিনের কাজই হলো, সে সারা পৃথিবীর কল্যাণকামী হবে। প্রত্যেকেই তার দ্বারা উপকৃত হবে। কারো কষ্ট হলে সে ব্যথিত হবে। তার আচরণ

এমন হবে যে, তার নিকট আত্মীয়, প্রতিবেশী, এলাকাবাসী এবং বন্ধু-বান্ধব একথা বিশ্বাস করবে যে, তার পক্ষ থেকে আমরা কেউ কষ্ট পাব না। একবার কিছু লোক বসা ছিল। নবীজি তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি কি বলে দেব না, তোমাদের মধ্যে কে ভালো আর কে মন্দ? সবাই চুপ রইল। তিনি এ প্রশ্ন তিনবার করলেন। তারপর এক ব্যক্তি বলল, জি বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!।

তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে ওই লোক সবচেয়ে উত্তম, যে এমন অবস্থায় থাকে যে, তার কাছ থেকে সবাই ভালো আশা রাখে এবং মন্দের বিষয়ে আশ্বস্ত থাকে। আর মন্দ হলো ওই ব্যক্তি, যার পক্ষ থেকে মন্দের আশঙ্কায় লোক দূরে সরে থাকে। দেখুন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে বলেছেন। কষ্ট দেওয়ার কথা বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, এমনভাবে থাকো যে, লোকেরা তোমার বিষয়ে আশ্বস্ত হয়ে যায়।

## আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর প্রতিবেশিত্বর মূল্য

'হাম্বুর্গ' জার্মানির একটি শহর। ওখানে আমাদের এক বন্ধু থাকেন। তিনি জার্মান এয়ারলাইন্সে কাজ করেন। একবার আমি তার বাসায় গিয়েছিলাম। তার বাসা থেকে মসজিদ এক ঘণ্টার দূরত্বে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এত দূরে বাসা কেন নিয়েছ?

সে বলল, এখানে লোকেরা অনেক ভালো। উচ্চ শিক্ষিত জার্মান লোকেরা এখানে থাকে। তারা মুসলমানদে ঘর ভাড়া দেয় না। আমি এখানে অনেক কষ্টে বাসা পেয়েছি। তাই এখানে বসবাস করছি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, জার্মানরা মুসলমানদের ঘর ভাড়া দেয় না কেন? সে বলল, এখানে মুসলমানরা অন্যের হকের প্রতি খেয়াল রাখে না। এজন্য তারা ঘর ভাড়া দেয় না। তখন আমি তাকে বললাম, আমি আপনাকে একটা কথা বলব? সে বলল, বলুন। আমি বললাম,

যখন আমরা সঠিক অর্থে মুসলমান ছিলাম, তখন আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.)-এর এক ইহুদি প্রতিবেশী ছিল। কোনো এক কারণে তার জায়গা সে বিক্রি করতে চাইল। এক লোক ক্রয় করার জন্য এল। তারপর দাম জিজ্ঞাসা করলে ওই ইহুদি বলল, এর দাম দু-হাজার দিনার। উক্ত লোকটি বলল, এমন জায়গা এখানে এক হাজার দিনারেই পাওয়া যায়। ইহুদি জবাব দিল- হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই জায়গার দাম এক হাজার এবং বাকি এক হাজার দিনার আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক এর সম্মানে।

## মুমিন বান্দার মর্যাদা

আবু দাউদের এক রেওয়ায়াতে নবীজি একবার তাওয়াফরত অবস্থায় কাবা ঘরের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে কাবা! আল্লাহ তোমাকে অনেক সম্মান ও দামী করেছেন। কিন্তু একজন মুমিনের দাম আল্লাহর কাছে তোমার চেয়ে অনেক বেশি। চিন্তা করে দেখুন, আমরা কাবার দিকে ফিরে সিজদা করি। কাবার গেলাফ ধরে দু'আ করি। অথচ মুমিন লোককে ঘৃণা করি। তাকে কষ্ট দেই। আমাদের ঈমান থাকবে কী করে? আমরা দীনকে সহীহ করে শিখার চেষ্টা করি। দীন আমাদের কাছে কী চায়? কোনো কবির ভাষায়-

شنیدم کہ مردان راہ خدا

دل دشمناں ہم نہ کردند تنگ

'শুনেছি খোদার পথের পথিকরা শত্রুদের অন্তরেও ব্যথা দিত না।'

ترا کہ می شود ایں مقام

کہ با دوستاں ہست پیکار جنگ

'তোমার অবস্থা তো এই যে, বন্ধুর সঙ্গেও তুমি যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাও।'

আল্লাহওয়ালাদের সম্পর্কে শুনেছি, তারা দুশমনদের অন্তরেও কষ্ট দিতেন না।

## ভুলের অনুসন্ধান

অবস্থা হয়ে যাচ্ছে এমন যে, স্ত্রী স্বামীর ভুল দেখার জন্য দুরবিন লাগায়। স্বামীও স্ত্রীর ভুল-ভ্রান্তি দেখার জন্য বসে থাকে। অথচ তারা একে অপরের জীবনসঙ্গী। কিন্তু তারা একে অপরকে নীচু দৃষ্টিতে দেখে থাকে। মুসলমানি বাকি থাকে কিভাবে? আল্লাহ স্বামী ও স্ত্রী উভয়জনকেই একে অপরের লেবাস বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

'তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।'[১]

লেবাস শরীরকে ঢেকে রাখে এবং শরীরের দোষকে লুকিয়ে রাখে। যাকে আল্লাহ লেবাস বলেন, আমরা তার দোষ অনুসন্ধানে লেগে থাকি। প্রকৃত

---

১. সূরা বাকারা : আয়াত ১৮৫

পক্ষে সত্যি কথা হলো যে, যে যত বেশি নিকটের হয়, আমরা তার ব্যাপারে তত বেশি সংকীর্ণমনা হয়ে যাই। এ কত বড় আশ্চর্যজনক কথা!

## দোষ গোপন রাখার ফযীলত

আমার বন্ধুগণ!

শরীয়ত মাফ করে দেওয়াকে অনেক পছন্দনীয় বলে আখ্যায়িত করেছে। হাদীছে এসেছে, যে যত অন্যের ভুলকে মাফ করে দিবে, আল্লাহ তত দ্রুত তার ভুল-ত্রুটি কেয়ামতের দিন মাফ করে দিবেন। যে অপরের দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবে, আল্লাহ কেয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি লুকিয়ে রাখবেন। আজকে এই কথাকে অন্তরে গেঁথে নেওয়ার সময় এসেছে।

## মুমিনের মন খুশি করার ফযীলত

এক বর্ণনায় এসেছে, কেউ কোনো মুমিনের অন্তরকে খুশি করলে আল্লাহ তার জন্য একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন। উক্ত ফেরেশতা কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর প্রশংসা গায় আর তার ছাওয়াব ওই বান্দার আমলনামায় যোগ হতে থাকে।

হযরত আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নবীজি বলেন, যেব্যক্তি কাউকে খুশি করার জন্য কোনো প্রয়োজন পূরণ করে দিল, সে যেন আমাকে খুশি করল। আর যে আমাকে খুশি করল, সে যেন আল্লাহকে খুশি করল। আর যে আল্লাকে খুশি করল, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

এসব হাদীছ পড়ার পর আমরা নিজেদের নিয়ে চিন্তা করি যে, আমরা কি কখনও কোনো মুমিন ভাইয়ের খুশির জন্য এরকম কোনো কাজ করেছি? স্বীয় ভাইয়ের ছোট থেকে ছোট প্রয়োজন পূরণ করে দেওয়ার ফলে সারা জীবনের গোনাহ মাফ হয়ে যেতে পারে।

অন্য হাদীছে আছে, যে মুমিন তার অপর মুমিন ভাইয়ের জন্য চেষ্টা করে, আল্লাহ তার থেকে জাহান্নামকে তিন খন্দক দূরে সরিয়ে দেন। প্রত্যেক খন্দকের দূরত্ব আসমান ও যমীনের মাঝখানের ফাঁকা জায়গার সমান।

অন্য হাদীছে আছে, যেব্যক্তি কারো পেরেশানি দূর করার চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে ৭৩টি মাগফেরাত দান করেন। এগুলোর মধ্যে একটি দ্বারা তার দুনিয়ার সব কিছু সমাধান করে দিবেন এবং বাকি ৭২টি দ্বারা কেয়ামতের দিন তার মর্তবা বুলন্দ করে দিবেন।

## যবানের বিপদ

আমরা বন্ধুগণ!

আমার কারো অন্তর খুশি করতে না পারলেও অন্তত কারো অন্তরকে যেন কষ্ট না দেই। অন্তরের অসুস্থতার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক হলো কষ্ট দেওয়া। আমরা তা-ই করছি। স্বামী স্ত্রীকে এমন কথা বলে ফেলে যে, বেচারী সারাটা দিন কেঁদে-কেঁদে কাটিয়ে দেয়। আবার স্ত্রী স্বামীকে এমন কথা বলে যে, তার অন্তরের প্রশান্তি নষ্ট হয়ে যায়। এজন্যই বলা হয়, তরবারীর জখমের চিকিৎসা আছে, কিন্তু যবানের জখমের চিকিৎসা নেই। এই যবানই ওই আত্মীয়তাকে ছিন্ন করে দেয়, যা মানুষ তরবারী দ্বারা ছিন্ন করতে পারে না। আজকাল আমাদের যবান বেশি চলে। সবসময় শুধু বলতেই থাকি, শুনতে পারি না। শুধুই বলে যাই।

## বদযবানীর পরিণতি

একবার একব্যক্তি নবীজিকে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! অমুক মহিলা নামায, রোযা, সদকা সবই করে। কিন্তু সে প্রতিবেশীর সাথে মন্দ কথা বলে। এ বিষয়ে হুকুম কী? নবীজি বললেন, উক্ত মহিলা দোযখে যাবে। লোকটি বলল, অপর এক মহিলা নামায, রোযা, সদকা কম করে; কিন্তু সে প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং কোনোরূপ কষ্ট দেয় না। নবীজি বললেন, এই মহিলা জান্নাতে যাবে।

এর দ্বারা বোঝা গেল, বদ-আখলাকি কত মন্দ বিষয়। ইবাদাত করা সত্ত্বেও বদ-আখলাকির কারণে এই ইবাদাত তার কোনো কাজে আসবে না।

## রাগ দমন করার ফযীলত

হাদীছে এসেছে, কেউ কোনো প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি সে মাফ করে দেয় এবং রাগ হজম করে নেয়, তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাকে স্বীয় দিদার দান করবেন। সুবহানাল্লাহ! এটি কত বড় উত্তম সওদা!

## স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহারের বদলা

হযরত থানবী (রহ.) একটি ঘটনা লিখেছেন, এক লোকের স্ত্রী অনেক বড় ভুল করে ফেলল। এতো বড় ভুল ছিল যে, সে তাকে তালাক দিতে চাচ্ছিল। স্বামী হকের ওপর ছিল। কিন্তু লোকটি স্ত্রীকে আল্লাহর বান্দী মনে করে মাফ করে দিল। কিছুদিন পর তার মৃত্যু হলো। কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে বলল,

শোনাও ভাই! কী হলো? লোকটি বলল, আল্লাহ আমাকে অনুগ্রহ করে মাফ করে দিয়েছেন। সে জিজ্ঞাসা করল, কী কারণে মাফ পেলেন? লোকটি বলল, একবার আমার স্ত্রী বড় একটা ভুল করেছিল। আমি চাইলে তাকে শাস্তি দিতে পারতাম। কিন্তু আমি আল্লাহর বান্দী মনে করে তাকে শাস্তি দেইনি। আল্লাহ আমাকে বললেন, তুমি আমার বান্দীকে মাফ করে দিয়েছ; তাই আমিও তোমাকে মাফ করে দিলাম।

## তরবিয়ত হারিয়ে গেছে

আমি বহুবার দেখেছি, দুজন লোক তর্ক-বিতর্ক করছে। দুজনই সমানে কথা বলছে। কেউ কারও কথা শুনছে না। তখন মনে হয়, কেউ তাদের জীবনরীতি শেখায়নি। আমরা শিক্ষা তো স্কুল-কলেজ থেকে পাচ্ছি; কিন্তু তরবিয়ত কার থেকে লাভ করছি? কারও থেকেই নয়।

আমার বন্ধুগণ! তরবিয়ত আল্লাহওয়ালাদের থেকে পাওয়া যায়। আজ লোকেরা আল্লাহওয়ালাদের কাছে তরবিয়তের জন্য আসে না। এজন্য তারা মানুষ হতে পারে না। ফলে তারা অন্য বান্দাকে কষ্ট দেয়। একটি ঘটনা বলছি। এক এম.এ. পাশ লোক গাড়ি চালাচ্ছে। সে জানে , ফটক বন্ধ। কিন্তু সে লাইনে না দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে ট্রাফিকের রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে দিল। তোমার এম.এ. পাশ কী কাজে লাগল? তোমার তো এতটুকু বুঝ নেই যে, ফটক খুললেই গাড়ি আগে বাড়বে। তারপর ফটক খুলেই একজন আরেকজনকে হর্ণ বাজাচ্ছে। একজন অপরজনের প্রতি চোখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে। আমাদের এতটুকু ধৈর্য বা যোগত্যা নেই যে, জানব, এখানে অন্যের হক কী। এই তরবিয়ত আল্লাহওয়ালাদের থেকে পাওয়া যায়।

অথচ তরবিয়তের সম্পর্ক স্থাপন করাকে বাঁকা চোখে দেখা হয়। নফস আমাদের ধোঁকা দেয় যে, আমাদের কে বোঝাবে? আমরা তো নিজেরাই বুঝমান হয়ে গেছি। এই বুঝের কারণে আমরা আমাদের সামাজিক জীবনে অন্যকে সুখের পরিবর্তে উল্টো দুঃখ দিয়ে থাকি।

## সোহবতের প্রভাব

আমরা আটজন একসাথে এক শ্রেণীতে পড়তাম। একজন গ্রাম থেকে এসেছিল। সে আমাদের গ্রামের গল্প শোনাত। সে বলত, গ্রাম এমন হয়, হাল এভাবে চালায়, পানি এভাবে দেয়, কুয়া এমন হয় ইত্যাদি। আমরা শহরের ছেলে হওয়ার কারণে এগুলো কখনও দেখিনি। এজন্য এসব শুনে বিস্মিত হতাম।

একবার জুলাই-আগষ্টের দুই মাসের ছুটিতে সে আমাদেরকে তার গ্রামে দাওয়াত দিল। আমরা তার দাওয়াত কবুল করে ঘরে এসে আলোচনা করলাম। ভাইকে বললে তিনি আমাকে তার গ্রামে নিয়ে গেলেন। গ্রামে গিয়ে এক ক্ষেতে পৌঁছার পর দেখলাম, সেখানে গোবর পড়ে আছে। আমরা বুঝতে পারিনি, শুকনা গোবর ক্ষেতে কী কাজে লাগে। আমরা একে অপরকে দেখাতে লাগলাম, সে কিভাবে মাটিতে গোবর দিচ্ছে। আমরা আশ্চর্য হয়ে ওই কৃষককে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ওখানে কী করছ?

সে বলল, এখানে সব্জির বীজ বুনব। জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে দুর্গন্ধ গোবর কেন ছিটাচ্ছেন? সে বলল, আপনারা তো শহরে থাকেন। আপনাদের দৃষ্টিতে গোবর নাপাক; ঠিক আছে। কিন্তু এই গোবর মাটিতে দিয়ে পরে বীজ লাগালে ফসল ভালো উৎপন্ন হয়। তখন আমার বয়স কম ছিল। এজন্য আমি তার কথা পুরোপুরি বুঝতে পারিনি।

কিন্তু বর্তমানে কখনও ছোট বেলার সেই ঘটনা মনে হলে আমি চিন্তা করি, হে বান্দা! যাকে আমরা দুগর্ন্ধময় বলি, যাকে ঘৃণা করি, ওই দুর্গন্ধময় নাপাক বস্তুর কারণেই ফসল ভালো উৎপন্ন হয়। সুতরাং কোনো মুমিন যদি অপর মুমিন ভাইকে আনন্দ দিতে নাও পারে, তাহলে সে ওই নাপাক বস্তু থেকেও নিম্নমানের হয়ে গেল।

## চিন্তার কথা

আজ আমরা আমাদের সামাজিকতা নিয়ে চিন্তা করি। দিন-দিন আমাদের আখলাক নিচের দিকে চলে যাচ্ছে। আগের মতো ভালোবাসা, সহমর্মিতা আর ওয়াদা পূরণ এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না। পরস্পর বিদ্বেষ, হানাহানি, বিবাদ, ঝগড়া, শত্রুতা আমাদের সমাজকে গ্রাস করে ফেলছে। নবীজি বলেন, ওই জাতির ওপর আল্লাহর রহম হয় না, যাদের মাঝে আত্মীয়তা ছিন্নকারী থাকে। এ মন্দ বিষয়গুলো এখন সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন জরুরি হলো, আমরা আমাদের নিজ পাত্রকে বড় করি এবং অন্যের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়ার চেষ্টা করি। মন্দ আচরণের জবাব উত্তম আচরণ দ্বারা দেওয়ার চেষ্টা করি।

## খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়ার নসীহত

একবার খাজা নিযামুদ্দীনের কাছে একলোক এসে তার সামনেই স্বীয় ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুরু করল। সে বলল, সে আমার ওপর অত্যাচার করে, কষ্ট দেয়। আমার মন চায়, তার প্রতিশোধ নেই। খাজা নিযামুদ্দীন

(রহ.) শুনে তাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, হে ভাই! যদি কেউ তোমার পথে কাঁটা বিছায়, তারপরও তুমি তার পথে কাঁটা বিছাইয়ো না। আল্লাহ আমাদের ও উত্তম আখলাকের সাথে জীবন যাপন করার তাওফীক দান করুন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[ ৮ম খণ্ড সমাপ্ত ]

# مناجات

## মুনাজাত-১

دل مغموم کو مسرور کردے

دل بے نور کو پر نور کردے

ব্যথিত হৃদয়কে আনন্দিত করে দাও

আলোহীন হৃদয়কে আলোকিত করে দাও।

فروزاں دل میں شمع طور کردے

یہ گوشہ نور سے معمور کردے

উজ্জ্বল অন্তরে তূর পাহাড়ের প্রদীপ জ্বালাও

এই কোণটাকে নূর দিয়ে আবাদ করো।

مرا ظاہر شنور جائے الٰہی

مرے باطن کی ظلمت دور کردے

আমার বাহিরটা ঝলমলিয়ে ওঠে যেন হে প্রভু!

আমার ভিতরের অন্ধকার দূর করে দাও!

مئے وحدت پلا مخمور کر دے

محبت کے نشے میں چور کردے

ওয়াহদাতের শরাব পান করাও; নেশাগ্রস্ত করে দাও,

ভালবাসার নেশায় আত্মহারা করে দাও।

نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب

جنہیں تیری ادا مغرور کردے

আমার অন্তর যেন ওইসব লোকের দিকে না ঝোঁকে

যারা তোমার ভঙ্গিতে ক্রোধান্বিত হয়।

ہے میری گھات میں خود نفس میرا

خدایا اس کو بے مقدور کردے

আমার নফসই আমার বিরুদ্ধে ওঁত পেতে আছে,
প্রভু হে! একে তুমি প্রবঞ্চিত করো।

دل مغموم کو مسرور کردے

دل بے نور کو پرنور کردے

ব্যথিত হৃদয়কে আনন্দিত করে দাও
আলোহীন হৃদয়কে আলোকিত করে দাও।

# مناجات

# মুনাজাত-২

آہ جاتی ہے فلک پر اثر لانے کیلئے

بادلو! ہٹ جاؤ دید دراہ جانے کے لئے

'আহ' আকাশে ছুটে চলল দাবি আদায়ের জন্য,

হে মেঘমালা! সরে দাড়াও; যাওয়ার জন্যে পথ করে দাও।

اے دعا! عرض کر عرش الٰہی تھام کر

اے خدا! اب پھیر دے رخ گردش ایام کے

হে দু'আ! আরশে ইলাহীর আঁচল ধরে মিনতি করো,

হে প্রভু! এবার যামানার উত্থান-পতনের গতি পাল্টে দাও।

صلح تھی کل جن سے اب وہ تقدیر دونوں درپئے آزار ہیں

وقت اور تقدیر دونوں درپئے آزار ہیں

গতকালও যার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল, আজ সে শত্রুতায় লিপ্ত,

সময় ও ভাগ্য উভয়ই কষ্ট দেয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لئے

کر رہے ہیں زخمی دل فریاد مرہم کے لئے

এখন তো বেদনা দূর করার জন্য কোনো ওষুধ খুঁজছি,

আহত অন্তর কোনো বেদনা লোকের ফরিয়াদ করছে।

رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا

ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا

একটু দয়া করো; স্বীয় করুণার রীতি ভুলে যেয়ো না প্রভু!

আমরা তো তোমাকে ভুলে গেছি, তুমি আমাদের ভুলো না।

خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے

آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے

মানুষের কাছে প্রবঞ্চিত হয়ে, দুনিয়ার ঘাত-প্রতিঘাতে আহত হয়ে,
এসেছি এবার তোমার দুয়ারে দুহাত প্রসারিত করে।

خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں

کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں

আমি নিকৃষ্ট, পাপিষ্ঠ, অপমানের চাকায় পিষ্ট, বিধ্বস্ত,
যা-ই হই; চেয়ে দেখো, আমি তোমার প্রিয়তমের উম্মতীও।

حق پرستوں کی اگر کی تو نے دلجوئی نہیں

طعنہ دیں کے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں

সত্যসন্ধ্যানীদের মান যদি তুমি রক্ষা না কর,
তবে মিথ্যা পূজারীরা ভর্ৎসনা দিবে,
দেখো, মুসলিমদের কোনো খোদাই নেই!

[ সমাপ্ত ]